FUAD

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৩৮

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ANIK

ভলিউম ৩৮
তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
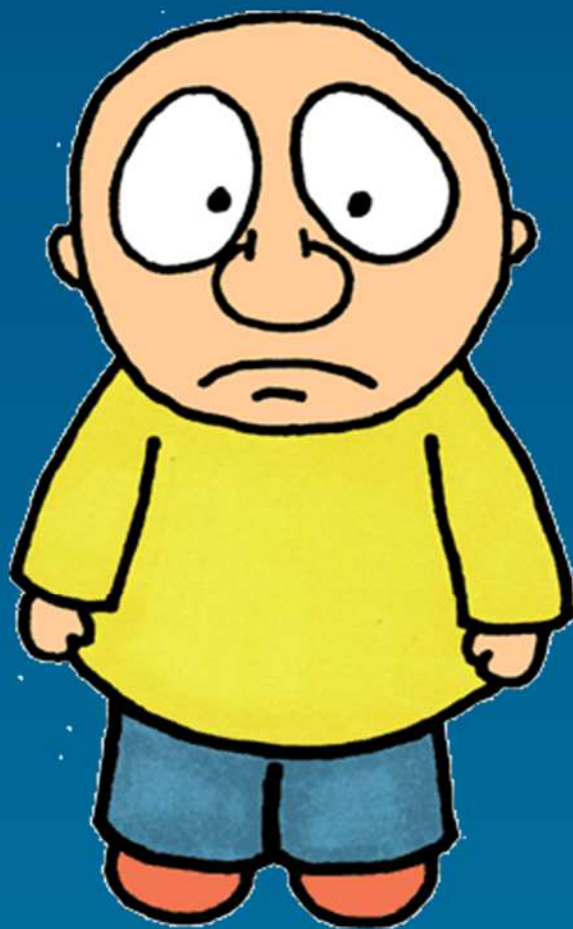
ভলিউম ৩৮

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1410-3

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪

জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

চৌত্রিশ টাকা

Volume-38

TIN GOYENDA SERIES

By: Rakib Hassan
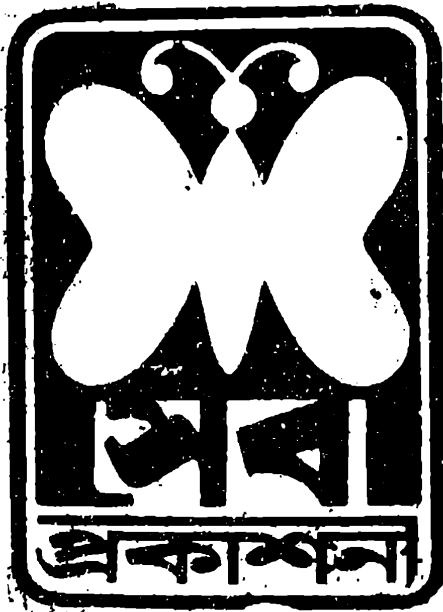
তি. গো. ভ ১/১	[তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা]	৪১/
তি. গো. ভ. ১/২	[ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো]	৪০/
তি. গো. ভ. ২/১	[প্রেতসাধনা, চক্তচক্ষু, সাগরসৈকত]	৩৬/
তি. গো. ভ. ২/২	[জলদস্যুর দ্বীপ, ১, ২ সবুজ ভূত]	৩৩/
তি. গো. ভ. ৩/১	[হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	[কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	[ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য, ১, ২]	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৪/২	[ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব]	৩৫/
তি. গো. ভ. ৫	[ভীতুসিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬	[মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর]	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৭	[পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৮	[আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ]	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৯	[পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল]	৩৭/-
তি. গো. ভ. ১০	[বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১১	[অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ১২	[প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া]	৩৯/-
তি. গো. ভ. ১৩	[ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	[পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন]	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৫	[পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর]	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৬	[প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ]	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৭	[ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	[খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড]	৩৭/-
তি. গো. ভ. ১৯	[বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২০	[খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২১	[ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার]	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২২	[চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সঙ্কেত]	৩৪/-
তি. গো. ভ. ২৩	[পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	[অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ]	৩৩/-
তি. গো. ভ. ২৫	[জিনার সেই দ্বীপ, কুকুর খেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৬	[ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৭	[ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৮	[ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ]	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২৯	[আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান]	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৩০	[নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা]	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩১	[মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সামানব]	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৩২	[প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর]	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৩	[শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট]	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩৪	[যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর]	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩৫	[নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬	[টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট কিশোরিয়োসো]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭	[ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ]	৩৫/-

উচ্ছেদ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

গরমের ছুটি কেবল শুরু হয়েছে। সুন্দর একটা সকাল। গ্রীনহিলসের বাড়িতে ঘুম থেকে উঠল কিশোর। টিটুকে তুলে নিয়ে রওনা হলো ডাকবাক্সে নতুন চিঠি আছে কিনা দেখতে।

ডাক পিয়ন আসেনি এখনও. তবে কাগজওয়ালা এসেছে। কাগজ রেখে গেছে। তুলে নিয়ে হেডলাইন দেখেই চমকে গেল কিশোর।

'সর্বনাশ!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার।

কিশোরের পায়ে মাথা ঘষল টিটু। যেন জিজ্ঞেস করতে চায়, ব্যাপার কি?

'খুব খারাপ! বুঝলি, টিটু, কাজটা একেবারেই ভাল করছে না ওরা!' আনমনে বলল কিশোর।

হেডলাইনের নিচের লেখাটা পড়ল সে। আবার ভাঁজ করে নিয়ে দৌড়ে ফিরে এল ঘরে। সোজা ছুটল বসার ঘরে ফোন করার জন্যে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী।

'কিশোর, কতবার তোকে বলেছি অত জোরে দরজা লাগাবি না!' ভুরু কুঁচকে বললেন তিনি। 'জুতো খুলে ঘরে ঢোক। কাদা লেগে আছে। একটু আগে ঘর মুছলাম।'

'সরি, চাচী, ভুল হয়ে গেছে।'

হাসি ফুটল চাচীর মুখে। 'ভোরে উঠেই এমন করছিস কেন? কি হয়েছে?'

'ফোন করব।'

'রবিন, না মুসাকে? নতুন কোন রহস্য পেলি নাকি?'

'রহস্য না, তবে ব্যাপারটা জরুরী। দেখো না, শুধু শুধু কতগুলো মানুষের বাড়িঘর ভেঙে দেয়া হচ্ছে। ওরা এখন যাবে কোথায়?' পত্রিকাটা চাচীকে দেখাল কিশোর।

'মানুষ আসলে মানুষ নেই আর, খালি নিজের স্বার্থ দেখে,' পত্রিকার জন্যে হাত বাড়ালেন চাচী, 'দেখি, কি লিখেছে?'

পত্রিকা হাতে রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

বসার ঘরে ঢুকে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল কিশোর। চকচক করছে মেঝে। যেন পালিশ করা। হঠাৎ একটা বুদ্ধি ঢুকল মাথায়। টেলিফোনের কাছে হেঁটে যাওয়ার দরকার কি? বসে পড়ে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে জোরে এক ঠেলা মারল। শাঁ করে পিছলে সরে চলে এল ফোনের কাছে। কাণ্ড দেখে মজা

পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

'এই চুপ, চুপ, চেঁচাবি না! চাচীকে আবার রাগাতে চাস?'

রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল কিশোর।

ওপাশ থেকে রিসিভার তোলার শব্দ হলো।

কিশোর বলল, 'রবিন, আজকের কাগজ দেখেছ?...ও, যাও, জলদি দেখো গিয়ে। সাংঘাতিক খবর আছে।'

আটটা বাজতে না বাজতেই কিশোরদের বাড়িতে এসে হাজির হলো ফারিহা আর রবিন। ছাউনিতে ঢুকল। কিশোর আর টিটু আগে থেকেই বসে আছে।

মুসাদের ছাউনির মত কিশোরদের বাগানেও একটা ছাউনি আছে। কিশোরের বুদ্ধিতেই সেটাকে সেরেসুরে নেয়া হয়েছে। আড্ডা দেয়ার একাধিক জায়গা থাকলে সুবিধে। যখন যেখানে ইচ্ছে বসতে পারবে। গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে হেডকোয়ার্টার একটা থাকা লাগে। কিশোরের ইচ্ছে, ছাউনি যখন দুটো, যেটাতে বেশি সুবিধে, সেটাকেই হেডকোয়ার্টার বানাবে। তবে নিজেদের বাড়িরটার ব্যাপারেই বেশি উৎসাহ তার। একা অবশ্য কিছু করতে যাবে না, ভোটের মাধ্যমে সবার মতামত নিয়ে তারপর।

সবার শেষে এল মুসা। ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সরি, দেরি হয়ে গেল। সাইকেলের চেইন খারাপ। বারবার খুলে পড়ে যায়।'

'বদলে নিলেই হয়,' কিশোর বলল।'

'নেব।'

হাত তুলল কিশোর, 'এসো, তোমার জন্যেই বসে আছি, আলোচনা শুরু করিনি।'

'ঘটনাটা কি? এত সকাল সকালই তলব?'

ভাঁজ করা খবরের কাগজটা খুলে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'নাও, পড়ো।'

ফারিহাও পড়েনি। দেখার জন্যে সে-ও ঝুঁকে এল।

পত্রিকার প্রথম পাতায় হেডলাইন দিয়েছে:

রেডরোজ কটেজ ভেঙে দিয়ে
মহাসড়ক তৈরির পরিকল্পনা!
তিরিশজন অসহায় মানুষের ভাগ্য অনিশ্চিত,
কোথায় যাবে তারা?

নিচে বিস্তারিত রিপোর্টের সারমর্ম:

গ্রীনহিলসের ভেতর দিয়ে যাবে উপকূল ধরে আসা নতুন মহাসড়ক। শহরের একধারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বৃদ্ধদের একটা কলোনি আছে, নাম রেডরোজ কটেজ। কলোনি ভেঙে সেই জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তা নেয়ার

সিদ্ধান্ত হয়েছে। জায়গার মালিক মিস্টার হেনরি বারগার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। দু-এক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। বুলডোজার আসবে বাড়ি ভাঙতে। কটেজের বাসিন্দাদের বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পড়ার পর কাগজটা নীরবে নামিয়ে রাখল মুসা।

চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। বাগানের ছাউনিতে থমথমে নীরবতা। এমনকি টিটুও যেন আস্তে দম ফেলার চেষ্টা করছে, বেচারা বুড়ো মানুষগুলোর প্রতি সহানুভূতি জানানোর জন্যে। আহা, বেচারারা! বুড়ো বয়েসে কাজ থেকে অবসর নিয়ে ওসব বাড়িতে উঠেছিল শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটানোর জন্যে। কিন্তু ভাগ্যে সইল না!

নীরবতা ভাঙল ফারিহা, 'এটা অন্যায়! কোথায় যাবে ওরা? হুট করে কোথায় গিয়ে উঠবে? কে জায়গা দেবে?'

রবিন প্রশ্ন করল, 'এ ব্যাপারে মিস্টার বারগার কি ভাবছেন? তাঁরও নিশ্চয় একটা বক্তব্য আছে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ। আবার সবাই চুপচাপ। রেডরোজ কটেজের অনেকে ওদের বন্ধু। আর বন্ধু না হলেই বা কি? এতগুলো বুড়ো মানুষকে বাড়ি ছাড়া করা হবে, উফ্, ভাবা যায় না! ঠেকানোর কি কোন উপায় নেই?

দুই

আছে, নিশ্চয় আছে! কোন না কোন উপায় নিশ্চয় আছে। সব সমস্যারই সমাধান থাকে।

'একটা কিছু করতে হবে আমাদের,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রবিন। 'এই গ্রামটা আমাদের। এখানে এ ধরনের কোন অন্যায় ঘটতে দেব না আমরা!'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত,' হাত তুলল কিশোর।

'আমিও,' মুসা বলল।

টিটু কি বুঝল কে জানে, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘাউ!'

ওকে কাছে টেনে নিল ফারিহা। 'আমাদের মত তুইও চাস না কটেজগুলো ভাঙা হোক?'

আবার বলল টিটু, 'ঘাউ!'

গম্ভীর স্বরে কিশোর বলল, 'যে করেই হোক, ঠেকাতে হবে আমাদের। উপায় বের করতে হবে।'

'কি ঠেকাব?' মুসার প্রশ্ন। 'রাস্তা বানানো, নাকি বাড়ি ভাঙা?'

'বাড়ি ভাঙা।'

'কি ভাবে? আমাদের ক্ষমতা কতখানি; কে কান দেবে আমাদের কথায়?'

'দেবে, দেয়ার মত করে বললে না দিয়ে পারবে না,' রবিন বলল। 'কিশোর, এক কাজ করা যায়, মিস্টার বারগারকে অনুরোধ করব, কটেজ না ভেঙে অন্য কোনখান থেকে জায়গা দিয়ে দিতে। রাস্তার জন্যে দেয়ার জায়গার তাঁর অভাব নেই। কটেজ ভাঙার দরকার পড়ে না। বললে আমার মনে হয় তিনি শুনবেন।'

'আমারও,' মুসা বলল, 'মিস্টার বারগার ভাল লোক। আমার অবাক লাগছে, কটেজ ভাঙার অনুমতি তিনি কেন দিলেন? যদ্দূর জানি, রেডরোজকে তিনি ভালবাসেন, এতগুলো মানুষকে অকারণে পথে বের করে দিয়ে তিনি কষ্ট দেবেন, এটা বিশ্বাস হয় না।'

'ঠিকই বলেছ,' কিশোর বলল, 'তিনি ভাল লোক। কারণ ছাড়া এ রকম একটা কাজ তিনি করতে যাবেন না।'

রবিন বলল, 'অন্য কেউ হলে বলতাম টাকার জন্যে করছে, কারণ সরকার জায়গা নিতে চাইলে সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি টাকা দেয়। কিন্তু মিস্টার বারগারের টাকার অভাব নেই। আর লোভে পড়ে এ রকম অমানবিক কাজ করার মানুষ তিনি নন। রেডরোজকে যেমন ভালবাসেন, এর বাসিন্দাদেরও বাসেন। পকেটের পয়সা খরচ করে ওদের সিনেমা দেখাতে, বেড়াতে নিয়ে যান, নিজের বাগান থেকে ফলমূল উপহার পাঠান, পছন্দ করেন বলেই তো। হঠাৎ করে সেই তাদেরকে উৎখাত করতে চাইছেন, ব্যাপারটা কেমন লাগছে না?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, মাথা দোলাল, 'ব্যাপারটা রহস্যজনক!'

'কি রহস্য?' ফারিহার প্রশ্ন।

'জানি না। জানতে হবে।'

মুসা বলল, 'কটেজগুলো তো অনেক পুরানো। কে বানিয়েছে, কিছু জানো নাকি?'

জবাবটা রবিন দিল, 'জানি, মিস্টার বারগারের বাবা। চল্লিশ বছর আগে। একটা ট্রাস্ট গঠন করে গেছেন। বাড়িগুলো দেখাশোনা করবে সেই ট্রাস্ট—কেবল বৃদ্ধ, অসহায়, অবসর প্রাপ্ত মানুষদের কাছে ভাড়া দেবে। ভাড়াও খুব কম। তদারকি করার জন্যে একজন ওয়ার্ডেন রাখা হয়েছে। ভাড়াটেদের যে কোন সমস্যার সমাধান করা, তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব তার। তবে মিস্টার বারগার যেহেতু মালিক, সর্বময় ক্ষমতা তাঁর; তিনি বিক্রি করে দিতে চাইলে ট্রাস্ট কিংবা ওয়ার্ডেন বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবে না।'

'তিনিই তো বিক্রি করতে চাইছেন,' হতাশ শোনাল ফারিহার কণ্ঠ, 'কি হবে এখন তাহলে? কেউ তো কিছু করতে পারবে না।'

'সে জন্যেই তো তাঁর কাছে যাওয়া দরকার,' কিশোর বলল। 'রেডরোজ না ভাঙতে অনুরোধ করব তাঁকে।'

'যদি আমাদের কথা না শোনেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'অন্য উপায়ের কথা ভাবব,' জোর গলায় বলল কিশোর। 'যে করেই হোক, ওই কটেজ ভাঙা আমরা ঠেকাব।'

এক থাবা তুলে যেন সমর্থন জানাল টিটু, 'খউ!'

'হাত নেই তো,' হেসে বলল ফারিহা, 'তাই হাতের জায়গায় থাবা।'

'দূর, ও এমনি এমনি তুলেছে,' মুসা বলল। 'কুকুর কি আর মানুষের সব কথা বুঝতে পারে নাকি।'

'ও বোঝে,' তর্ক শুরু করল ফারিহা, 'টিটু খুব বুদ্ধিমান। ধরতে গেলে ও তো মানুষই, চেহারাটা কেবল কুকুরের।'

'হুঁ, তোমার মাথা, হাঁদা কোথাকার!'

'এই তো লেগে গেল,' বাধা দিল কিশোর, 'থামো না তোমরা। কি এক কথার মাঝে আরেক কথা শুরু করলে।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তাহলে কি ঠিক হলো? প্রথমে মিস্টার বারগারের সঙ্গে দেখা করব আমরা, রেডরোজ না ভাঙার অনুরোধ জানাব। যদি রাজি না হন, তখন দেখা যাবে, অন্য ব্যবস্থা করব আমরা।'

মেনে নিল সবাই।

তিন

একসঙ্গে সবার যাওয়ার দরকার নেই। এতজনকে দেখলে বিরক্ত হতে পারেন মিস্টার বারগার। তাই কিশোর ঠিক করল, মুসাকে নিয়ে সে যাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রবিন আর ফারিহা টিটুকে নিয়ে চলে যাবে রেডরোজ কটেজে, বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে, ওদের মনোভাব জানতে।

কটেজগুলো তৈরি হয়েছে গাঁয়ের সীমানায় মনোরম, শান্ত পরিবেশে। আঁকাবাঁকা একটা সরু পথ চলে গেছে সেখানে। বেশিদিন আর এমন থাকবে না পথটা. চওড়া, বিশাল মহাসড়কে পরিণত হবে। নষ্ট করবে শান্ত পরিবেশ। ইতোমধ্যেই তার সূচনা হয়ে গেছে। অনেক শ্রমিক এসে জড় হয়েছে।

হপ্তাখানেক আগেও এত হট্টগোল ছিল না এখানে। রেডরোজ কটেজও থাকত শান্ত। গাড়িটাড়ি বিশেষ দেখা যেত না। বেশ কিছু কুকুর-বেড়াল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াত এদিক ওদিক। সাজানো গোছানো কটেজগুলো ছবির মত সুন্দর। বেশির ভাগ একতলা বাড়ি, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে কষ্ট হয় বুড়ো মানুষদের, তাই বহুতল বাড়ি বানানো হয়নি এখানে। প্রতিটি বাড়ির সামনে-পেছনে ফুলের বাগান।

রেডরোজের কাছে এসে রবিন আর ফারিহা দেখল বেশ হই-চই হচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কটেজের বৃদ্ধ বাসিন্দারা, কেউ বাগানে, কেউ রাস্তায়। জটলা করছেন, জোরে জোরে কথা বলছেন, হাত নাড়ছেন। সবাই

উত্তেজিত।

মালপত্র গোছাতে ব্যস্ত অনেকে। ঘরে ঢুকছেন, বেরোচ্ছেন: বাতিল বাক্স আর অন্যান্য জিনিস বের করে এনে স্তূপ করছেন দরজার বাইরে।

অসহায় ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়ে পুরানো সুটকেসের ওপর বসে আছেন এক বৃদ্ধা। তাঁকে দেখে খুব কষ্ট হলো ফারিহার। রবিনকে বলল, 'দেখো, কেমন মন খারাপ করে বসে আছেন উনি।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

এগিয়ে গেল ওরা।

বৃদ্ধাকে চেনে রবিন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ট্যাক্সি লাগবে? ডেকে দেব?'

মুখ ফেরালেন না বৃদ্ধা। আনমনে তাকিয়ে আছেন শূন্যের দিকে। বহুদূরে চলে গেছে যেন দৃষ্টি। দুই ফোঁটা পানি টলমল করে উঠল চোখের কোণে, বেড়ে গিয়ে শেষে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সহ্য করতে পারল না রবিন। সরে এল সেখান থেকে। ফারিহা কেঁদেই ফেলল। একটু দূরে একটা ছোট ভ্যানে মাল তুলছে সাদা-চুল এক বৃদ্ধ আর তাঁর স্ত্রী। ওঁদের সাহায্য করতে এগোল দু'জনে।

'থ্যাংক ইউ,' বৃদ্ধ বললেন। 'বড়দের চেয়ে ছোটরা অনেক ভাল। অত স্বার্থপর হয় না।'

'যাচ্ছেন, যান,' একটা আলমারি তুলতে সাহায্য করছে রবিন, 'তবে অহেতুক কষ্ট করছেন। আবার আসবেন এখানে।'

'আসা সম্ভব হলে তো কোন কথাই ছিল না!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বৃদ্ধা। 'তবে স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। আর দিন কয়েকের মধ্যেই রেডরোজের চিহ্নও থাকবে না।'

'যাচ্ছেন কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'এই কাছেই, আমার ছেলের ওখানে,' বুড়ো লোকটা বললেন। 'সরকারি কলোনিতে জায়গা একটা পেয়েছি, কিন্তু যাব না। থাকা অসম্ভব! আমরা চাই নিরিবিলি। ওই হট্টগোলের মধ্যে থাকলে পাগল হয়ে যাব।'

বাগানে জটলা করছেন যাঁরা, তাঁদের একজন বৃদ্ধা মিস চেরি। সবচেয়ে বেশি চিৎকার করছেন তিনি। হাতে একটা প্রজাপতি ধরার জাল। ওটা দিয়ে কি করতে চান, বোঝা গেল না। চারপাশে ঘিরে আছে শ্রোতারা।

মহিলাকে ফারিহার ভাল লাগে। বয়েস সত্তর-পঁচাত্তর, উজ্জ্বল রঙের প্রচুর ফুল আঁকা হ্যাট মাথায়, গায়ের কাপড় থেকে শুরু করে পায়ের জুতো সব গাঢ় রঙের। নিজেকে বৃদ্ধা ভাবতে বোধহয় ভাল লাগে না তাঁর, তাই অল্প বয়েসীদের মত পোশাক পরেন। বহুবার তার আন্টি, অর্থাৎ রবিনের আম্মাকে বলতে শুনেছে ফারিহা, 'মিস চেরি একটা চরিত্র বটে!' কেন এ কথা বলেন তিনি ঠিক বুঝতে পারে না সে, তবে মহিলাকে পছন্দ করে।

'তোমরা কি ভেবেছ এত সহজে মেনে নেব আমি এই অন্যায়?' জোর

গলায় বক্তৃতা দেয়ার ঢঙে বললেন মিস চেরি। হাতের জালটা নাচালেন, যেন ওটাই তাঁর অন্যায় ঠেকানোর প্রধান অস্ত্র। 'প্রতিবাদ করব না? অবশ্যই করব। ভেবেছে কি ওরা! ঠেলাগাড়ি আনবে, আর চ্যাংদোলা করে তাতে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে আমাদেরকে ভাগাড়ে? এতই সহজ? শিক্ষা একটা এবার দিয়েই ছাড়ব। ভবিষ্যতে যাতে বুড়োদের আর দুর্বল না ভাবে।'

'ঠিক!' সমর্থন জানিয়ে হাত তুলে নাচলেন এক বৃদ্ধ, 'আমরা বুড়ো বলেই আমাদের কেয়ার করছে না। ভাবছে, ওই মড়াগুলো আর কি করবে! দিই না একটা ধাক্কা, চিত হয়ে পড়ে যাবে। অত সহজে যে চিত হই না আমরা, বোঝাতে হবে সেটা।'

'হ্যাঁ, বোঝাতে হবে,' প্রজাপতির জালটা তুলে নাচাতে লাগলেন মিস চেরি। 'আমাদের ঘর আমরা ভাঙতে দেব না। বাধা দেব। ভয় দেখালেই সুড়সুড় করে পালাব যদি ভেবে থাকে ওরা, সাংঘাতিক ভুল করছে।'

এগিয়ে গেল ফারিহা আর রবিন।

ওদের ওপর চোখ পড়তেই মিস চেরি বললেন, 'আরি, তোমরা! এসো, এসো! তা কি খবর?'

রবিন বলল, 'পত্রিকায় পড়েছি সব। দেখতে এসেছিলাম, কি করছেন। আমরাও ঠিক করেছি, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করব। কিশোর আর মুসা এ ব্যাপারে মিস্টার বারগারের সঙ্গে কথা বলতে গেছে।'

'তাই নাকি! তোমরা যে আমাদের জন্যে এতটা ভাবছ, শুনে খুশি হলাম।' যাঁদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন, তাঁদের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো, এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমাদের দলেও লোক আছে। যান, ঘরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিন। তালা লাগাবেন, কেউ যাতে জোর করে ঢুকতে না পারে। জান দেব তবু ঘর ছাড়ব না, এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত আমাদের।'

বাগানে যারা জমায়েত হয়েছিল, রওনা হয়ে গেল যার যার ঘরের দিকে।

ফারিহা আর রবিনের দিকে তাকালেন মিস চেরি, 'তোমাদের সঙ্গে তো কথা হলো না। চলো, ঘরে চলো। কি রে, টিটু, তুই যাবি? এইমাত্র আভন থেকে চকলেট কেক নামিয়ে রেখে এসেছি, এখনও গরম। চল, দেব।'

ওপর দিকে নাক তুলে 'খোক' করে উঠল টিটু, সম্মতি জানাল।

ওদের নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন মিস চেরি।

একটা কটেজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। দরজা তো বন্ধ করেছেনই এ ঘরের বাসিন্দা, বোর্ড লাগিয়ে পেরেক ঠুকে জানালাও বন্ধ করে দিয়েছেন। কোন দিক দিয়েই যাতে জোর করে কেউ ঘরে ঢুকে তাঁকে বের করতে না পারে। মিস চেরির ডাক শুনে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলেন বুড়ো।

'ঘরে খাবার আছে তো?' মিস চেরি জিজ্ঞেস করলেন। 'না থাকলে সময় থাকতে এনে নিন। কতদিন আটকে থাকতে হবে কে জানে!'

চার

গেট খুলে মিস্টার বারগারের বাড়িতে ঢুকল কিশোর আর মুসা। লম্বা ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে চলল।

বিরাট বাড়ি। কয়েকটা খামারের মালিক মিস্টার বারগার। এ ছাড়া আরও ব্যবসা আছে। ও সব ব্যবসার কাজে বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকতে হয়। এখানকার এস্টেট দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন একজন ম্যানেজারকে।

মিস্টার বারগার বাড়ি আছেন কিনা কে জানে—ভাবছে কিশোর, না থাকলে মুশকিল। তাঁকে ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না।

হোঁতকামুখো, পুরু গোঁফওয়ালা এক মালীকে দেখা গেল বাড়ির সামনে সিঁড়ির পাশে বাগানে কাজ করছে।

'কি চাই?' আষাঢ়ের আকাশের মত মুখ করে বলল লোকটা।

মোলায়েম হাসি হাসল কিশোর। 'মিস্টার বারগারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি আমার চাচার বন্ধু। কাজ তাঁর কাছে।'

সন্দেহ গেল না লোকটার।

'কাজটা খুব জরুরী,' কিশোরের কথাকে সমর্থন করে বলল মুসা, 'দেখা না করলেই নয়।' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে একটা চমৎকার হাসি উপহার দিল মালীকে।

বোধহয় এই হাসিতেই নরম হলো মালী। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। সাগর কলার মত মোটা বুড়ো আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে দিল।

বিশাল সদর দরজার কাছে উঠে গেছে সিঁড়ি। কোন সময় মত বদলে ফেলে লোকটা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দুই গোয়েন্দা। ভেজানো পাল্লা ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকল ওরা।

কাউকে চোখে পড়ল না। লম্বা একটা প্যাসেজ, দু'পাশে অনেকগুলো দরজা। একটা দরজার ওপাশে টাইপ রাইটারের খটাখট শব্দ হচ্ছে। তারমানে ওটা অফিস। লোক আছে।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে সাড়া এল, 'কে?'

পাল্লা খুলে উঁকি দিল কিশোর। গোমড়ামুখো এক মহিলা কাজ করছে। পিঠ একদম সোজা। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'মিস্টার বারগার বাড়ি আছেন?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ?'

'না। তবে খুব জরুরী একটা কাজে এসেছি।'
'কাজটা কি?'
মহিলার ভাবভঙ্গিতে রেগে গিয়ে কিশোর বাধা দেয়ার আগেই বলে ফেলল মুসা, 'কাজটা হলো কথা। বলতে এসেছি তিরিশজন মানুষকে যেন রাস্তায় বের করে দেয়া না হয়।'
মহিলাও রেগে গেল। একটা ছেলে ওরকম করে কথা বলবে তার সঙ্গে, সহ্য হলো না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোঁ মেরে টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে ওদের দিকে তাক করল পিস্তলের মত, ধমকে উঠল, 'দেখা হবে না, যাও! তিনি তাঁর জায়গায় কাকে রাখবেন, কাকে বের করবেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। নাক গলাতে এসেছ। যাও এখন, বেরোও!'
শুরুতেই গেল সব গোলমাল হয়ে, ভাবল কিশোর। মহিলাকে অনুরোধ করে আর লাভ হবে না। ওদের কথায় কানই দেবে না। দেখা করা তো দূরের কথা, এখনও জানাই হলো না মিস্টার বারগার বাড়িতে আছেন কি নেই।
সেক্রেটারির ঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। সদর দরজা দিয়ে প্যাসেজে ঢুকতে দেখল মালীকে, হাতে একটা ঝাঁপি, তাতে ফুল আর নানা রকম সব্জি। ছেলেদের গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে ওর গম্ভীর মুখেও হাসি ফুটল, 'ড্রাগনের পাল্লায় পড়েছিল বোধহয়?'
চমকে উঠল মুসা। চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগল এদিক ওদিক, 'ড্রাগন!'
হাসি চকচক করছে মালীর মুখে, 'আরে ওই মহিলার কথা বলছি, সেক্রেটারি। দেখা হয়েছিল নাকি ওর সঙ্গে?'
ড্রাগনই বটে! মনে মনে স্বীকার করল মুসা। বাপরে বাপ, যে ভাবে তাকায় আর কথা বলে, মুখ থেকে আগুন বেরোনোই কেবল বাকি!
বেরিয়ে গেল মালী।
ওর পেছন পেছন বেরোতে যাবে মুসা আর কিশোর, এই সময় কথা শোনা গেল। থমকে দাঁড়াল ওরা। ফিরে তাকিয়ে দেখল, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। চেনে ওকে মুসা। মিস্টার বারগারের ম্যানেজার।
মুসাকে টেনে নিয়ে চট করে আরেকটা গলির মুখে ঢুকে পড়ল কিশোর। ম্যানেজারের কথা কানে আসছে, 'ঠিক আছে, মিস্টার বারগার, তাহলে তাই করব। মাঠটায় বেড়া দিয়ে দেব। কত দামে ডিম আর মাখন নেবে ওরা, তা-ও জানাব। যাই এখন।'
দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। ছেলেরা যেখানে রয়েছে তার উল্টো দিকে চলে গেল। দেখতে পেল না ওদের।
মিস্টার বারগার কোথায় আছেন এখন জেনে গেছে কিশোর। ড্রাগন-সেক্রেটারি বেরোলে আটকে দিতে পারে ওদের, তার আগেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। মুসার হাত ধরে টান দিল সে, 'জলদি এসো!'

ম্যানেজার যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সেটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। টোকা দিল কিশোর।

'এসো!' সাড়া এল ভেতর থেকে।

মুসাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। অনেক বড় একটা ঘর। সুন্দর করে সাজানো। তিন দিকের দেয়াল জুড়ে রয়েছে বড় বড় আলমারি। বইয়ে ঠাসা। মিস্টার বারগারের পড়ার ঘর এটা।

'আরে, মুসা যে! এসো, এসো,' বড় একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন মিস্টার বারগার। 'তুমি কিশোর পাশা না? গোয়েন্দা? নতুন কোন কেস পেলে নাকি?'

'কেস নয়, তবে অন্য একটা কাজ,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। মিস্টার বারগার যে ওকে চিনতে পেরেছেন, তাতে গর্ব যেমন হলো, খুশিও হলো। গ্রীনহিলসে ওদের গোয়েন্দাগিরির খবর নিশ্চয় পত্রিকা পড়ে জেনেছেন তিনি। কিশোরের ছবি দেখেছেন।

'কাজটা কি আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। কিছু মানুষ খুব বিপদে পড়ে গেছে।'

'তাই নাকি? আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'পারেন, শুধু আপনিই পারেন ওদের সাহায্য করতে,' বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। দ্বিধা করছে। এত তাড়াতাড়ি সব বলে ফেলবে কিনা বুঝতে পারছে না।

অবাক হলেন মিস্টার বারগার। 'আমি পারি! চুপ হয়ে গেলে কেন? বলো?'

'আপনি কি এখনও কিছু বুঝতে পারছেন না, স্যার?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন মিস্টার বারগার। মাথা নাড়লেন।

দূর, এত ভণিতা করছে কেন কিশোর? ধৈর্য রাখতে পারল না আর মুসা, বলে ফেলল, 'আমরা রেডরোজ কটেজের কথা বলতে এসেছি। এ ভাবে বেচারা বুড়ো মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার বারগার। মুসার কথা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাঁকে। মুসা যে ভাবে বলেছে, কিশোর ভেবেছিল রেগে যাবেন, কিন্তু ওকে বিস্মিত করে দিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি, ওদের দিকে তাকাতে পারছেন না। টেবিলে রাখা কতগুলো কাগজ অহেতুক নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখার ছুতোয়।

'দেখো, ছেলেরা, খুব শক্ত প্রশ্ন করেছ আমাকে,' অবশেষে বললেন তিনি, 'সরাসরি এর জবাব দিতে পারব না। তবে কিছু কথা বিবেচনায় আনলে বোধহয় জবাব একটা মিলবে। হাইওয়ে হলে আমাদের অনেক সুবিধে, গ্রামেরও উন্নতি হবে।'

'কিন্তু তিরিশজন মানুষের হবে চরম অবনতি,' না বলে আর পারল না কিশোর। 'ওই বেচারারা মরবে।'

সকাল বেলা পত্রিকা পড়ার পর থেকে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে ওদের। রাগ চেপে আছে মাথায়। দু'জনেই তাই ভুলে গেছে মিস্টার বারগারের মত মানুষের সঙ্গে এ ভাবে কথা বলাটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না।

কিন্তু রাগ করলেন না তিনি। 'দেখো, তোমরা বুঝতে পারছ না বলেই রেগে গেছ। কত রকম উন্নতি হবে, গ্রামবাসীদের সুযোগ বাড়াবে ওই রাস্তা, জানো? এ পথে লোক চলাচল বাড়বে। আমাদের গ্রামটা সুন্দর দেখে অনেক বেশি বেশি ট্যুরিস্ট আসবে। ওদের জন্যে রেস্টহাউস বানাতে হবে, রেস্টুরেন্ট বানাতে হবে, ছোটবড় টী-শপ আর হোটেলে ভরে উঠবে গ্রীনহিলস। ব্যবসায়ীদের সুযোগ বাড়বে।'

মুখ খুলতে গেল কিশোর। হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন মিস্টার বারগার। 'আগে আমাকে শেষ করতে দাও। ব্যবসা বাড়া মানে কাজ বাড়া, আর কাজ বাড়লে লোকের দরকার হয়, অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে। যানবাহনের ভিড় বাড়বে এই এলাকায়। রাস্তার পাশে গ্যারেজ তৈরি হবে, পেট্রল স্টেশন হবে। মোটর মেকানিক আর পেট্রল পাম্পে অ্যাটেনডেন্ট দরকার হবে, সেগুলোতে কাজ পাবে গাঁয়ের অনেকে। শুনলাম, রাস্তার কন্ট্রাক্ট যারা নিয়েছে তারাই বানাবে ওসব। পেট্রল কেনার জন্যে যারা থামবে, তাদের অনেকেই চা কিংবা কফি খেতে চাইবে। রাস্তার পাশে বড় একটা কাফে বানানো হবে ওদের জন্যে। এখন এ গাঁয়ে অনেক গরীব আর বেকার লোক আছে, তাদের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। গ্রীনহিলসের জন্যে দুর্ভাগ্য নয়, অনেক বড় সৌভাগ্য বয়ে আনবে রাস্তাটা।'

মিস্টার বারগারের কথা দ্বিধায় ফেলে দিল কিশোর আর মুসাকে। তাঁর কথায় যুক্তি আছে। তাহলে কি ওরাই ভুল করছে? তিরিশজন মানুষের সাময়িক কষ্টের কথা ভেবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বাধা দিতে এসেছে?

দ্বিধাটা কেটে যেতেই মনে হলো কিশোরের, না, ভুল ওরা করছে না। হঠাৎ করে শুনলে ওদের মতই বিভ্রান্ত হবে সবাই, তবে একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে ফাঁকিটা ধরে ফেলবে। সে যেমন ধরেছে। বলল, 'রাস্তা হলে গাঁয়ের অনেক উপকার হবে, কথাটা ঠিক, কিন্তু সেটা রেডরোজ কটেজকে বাদ দিয়ে অন্য কোথাও তো হতে পারে। প্রচুর পতিত জায়গা আছে, তার ওপর দিয়ে নিয়ে গেলেই হয়।'

'হু...তোমার কথায় যুক্তি আছে,' আবার অহেতুক কাগজ গোছানোয় মনোযোগী হলেন মিস্টার বারগার, জবাব হারিয়ে ফেলেছেন।

'তাহলে ওদের বলে দিলেই পারেন,' সুযোগ পেয়ে গলার জোর বাড়াল কিশোর, 'রেডরোজ কটেজ বাদ দিয়ে অন্য কোনখান দিয়ে রাস্তা নিয়ে যাক, যেখানে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে না?'

'ঠিক,' মুসা বলল, 'আপনি এখুনি ওদের মানা করে দিন।'

অবশেষে মেজাজ বিগড়াতে আরম্ভ করল মিস্টার বারগারের। তাতে অবাক হলো না কিশোর; ওরা যে ভাবে পরামর্শ দিয়ে চলেছে, নাক গলাচ্ছে,

তাহলে আরও আগে কেন রাগেননি তিনি, সেটা ভেবে অবাক লাগল।

রেগে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন তিনি, 'তোমরা ছেলেমানুষ, সব কথা বুঝবে না! এর মধ্যে আরও অনেক ব্যাপার আছে, এই যেমন ভৌগোলিক ব্যাপারটার কথাই ধরো; প্রস্তাব করা হয়েছে সবচেয়ে ভাল জায়গার ওপর দিয়েই রাস্তা নেয়া উচিত, মাটি ভাল হলে রাস্তা ভাল হবে, টিকবেও বেশি দিন। মাটি খারাপ হলে রাস্তা টেকে না। তা ছাড়া জায়গার ওপর জরিপ চালিয়ে, আরও নানা রকম কাজকর্ম সেরে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে টিডিআর কোম্পানি, এখন আমি মানা করলেই শুনবে কেন? কেস করে দিয়ে বিরাট অঙ্কের টাকা দাবি করে বসবে। কিংবা সরকারের মাধ্যমে চাপ দিয়ে আমাকে জায়গা বিক্রি করতে বাধ্য করবে। টিডিআর মানে হলো...'

'টাইগার ড্যান কোম্পানি,' বলে দিল কিশোর।

অবাক হলেন মিস্টার বারগার, 'তুমি জানলে কি করে?'

'পত্রিকা পড়ে।'

আবার অস্বস্তি দেখা দিল মিস্টার বারগারের চোখে। হঠাৎ করে উপলব্ধি করলেন এই ছেলেটাকে বোকা আর ছেলেমানুষ ভাবার কোন কারণ নেই। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, চাপ দিয়ে...'

এটা খোঁড়া যুক্তি মনে হলো কিশোরের কাছে, বলে ফেলল, 'আপনি যাই বলুন, স্যার, চাপ দিয়ে আপনার মত লোকের জায়গা দখল করে ফেলবে একটা কোম্পানি, বিশ্বাস হয় না।'

অহেতুক একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে রেখে দিলেন মিস্টার বারগার, উসখুস করে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক।...তবে মাটির ব্যাপারটা...'

'কি জানি! গ্রীনহিলসের মত পুরানো অঞ্চলে শুধু একটা জায়গা বাদে আর সবখানেই মাটি খারাপ, রাস্তা বানানোর অনুপযুক্ত, এটাও বিশ্বাস করতে পারছি না!'

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল মিস্টার বারগারের। কিল মারলেন টেবিলে। 'ব্যস, অনেক হয়েছে! কেন রাস্তা করা যাবে না, সেটা তোমাদের না বুঝালেও চলবে। কথা শেষ হলে এখন যেতে পারো, আমার কাজ আছে। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট করেছ।'

'সরি, স্যার,' কিশোর বলল, 'বেয়াদবি করে থাকলে মাপ করে দেবেন।'

মুসাও দুঃখ প্রকাশ করল।

মিস্টার বারগারকে 'গুডবাই' জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। তাঁর সঙ্গে কথা বলে লাভ হলো না, রেডরোজ কটেজ ভাঙার নির্দেশ বন্ধ করা গেল না। এখন কি করবে?

পাঁচ

নানা অসুবিধার কারণে পরদিন সকালের আগে ছাউনিতে মিলিত হতে পারল না গোয়েন্দারা।

মিস্টার বারগারের সঙ্গে যা যা আলোচনা হয়েছে, রবিন আর ফারিহাকে জানাল কিশোর। শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল ফারিহার।

'কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না তাঁকে,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল কিশোর। 'আমরা ঢোকার পর খুব ভাল আচরণ করলেন আমাদের সঙ্গে। যেই রেডরোজ কটেজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গেলাম, অমনি গেলেন রেগে।'

'একটা কথাই বার বার বোঝানোর চেষ্টা করলেন,' মুসা বলল, 'রাস্তাটা হলে গাঁয়ের খুব উন্নতি হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধে হবে, বেকার মানুষ কাজ পাবে। কিন্তু রেডরোজ কটেজ বাদ দিয়ে রাস্তা নিলে কেন উন্নতি হবে না, এটা বোঝাতে পারলেন না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে, একটা রহস্য! মোটেও স্বাভাবিক আচরণ করেননি মিস্টার বারগার···

ঝিমুচ্ছিল টিটু, ঝট করে মাথা তুলল হঠাৎ। পুরোপুরি সজাগ। দরজার দিকে তাকিয়ে মৃদু গরগর করে উঠল।

'কে এল আবার!' দরজা খুলতে উঠে দাঁড়াল রবিন।

'দাঁড়াও!' বাধা দিল ওকে কিশোর, 'দেখো আগে, তারপর খোলো···যাকে তাকে ঢুকতে দেয়া যাবে না।'

'ঝামেলা র‍্যাম্পারকট না তো?' মুসার প্রশ্ন।

'না, সে তো ট্রেনিং দিতে চলে গেছে, এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয়। থাকলেই বরং ভাল হত। এই রাস্তার "ঝামেলা" কি করে সামলায়, দেখতাম।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন।

টোকা পড়ল দরজায়।

একটা ফুটোয় চোখ রাখল রবিন। একবার দেখেই হাসি ফুটল মুখে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

ছোটখাট একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। পাটকাঠির মত সরু সরু হাত পা। ঢোলা গেঞ্জি পরেছেন, বুকের কাছে ইংরেজি লেখাটার মানে করলে দাঁড়ায় : **শান্তির সন্ধানে**। ইয়া বড় এক স্ট্র হ্যাট পরেছেন মাথায়, তাতে ফুলের ছড়াছড়ি। পরনে সুতি কাপড়ের ঢোলা প্যান্ট, পায়ে টকটকে লাল নরম জুতো।

'আসুন, আসুন, মিস চেরি!' হেসে বলল রবিন। 'আপনি এ সময়ে?'
'তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম,' হাসলেন মিস চেরি।
উঠে গেল টিটু। মিস চেরির হাতে একটা ঝুড়ি, সেটা শুঁকতে লাগল।
'কি রে, গন্ধ পেয়ে গেছিস?' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন মিস চেরি। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'এটা তোমাদের ক্লাব নাকি?'
'না, হেডকোয়ার্টার,' কেউকেটা ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। উল্টে রাখা একটা খালি বাক্স দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'
কিশোর আর মুসার সঙ্গে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিল রবিন।
তখনও ঝুড়ি শুঁকছে টিটু।
'সহ্য হচ্ছে না নাকি তোর। দাঁড়া, দিচ্ছি,' ঝুড়িতে হাত ঢোকালেন মিস চেরি। বড় একটা প্লাস্টিকের ঢাকনাওয়ালা বাটি বের করলেন। ঢাকনা খুললেন।
গলা বাড়িয়ে দিল মুসা। কি আছে দেখে বলল, 'বাহ্, স্ট্রবেরির জেলি! দারুণ! আমার খুব ভাল লাগে খেতে!'
ছাউনিতে পিরিচ নেই। কিসে নেয়া যায়? মেরিচাচীর রান্নাঘর থেকে গিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিল ফারিহা। আনতে সময় লাগবে। অতক্ষণ তর সইবে না মুসার। বাটিটা মিস চেরির হাত থেকে নিয়ে হাত দিয়েই খাওয়া শুরু করে দিল সে।
'আরে আরে, তোমার হাত তো ধোয়া না!' ফারিহা বলল।
'আরে দূর, মা আছে নাকি যে দেখবে,' আরেক খাবলা জেলি তুলে মুখে পুরল মুসা। টিটুকে দিল এক খাবলা।
বাকি তিনজন দেখল, তাকে সুযোগ দিলে একাই সব শেষ করে ফেলবে। ওরাও এসে হাত লাগাল।
বাক্সে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন মিস চেরি।
বাটিটা সাবাড় করে ফেলতে মিনিটখানেকও লাগল না। চেটেপুটে খেয়ে ঢাকনা লাগিয়ে মিস চেরির দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা। 'দারুণ জিনিস বানিয়েছেন!'
খুশি হলেন মিস চেরি। বাটিটা নিয়ে ঝুড়িতে রেখে দিয়ে বললেন, 'খেতে পারা মানুষকে আমার খুব পছন্দ।'
রবিন বলল মুসাকে, 'কাল আমাদের কি খাইয়েছেন জানো? ফ্রুট কেক।'
চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা, 'তাই নাকি! তাহলে তো ভুল হয়ে গেল, জেলির ভাগ তোমাদের দেয়া উচিত হয়নি!'
মুসার আফসোস দেখে জোরে হেসে ফেললেন মিস চেরি। বললেন, 'তুমি যেয়ো, তোমাকেও বানিয়ে খাওয়াব। হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছি—রবিন, তোমরা কাল বলে এলে আমাদের পাশে দাঁড়াবে, সাহায্য করবে, সেটা কি এখনও ভাবছ?'
'ভাবছি মানে কি,' জবাব দিল কিশোর, 'সেটা নিয়েই তো আলোচনা

করছি আমরা। কি করব বুঝতে পারছি না।'

'রেডরোজের বাসিন্দারা এখনও যারা আছে, সবাই একজোট হয়েছি। একটা প্ল্যান করেছি। সঙ্গে করে মালমশলাও সব নিয়ে এসেছি···এই দেখো···'

ঝুড়ি থেকে বের করলেন তিনি কাগজের প্যাকেট, রঙের টিন, তুলি। কি করতে হবে, বুঝিয়ে বললেন গোয়েন্দাদের। প্ল্যানটা ওদেরও মনে ধরল। কাজে লেগে গেল। ঘন্টাখানেক পর কেউ যদি হঠাৎ করে ছাউনিতে ঢুকে পড়ত, দেখত একটা আর্টিস্টের স্টুডিওতে পরিণত হয়েছে ওটা। সবাই ব্যস্ত। কেউ তুলি দিয়ে লিখছে, কেউ কাগজ কাটছে, ওদের দলনেত্রী মিস চেরি। বড় একটা কার্ডবোর্ড বের করে নিচে বাক্স বসিয়ে টেবিল তৈরি করে নিয়েছে কিশোর আর রবিন। কাগজ কেটে ব্যানার তৈরি করে দিচ্ছেন মিস চেরি, তাঁকে সাহায্য করছে মুসা আর ফারিহা।

শ্লোগান লিখছে কিশোর আর রবিন।

'লাল রঙে লেখা উচিত,' কিশোর বলল, 'লাল ফুটে থাকে।'

মাঝে মাঝে উঠে এসে লেখা তদারকি করছেন মিস চেরি। কিশোরের হাত থেকে তুলি নিয়ে ছোট হাতের i অক্ষরগুলোর ফোঁটার চারপাশে ফুলের পাপড়ি এঁকে অলঙ্করণ করে দিলেন, t অক্ষরের দুই মাথা এঁকে দিলেন প্রজাপতির ডানার মত করে।

টিটুর কোন কাজ নেই। কি হচ্ছে কিছু বুঝতেও পারছে না। একবার এর কাছে একবার ওর কাছে ঘুরছে, কৌতূহলী হয়ে দেখছে, শুঁকছে। ছেলেমেয়েদের আগ্রহ আর আন্তরিকতা দেখে মন ভরে উঠল মিস চেরির। এই প্রথম আশা হলো তাঁর, প্রতিবাদ আন্দোলন সফল হবে।

ছয়

পরদিনের মধ্যে সব কিছু রেডি করে ফেলা হলো আন্দোলনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন মিস চেরি, প্রতিবাদ শুরু করার সবচেয়ে ভাল সময় দুপুরবেলা। ওই সময় ব্যস্ত হয়ে ওঠে গাঁয়ের রাস্তাগুলো। দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্যে বাড়ি ফেরে কিংবা খাবারের দোকানে যায় সর্বস্তরের মানুষ।

দলবল নিয়ে সময় মত বেরিয়ে পড়লেন তিনি। গোয়েন্দারা নিল ওদের সাইকেল, তিনি নিলেন তাঁর লাল রঙের স্কুটারটা।

সাইকেলের ক্যারিয়ারের সঙ্গে বেঁধে ছোট দুটো ট্রেলার টেনে নিয়ে চলেছে মুসা আর কিশোর। ওগুলোতে বোঝাই লিফলেট, পোস্টার, ব্রাশ আর আঠার টিন। রবিন তার সাইকেলের সঙ্গে ছোট একটা মই বেঁধে নিয়েছে।

মইটা ইচ্ছেমত ভাঁজ করা যায়, খোলা যায়। ফারিহা আর মিসেস চেরিকে কোন বোঝা বহন করতে হচ্ছে না। মিছিলের আগে আগে দৌড়ে চলেছে টিটু। লোকজন দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে উঠে যেন বলার চেষ্টা করছে, 'অ্যাই মিয়ারা, সরো, সরো, আমাদের মিছিল আসছে!'

সবার পেছনে ছিলেন মিস চেরি, হঠাৎ পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এলেন। চিৎকার করে বললেন, 'থামো!'

ঘ্যাচাঘ্যাঁচ ব্রেক কষে ধরল সবাই।

বড় রাস্তার মোড়ে দুই পাশে বড় দুটো গাছ দেখালেন মিস চেরি। গাঁয়ের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকাগুলো থেকে এ পথেই বিভিন্ন দিকে যেতে হয় মানুষকে। লোক চলাচল বেশি। এখানে পোস্টার লাগালে বেশি লোকের চোখে পড়বে।

দ্রুতহাতে মই খুলে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ধরল রবিন। তাতে উঠে গেল মুসা। পোস্টার বের করে দিল ফারিহা। সেগুলোতে আঠা লাগিয়ে মুসার দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। পথচারীদের লিফলেট বিতরণ করতে লাগলেন মিস চেরি।

গাছের গায়ে পোস্টার লাগানো শেষ করল মুসা। লিফলেটও অনেক বিতরণ হয়েছে। এইবার আসল কাজটা বাকি। অনেক বড় একটা কাপড়ে শ্লোগান লিখে আনা হয়েছে। দড়ি দিয়ে সেটা দুটো গাছের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে, যাতে কাপড়টা রাস্তার অনেক ওপরে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলে থাকে।

কাপড়ের কোণায় বাঁধা দড়ির একমাথা কোমরে পেঁচিয়ে একটা গাছে উঠে গেল মুসা। গাছের গায়ে সেই প্রান্তটা বেঁধে নেমে এল। অন্য মাথাটা রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে অন্য পাশে নিয়ে যেতে ওকে সাহায্য করল অন্যরা। রাস্তার মাঝখানে ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেলেন মিস চেরি। থেমে যেতে বাধ্য হলো কয়েকজন বিস্মিত মোটর চালক।

মুসাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বললেন মিস চেরি।

রাস্তা পার হয়ে গিয়ে অন্য গাছটায় উঠল মুসা। দড়ির আরেক মাথা বেঁধে দিল গাছের সঙ্গে। পড়া যাচ্ছে এখন ব্যানার। পথচারীরা দেখল তাতে লেখা রয়েছে:

মহাসড়ক চাই না!

রেডরোজকে বাঁচান!

রাস্তা থেকে সরে গেলেন মিস চেরি। আবার চলতে আরম্ভ করল যানবাহন।

বিতরণ করার পর লিফলেট যা বাকি রইল, ট্রেলারে রেখে দেয়া হলো। এখানে কাজ শেষ। অন্য জায়গায় পোস্টার লাগাতে চলল ওরা।

বেশি দূর যাওয়া লাগল না, বিশাল একটা সাইন বোর্ড পাওয়া গেল। এক বোর্ডেই বেশ কয়েকটা বিজ্ঞাপন। স্কুটার থামিয়ে ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস চেরি। একটা বিজ্ঞাপনের উজ্জ্বল রঙে আঁকা ছবি আর লেখা

পড়ে নাক কুঁচকে বললেন, 'আহ্, বাসন ধোয়ার পাউডার! মাথার ওপর ছাদই যদি না থাকল, বাসন ধুয়ে কি হবে? আগে ঘর বাঁচানো দরকার।' নিজেদের একটা পোস্টার দিয়ে পাউডারের প্যাকেটের ছবি ঢেকে দিলেন তিনি। ব্লেন্ডার মেশিন আর ইলেক্ট্রিক কফি পটের ছবি দেখিয়ে বললেন, 'ঢেকে দাও ও সব। ঘর না থাকলে ওগুলো কিনে রাখবে কোথায় লোকে?'

ফারিহার মনে হলো, খুব যুক্তি সঙ্গত কথা।

মুসার আফসোস হতে লাগল ফগর‍্যাম্পারকটের জন্যে। এ সময় সে থাকলে বাধা তো দিত অবশ্যই। লেগে যেত মিস চেরির সঙ্গে। লোকটার চেহারার অবস্থা কি হত দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। কি যুক্তি দেখাত? বিপদে পড়ে যেত বেচারা, আর 'ঝামেলা! ঝামেলা!' করত

পোস্টার লাগাতে দেরি হলো না।

পিছিয়ে এসে স্কুটারের সীটে বসে বোর্ডটার দিকে তাকালেন মিস চেরি। তিনি যে পোস্টারটা লাগিয়েছেন তাতে বড় একটা রাস্তাকে ক্রস এঁকে কেটে দেয়া হয়েছে। নিচে লেখা:

হাইওয়ে চাই না!

ফলের রসের ওপর লাগানো পোস্টারটা এঁকেছে মুসা। তাতে মিস্টার বারগারের একটা কার্টুন ছবি এঁকে নিচে লিখে দিয়েছে:

তিরিশজন অসহায় মানুষকে
ঘর ছাড়া করার অপরাধে
একে পুলিশে ধরিয়ে দিন!

কফি পটের ওপরের পোস্টারটা রবিন এঁকেছে। তাতে দেখানো হয়েছে বিশাল এক রোমশ থাবা মিস চেরির মত দেখতে ছোটখাট একজন মহিলাকে চিপে ভর্তা বানাচ্ছে।

পোস্টার লাগানো শেষ করে গাঁয়ের সবচেয়ে বড় খাবারের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। লোকজন ঢুকছে, বেরোচ্ছে; তাদেরকে লিফলেট বিতরণ করতে লাগল। আগের দিন কম্পিউটারের প্রিন্টার দিয়ে ছেপে নিয়েছে ওগুলো। লিখেছে:

*রেডরোজ কটেজের ভেতর দিয়ে কোন নতুন হাইওয়ে চাই না!

*তিরিশজন অসহায় বুড়ো মানুষকে জোর করে রাস্তায় বের করে দেবে, এ রকম একটা অন্যায় কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখবেন আর সহ্য করবেন আপনি?

*রেডরোজের ভেতর দিয়ে না নিয়ে অন্য কোনখান দিয়ে হাইওয়ে নিতে বলার জন্যে জনমত গড়ে তুলুন।

*যদি আপনার মনে হয়, তিরিশজন বুড়ো মানুষকে তাদের শেষ আস্তানা থেকে বের করে দেয়াটা অন্যায়, তাহলে আমাদের আন্দোলনে শরীক হয়ে আমাদের দল ভারী করুন, আমাদের সাহায্য করুন, প্লীজ।

নিচে রেডরোজের প্রতিবাদীদের পক্ষে সই করেছেন মিস চেরি।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার, যাদেরকে লিফলেট বিতরণ করা হলো, তারা

তখন এতটা ব্যস্ত, ওটা পড়ার সময় হলো না অনেকেরই। অনেকে দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না, দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'হতাশ হয়ো না,' ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিলেন মিস চেরি। 'মাত্র তো শুরু করলাম, আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

স্কুটারে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন তিনি। চারজন ছেলে-মেয়ে আর একটা কুকুরের ছোট্ট মিছিলটা নিয়ে রওনা হলেন পাশের গাঁয়ে।

সেদিন বিকেল হতে হতে আশপাশের চারটে গ্রামের গাছ আর বিজ্ঞাপনের সাইন বোর্ডে পোস্টার লাগাল ওরা, পথচারীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করল।

বিকেল বেলা ম্যানেজারকে নিয়ে খামার দেখতে বেরোলেন মিস্টার বারগার। গাঁয়ে ঢুকে তো থ! নানা রকম পোস্টার।

'কাণ্ডটা দেখলেন, স্যার!' ম্যানেজার বলল। 'আপনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে! দেব নাকি মানহানির কেস ঠুকে?'

'না,' মানা করলেন মিস্টার বারগার।

ডোভারভিল গাঁয়ের পথের মোড়ে একটা সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে গাড়ি থামিয়ে ফেলল ম্যানেজার। পোস্টারে মিস্টার বারগারের কার্টুন ছবি এঁকে তাঁকে ধরিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন মিস্টার বারগার। ম্যানেজারকে শুনিয়ে যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন, 'এ সব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। রাস্তা একবার তৈরি হয়ে গেলে কটেজ ভাঙার কথা আর মনে রাখবে না লোকে।'

ম্যানেজারকে শোনালেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না আর, অত সহজে রেডরোজ কটেজ ভাঙা সম্ভব হবে।

সাত

'ওই যে, আসছে ওগুলো! তিনটা!' চিৎকার করে জানাল মুসা। সকালেই খবর পেয়েছে, কটেজ ভাঙতে বুলডোজার আসবে আজ। কখন আসে, আগে থেকে দেখে হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে গাছে চড়ে বসে আছে। আর থাকার দরকার নেই। নামতে শুরু করল সে।

গাছের গোড়ায় জমায়েত হয়েছে জনা বারো লোক। ডোজার আসছে শুনেই রাগে চেঁচাতে শুরু করল। রেডরোজের এই ক'জন বাদে বাকি সবাই চলে গেছে। সাহসে বুক বেঁধেছে এরা, মিস চেরির নেতৃত্বে কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, এত সহজে হাল ছাড়বে না। শেষ দেখবে এর।

'ঘউ! ঘউ!' করে উঠল টিটু। টের পেয়ে গেছে উত্তেজনাটা। অনুমান

করে ফেলেছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

'তৈরি হও সবাই,' চিৎকার করে বললেন মিস চেরি, 'বাধা দিতে হবে ওদের! কিছুতেই ঢুকতে দেয়া চলবে না!'

'ঝাঁটা পেটা করব আজ ব্যাটাদের!' হাতের ঝাড়ু নেড়ে বললেন এক বৃদ্ধা।

তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। হাতে একটা পুরানো শটগান। এমন ভঙ্গিতে দোলালেন, যেন ডেস্ট্রয়ার বিধ্বংসী কামান, বুলডোজার তো এর কাছে ফুঁ।

চমকে গেলেন মিস চেরি, 'গুলি করবেন নাকি! না না, আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করব কেবল, খুনজখম চাই না!'

তাঁকে অভয় দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'রক্ত আমারও ভাল লাগে না। ব্যাটাদের ভয় দেখাব খানিক।'

'যদি হাত ফসকে গুলি ছুটে যায়?'

হাসলেন বৃদ্ধ, 'যাবে না। নষ্ট বন্দুক। গুলিও নেই ভেতরে।'

'ও, তাহলে ঠিক আছে,' স্বস্তি পেলেন মিস চেরি।

রওনা হলো প্রতিবাদ মিছিল। কোন শ্লোগান নেই, চিৎকার-চেঁচামেচি নেই। সবার সঙ্গে নীরবে হাঁটছে তিন গোয়েন্দা, ফারিহা আর টিটু। রেডরোজ কটেজের জন্যে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে ফারিহার। মনে হচ্ছে কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে ছোট ছোট বাড়িগুলো, ধ্বংসের ভয়ে কাতর। জানালা বন্ধ, খড়খড়ি নামানো, কোন বারান্দায় ফুলের টব নেই। আঙিনায় ছুটাছুটি করছে না কুকুর-বেড়াল, তাড়া করছে না একে অন্যকে। পরিত্যক্ত লাগছে এলাকাটাকে। ওর মনে হলো, গাছের পাখিরাও যেন মন খারাপ করে রেখেছে, খোলা মনে আর গান গাইছে না।

এই ব্যাপারগুলো মুসাও লক্ষ করেছে। বলল, 'ভূতুড়ে লাগছে!'

মাথা দুলিয়ে রবিনও একমত হলো।

সবার আগে আগে হাঁটছেন মিস চেরি। সামনের দিকে নজর। উঁচু টিবিটার ওপাশে রয়েছে বুলডোজারগুলো। হাই-হিল পরেছেন তিনি। হাঁটার তালে খট-খট খট-খট আওয়াজ তুলছে জুতোর তিন ইঞ্চি লম্বা গোড়ালি। হাতের প্রজাপতি ধরার জালটা ওপর দিকে তোলা, যেন ওটাই তাঁর যুদ্ধের অস্ত্র। মাথার বিশাল হ্যাটটা এমন করে বার বার টেনে নামাচ্ছেন, মনে হচ্ছে হেলমেট, কপালে গুলি লাগা ঠেকাতে চাইছেন। তাতে গুঁজে দিয়েছেন টকটকে লাল দুটো ফুল। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে চলেছেন।

চারপাশ থেকে দেহরক্ষীর মত তাঁকে ঘিরে এগোল গোয়েন্দারা।

শেষ কটেজটার বাগানের বেড়া পার হয়েছে ওরা, এই সময় দেখা গেল শত্রুপক্ষকে। পঞ্চাশ টনের একেকটা দৈত্য, লোহা আর ইস্পাতে তৈরি, সামনে বাড়িয়ে উঁচু করে রেখেছে দাঁতওয়ালা চোয়ালের বিশাল দাঁড়া।

'সারি দিয়ে দাঁড়াও সবাই!' আদেশ দিলেন মিস চেরি।

মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াল বুড়ো-বুড়ি আর গোয়েন্দারা লম্বা একটা সারি তৈরি করল। প্রজাপতির জাল উঁচু করে সামনে হেঁটে গেলেন মিস চেরি। ডোজারগুলোর চেহারা পছন্দ হলো না টিটুর, দৈত্যগুলোকে ভেংচি কাটার জন্যে তাই তাঁর সঙ্গে গেল।

'আর একটা ইঞ্চি এগোবেন না!' বিরাট ইঞ্জিনের বিকট শব্দকে ছাপিয়ে ড্রাইভারদের উদ্দেশে জাল নেড়ে চিৎকার করে বললেন মিস চেরি। 'কোন সাহসে আমাদের বাসা ভাঙতে এসেছেন আপনারা!'

শক্ত কাঁচে ঘেরা ক্যাবে বসে আছে তিন ডোজারের তিন ড্রাইভার। অবাক হয়ে গেছে। এ রকম পরিস্থিতে পড়তে হবে, বোধহয় বলে দেয়া হয়নি ওদের। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। ভাবল বোধহয়, খানিকটা ভয় দেখালে কেমন হয়? ইঞ্জিনের শব্দ বাড়িয়ে দিল। সেই সঙ্গে আরও কিছুটা ওপরে তুলে নাড়াতে লাগল দাঁড়ার মাথার ভয়াল চোয়ালগুলো।

'আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে!' রেগে গিয়ে বললেন মিস চেরি। দলের লোককে বললেন, 'অ্যাই, সরবে না কেউ!'

হ্যাটটা টান দিয়ে মাথায় আরও চেপে বসিয়ে গটমট করে গিয়ে ঢুকলেন কাছের বাগানটায়। পড়ে থাকা একটা মই তুলে নিয়ে এলেন। ধড়াস করে বুলডোজারের সামনে মাটিতে ফেলে যোদ্ধাদের বললেন, 'এসো সবাই, আমাকে সাহায্য করো, ব্যারিকেড দেব!'

'দারুণ বুদ্ধি তো!' বলে উঠলেন এক বৃদ্ধ। 'মিস চেরির জেনারেল হওয়া উচিত ছিল!'

প্রায় প্রতিটি বাগানের কোণেই একটা করে ছাউনি আছে। সেগুলোতে যে যা পেল বের করে নিয়ে আসতে লাগল। মুসা নিয়ে এল কতগুলো তক্তা। তারপর একটা পুরানো বাতিল সেলাই মেশিন। রবিন আনল বাগান সাজানোর জন্যে রাখা কয়েকটা বড় বড় পাথর। কিশোর ঠেলে আনল ছোট একটা ঠেলাগাড়ি। ফারিহা কতগুলো খালি টব।

বুলডোজারের সামনে বাতিল জিনিসের স্তূপ হয়ে গেল। ব্যারিকেড দিয়ে রেডরোজ কটেজে ঢোকার মুখটা বন্ধ করে দেয়া হলো। যদিও জানে সবাই, এ সব জিনিস বুলডোজারকে রুখতে পারবে না। সহজেই মাড়িয়ে চলে যাবে। তবু একটা বাধা তো সৃষ্টি করা হলো।

কিশোরের আনা ঠেলাগাড়িটায় উঠে দাঁড়ালেন মিস চেরি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখি, যান তো এবার?'

নড়ল না ড্রাইভাররা। চুপ করে বসে আছে। এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কিছু।

'কি, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠলেন মিস চেরি। 'সাহস হচ্ছে না, কাপুরুষের দল!'

ঘাবড়ে গেল মুসা, তাড়াতাড়ি চলে এল কিশোরের পাশে। ফিসফিস

করে বলল, 'এ রকম করে বকা দিলে রেগে যাবে তো ওরা! শেষে আর কিছুই মানবে না, দেবে ডোজার চালিয়ে!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'ওদের রাগানো ঠিক হবে না। রেগে গেলে আর হুঁশ থাকবে না। কিছু একটা করা দরকার।'

সঙ্গীদের ওখানে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে গেল সে। ব্যারিকেড ডিঙিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ডোজারগুলোর একেবারে সামনে। তার মাথার ওপরে শূন্যে দাঁড়া দোলাতে দোলাতে এখনও হুমকি দিচ্ছে তিনটে দৈত্য। পরোয়া করল না সে। চিৎকার করল না, আস্তে কেবল ডান হাতটা তুলল ড্রাইভারদের উদ্দেশে।

ছোট একটা ছেলেকে চোয়ালের নিচে এসে দাঁড়াতে দেখে দুর্ঘটনার ভয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ড্রাইভারেরা। বন্ধ হয়ে গেল বিকট শব্দ।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল কিশোর, বাইরের লোক আসতে আরম্ভ করেছে। পোস্টারে কাজ হচ্ছে মনে হয়। ওদেরকে এখন প্রতিবাদী করে তুলতে পারলেই হয়। 'জনতাই শক্তি'—মনে মনে শ্লোগান দিল সে।

পেছন থেকে চিৎকার করে বলল মুসা, 'চুপ করে আছ কেন, কিশোর, সব বলো ওদের!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো!' সুর মেলাল রবিন আর ফারিহা। 'শুনিয়ে দাও সবাইকে!'

লাফ দিয়ে ব্যারিকেড ডিঙিয়ে এসে কিশোরের পাশে দাঁড়াল টিটু। জোরে ঘেউ ঘেউ করে যেন ওকে সাহস জোগাল: কিশোর ভাই, এগিয়ে যাও, আমরা আছি তোমার সাথে!

ড্রাইভারদের উদ্দেশে বলল কিশোর, 'কি করতে এসেছেন আপনারা? বাড়ি ভাঙতে? ওগুলো ফেলে যাওয়া পুরানো বাড়িঘর নয়, তিরিশজন বুড়ো মানুষের শেষ আশ্রয়। অবসর নেয়ার পর এখানে বাস করতে এসেছিলেন ওঁরা, শান্তিতে থাকতে এসেছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন সব ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে এসেছেন আপনারা। কেন? বলুন? জবাব দিন? জানি, জবাব দিতে পারবেন না, জবাব নেই। যা করতে এসেছেন, সেটা অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়! ব্যস, আর কিছু বলার নেই আমার।'

শেষ দিকে কণ্ঠ চড়ে গিয়েছিল কিশোরের। থামল যখন, চারপাশটা পুরোপুরি নীরব। তার দিকে তাকিয়ে থাকা তিনজন ড্রাইভারের মুখে রা নেই। ওরা কল্পনাই করেনি ওরকম বয়েসের একটা ছেলে, একটা কিশোর এমন করে বক্তৃতা দিতে পারে।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করলেন মিস চেরি হাততালি দিয়ে। অন্যরাও সরব হয়ে উঠল। হাততালি দিল। চিৎকার করে সমর্থন জানাল কিশোরকে।

কৌতূহলী জনতার ভিড় বাড়ছে। এগিয়ে আসছে। রেডরোজবাসীদের পক্ষে কথা বলছে। কাজ হয়েছে পোস্টারে, কোন সন্দেহ নেই। ছড়িয়ে পড়েছে খবর। এগিয়ে এসে কিশোরকে সমর্থন করে কথা বলতে লাগল ওরা,

ড্রাইভারদের গাল দিতে লাগল কেউ কেউ।

এমন কাণ্ড আর দেখেনি টিটু, উত্তেজিত হয়ে নাচাকুদা শুরু করল।

বিমূঢ় হয়ে গেছে ড্রাইভাররা। জোর করে ডোজার চালাতে গিয়ে জনতার রুদ্র রোষের শিকার হতে চাইল না। ক্যাব থেকে প্রায় একসঙ্গে বেরিয়ে এল তিনজনে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল।

'শোনো, খোকা,' কিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল ড্রাইভারদের মধ্যে বয়স্ক লোকটা, 'কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নেই আমাদের। আমাদের যা হুকুম দেয়া হয়েছে, তাই করতে এসেছি।'

'অন্যায় হুকুম দেয়া হয়েছে আপনাদের,' কিশোর বলল, 'এখানে রাস্তা বানানো চলবে না। বাড়ি ভাঙতে দেব না আমরা।'

'কিন্তু রাস্তার কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই,' বলল দ্বিতীয় ড্রাইভার।

'ওসব বুঝি না। ভাঙতে দেব না, ব্যস,' সমর্থনের আশায় জনতার দিকে তাকাল কিশোর।

জনতা সমর্থন করল ওকে। কেউ কেউ বলল, 'এত জায়গা থাকতে লোকের বাড়ি ভাঙতে এসেছ কেন? যাও, অন্য জায়গায় রাস্তা বানাওগে।'

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ড্রাইভাররা। দ্বিতীয়জন বলল, 'ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'হুঁ, সেই ভাল,' একমত হলো তৃতীয় ড্রাইভার। 'এখানে জোরাজুরি করে মার খাব নাকি!'

বয়স্ক লোকটা চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল ফোরম্যানকে নিয়ে।

জনতার ভিড় দেখে ফোরম্যানও দ্বিধায় পড়ে গেল। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল, 'এখানে যে এই অবস্থা তা তো বলেনি আমাকে ওয়ার্ক ম্যানেজার!'

'তাহলে হাবার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন!' ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচামেচি শুরু হলো, 'যাও না, ম্যানেজারকেই ডেকে আনো না! মানুষের বাড়ি ভাঙার হুকুম দেয়ার সময় খবর থাকে না?'

ওয়ার্ক ম্যানেজারকে খবর দেয়া হলো। জীপে চড়ে এল সে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে এসে দাঁড়াল জনতার সামনে, 'কি হয়েছে?'

বাড়ি ভাঙতে দিচ্ছে না, জানাল তাকে ফোরম্যান।

ব্যারিকেডের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ চেরি বললেন, 'বাড়ি ভাঙা তো দূরের কথা, এর এপাশেই আসতে দেয়া হবে না আপনাদের!'

'হ্যাঁ, দেব না!' পেছন থেকে মুঠোবদ্ধ হাত তুলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন রেডরোজের অন্য বাসিন্দারা, 'কিছুতেই দেব না!'

ম্যানেজারের সামনে এগিয়ে গেল কিশোর। তার পাশে এসে দাঁড়াল

মুসা, রবিন, ফারিহা আর টিটু। কিশোর বলল, 'মানুষকে জোর করে বের করে দিয়ে ওদের ঘর ভেঙে ফেলবেন, এটা কি ধরনের অন্যায়?'

ফারিহা বলল, 'আপনারা ওদের মেরে ফেলতে চান?'

ফোরম্যান আর ড্রাইভারদের মতই দ্বিধায় পড়ে গেল ম্যানেজার। একবার বুড়োদের দিকে, একবার জনতার দিকে, একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে লাগল। কিশোরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'সব কটেজের মানুষ আছে এখানে?'

'না, বারো-তেরোজন।'

'ওদের ঘরে ফিরে যেতে বলো। আপাতত ওই কটেজগুলো ভাঙা হবে না।'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা, 'ওহ্, থ্যাংক ইউ, স্যার!'

ব্যারিকেড দেখিয়ে ম্যানেজার বলল, 'যাও, দাবি তো আদায় হলো, এখন ওগুলো সরাও। বুলডোজার ঢুকুক। বাকি কটেজগুলো ভাঙবে।'

একচুল সরল না কিশোর, 'দাবি কোথায় আদায় হলো? এখানকার কোন কটেজই ভাঙতে দিতে চাই না আমরা। রেডরোজ ভেঙে রাস্তা নেয়া চলবে না।'

'কিন্তু সেটা ঠিক করার মালিক তো আমি নই।'

'কে মালিক?'

'টিডিআর কোম্পানি।

'তাহলে তাদের কাউকেই ডাকুন। কাকে ডাকবেন সেটা আপনি জানেন। মোট কথা, কটেজ আমরা ভাঙতে দেব না।'

গাড়িতে চড়ে চলে গেল ম্যানেজার।

হেসে ফেলল রবিন, 'এ ভাবে একজনের পর একজন যেতে থাকলে, শেষে প্রেসিডেন্ট আসতে না বাধ্য হন!'

ঘণ্টাখানেক পর দামী একটা কালো গাড়ি এসে থামল রেডরোজ কটেজের সামনে। সেটা থেকে যিনি নামলেন, তাঁর নাম ওয়াটসন, টিডিআর কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ; চেহারা আর বেশভূষায় প্রেসিডেন্টের চেয়ে কম কিছু না। দামী টাই, স্যুট পরা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন প্রতিবাদীদের সামনে। সামান্য মাথা নেড়ে ভারী গলায় জানতে চাইলেন, 'আপনারা নাকি কটেজ ভাঙতে বাধা দিচ্ছেন?'

সব কথা জানানো হলো তাঁকে।

তৈরিই ছিল কিশোর আর রবিন, একটা বড় সার্ভে ম্যাপ বের করে ছড়িয়ে ধরল তাঁর সামনে। 'এই যে দেখুন, স্যার, আরও অনেক জায়গা আছে। রাস্তাটা অন্য কোনখান দিয়ে নিলে হয় না?'

'না, হয় না,' কিছুটা কঠিন স্বরেই জবাব দিলেন মিস্টার ওয়াটসন, 'মাটি ভাল না হলে রাস্তা বসে যাবে।'

'কিন্তু দেখুন,' ম্যাপে আঙুল রেখে তর্ক শুরু করল রবিন, 'অনেক বড়

একটা ফ্যাক্টরি এই যে এখানটায় কিছুদিন আগে উঠেছে…এই যে এখানে তৈরি হয়েছে একটা হেলথ সেন্টার…আর এই এখানে শত শত বছর আগে তৈরি হয়েছিল টগারফ ক্যাসল। মাটি খারাপ হলে পাথরে তৈরি এত ভারী একটা দুর্গ তো অনেক আগেই বসে যেত, কিছুই তো হয়নি। এখানে সব জায়গার মাটি একই রকম। জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমার বাবার এক বন্ধু বিরাট এক ফার্ম করেছেন, অনেক গরু পালেন, চাষের জমি আছে, কোনটাই তো নষ্ট হচ্ছে না।'

ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার ওয়াটসন। ম্যাপটা নিয়ে ভাঁজ করে তাঁর হাতে রেখে দিয়ে বললেন, 'মাটি বিশেষজ্ঞ মনে হচ্ছে! দেখো খোকা, ফার্ম আর রাস্তা এক জিনিস নয়। তা ছাড়া বাধা দিচ্ছ কোন অধিকারে? এই জায়গার মালিক মিস্টার বারগার, তিনি নিজে টিডিআর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। এখন সেখানে রাস্তা হোক কি না হোক, সেটা কারও দেখার ব্যাপার নয়। আমরা বেআইনী কিছু করছি না।'

'বেআইনী করছেন না, তবে অন্যায় করছেন,' ঠেলাগাড়িতে দাঁড়ানো মিস চেরি মুখ খুললেন এতক্ষণে, 'মানুষের মানবিক অধিকারে আঘাত করাটা বিরাট অন্যায়।'

তাঁর সুরে সুর মেলাল জনতা।

ফিরে তাকালেন মিস্টার ওয়াটসন। 'ও, তাহলে আপনিই এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি,' গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলেন মিস চেরি। 'ধমক দিয়ে কথা বলেন কেন?'

গুঞ্জন করে উঠল জনতা।

কিছুটা নরম হলেন মিস্টার ওয়াটসন, 'আমরা ব্যবসা করছি, ম্যাডাম, কাউকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে কোম্পানি খুলিনি। প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র আছে।'

'রাখুন আপনার কাগজপত্র! এই যে আমি দাঁড়ালাম, চালান আপনার বুলডোজার। আমাকে না মেরে ব্যারিকেড পার হতে পারবেন না।'

'না না, কি যে বলেন, মারব কেন!'

'তাই তো করতে এসেছেন। ঘর ভেঙে দিলে কোথায় যাব আমরা? রাস্তায় পড়ে মরব। দিন গায়ের ওপর বুলডোজার চালিয়ে, সেটাই বরং ভাল, এক মুহূর্তে ঝামেলা-যন্ত্রণা শেষ।'

চিন্তা করে বললেন মিস্টার ওয়াটসন, 'ঠিক আছে যান, আরও চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। থাকুন। ইতিমধ্যে আমি মিস্টার বারগারের সঙ্গে কথা বলে দেখব কি করা যায়।'

'এই তো ভদ্রলোকের মত কথা!' খুশি হয়ে হ্যাট থেকে একটা লাল ফুল খুলে নিয়ে রিপ্রেজেনটেটিভের কানে গুঁজে দিলেন মিস চেরি।

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না মিস্টার ওয়াটসনের। কান থেকে খুলে আনলেন ফুলটা। কিন্তু মিস চেরি মনে কষ্ট পেতে পারেন ভেবে ফেলে না দিয়ে কোটের বাটনহোলে গুঁজে রাখলেন। তারপর বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

মুসা বলে উঠল, 'এটা কি করলেন, মিস চেরি; মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা থাকার জন্যে এত ঝামেলা করলাম?'

'চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময়,' হেসে বললেন মিস চেরি। 'ইতোমধ্যে কত কিছু ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া একটা ব্যাপার পরিষ্কার, জিততে আরম্ভ করেছি আমরা। মানুষ আমাদের পক্ষে।' জনতার দিকে ফিরে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাদের, আমাদের দুঃখে শামিল হয়েছেন…'

কথা শেষ হলো না তাঁর। শোনা গেল তীক্ষ্ণ সাইরেন।

আট

তীব্র গতিতে ছুটে গেল দমকলের গাড়ি।

তাড়াতাড়ি গাছে উঠে দেখল মুসা, কোনদিকে যায়। চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, আগুন তো মনে হয় তোমাদের বাড়িতে লেগেছে!'

বলে কি! টিটুকে ঝুড়িতে তুলে নিয়ে সাইকেলে চেপে ছুটল কিশোর।

রবিন আর ফারিহা চলল তার সঙ্গে। তাড়াহুড়ো করে গাছ থেকে নেমে মুসাও ছুটল। মিস চেরির এখানকার কাজ আপাতত শেষ। স্কুটারে চেপে তিনিও ছুটলেন।

কিছু দূর আসতে চোখে পড়ল কিশোরের, ওদের বাড়ি থেকেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। সর্বনাশ! কি করে লাগল?

বাড়িতে পৌছে দেখল, আগুন প্রায় শেষ। নিভিয়ে ফেলেছে দমকলের লোকেরা। আগুন লেগেছিল ছাউনিতে, ওদের নতুন হেডকোয়ার্টারে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই।

বাগানে বেরিয়ে এসেছেন মেরিচাচী। চাচা বাড়ি নেই, মাছ ধরতে গেছেন নদীতে।

চাচীকে বললেন দমকল বাহিনীর চীফ, 'মনে হয় বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে লেগেছে।'

'তা লাগতে পারে,' একমত হলেন চাচী। 'যা গরম পড়েছে।'

'জিনিসপত্র কিছু ছিল নাকি?'

'না, তেমন কিছু না। এই কিছু খালি বাক্সটাক্স, আর টুকটাক বাতিল জিনিস। ভাগ্যিস, ঘরে লাগেনি।'

'হ্যাঁ। সাবধানে থাকবেন।'

'সাবধানেই তো থাকি। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেলে আর কি করব।'

'পুরানো তার চেক করিয়ে নেবেন।'

পরামর্শ দিয়ে দলবল নিয়ে চলে গেল চীফ।

কিশোরদের সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে মেরিচাচীও ঘরে চলে গেলেন।

পোড়া ছাউনির কাছে দাঁড়িয়ে রইল গোয়েন্দারা। তাদের সঙ্গে রয়েছেন মিস চেরি। ঘরটা পুড়ে যাওয়ায় সকলেরই খুব দুঃখ হচ্ছে। বেশি হচ্ছে টিটুর। আরাম করে শুয়ে থাকার অনেক জায়গা ছিল ওখানে। মনের দুঃখেই বোধহয় পোড়া কাঠ আর ছাইয়ের মধ্যে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল, আর 'খোক! খোক!' করতে লাগল।

সাবধান করল কিশোর, 'দেখিস, গরম কয়লায় আবার পা পোড়াস না।'

ফারিহার নজর টিটুর দিকে। হঠাৎ বলে উঠল, 'এই দেখো, টিটু কি পেয়েছে! ওই ক্যানটা তো ছিল না ঘরে!'

তাই তো। কিশোর, মুসা আর রবিনও দেখল। পেট্রলের একটা বড় ক্যান। ছুটে গেল কিশোর। ক্যানটা হাতে নিল। এখনও গরম। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। আনমনে বিড়বিড় করল, 'এটা তো আমাদের নয়! এখানে এল কি করে?'

'নিশ্চয় কেউ ফেলে গেছে।' রবিন বলল।

তার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। মাথা দোলাল, 'ঠিক বলেছ! শর্ট-সার্কিট নয়, পেট্রল ঢেলে দিয়ে আগুন লাগানো হয়েছে।'

চমকে উঠল মুসা, 'বলো কি! ইচ্ছে করে?'

'ইচ্ছে করে। ছাউনির বেড়ায় পেট্রল ঢেলে, একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে।'

'মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না, আমাদের ছাউনি পুড়িয়ে কার কি লাভ?'

'আরও একটা ব্যাপার,' মিস চেরি বললেন, 'ক্যানটাই বা ফেলে গেল কেন এমন জায়গায় যাতে সহজেই চোখে পড়ে? তবে কি ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে, দেখানোর জন্যে?'

'মনে তো হয়।'

'রেডরোজ কটেজ ভাঙার সাথে কোন সম্পর্ক নেই তো?'

'থাকতে পারে।'

পরদিন সকালেই এর জবাব পাওয়া গেল। কিশোরদের পোস্ট বক্সে চিঠি ফেলে গেল ডাক পিয়ন। সেগুলো নিয়ে আসতে গিয়ে একটা চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। সস্তা একটা হলদে রঙের খাম, ওপরে তার নাম লেখা।

তাকে আবার চিঠি দিতে গেল কে? স্কুলের কোন বন্ধু? রকি বীচ থেকে?

সাবধানে খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে বের করল ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। তাতে মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা:

ছাউনিতে আগুন দিয়ে সাবধান করলাম।
এরপরও রেডরোজ কটেজ থেকে দূরে না থাকলে

ধরে লাগাব।

কাউকে সম্বোধন করা হয়নি, নিচে কারও নামও নেই।

দ্রুত চারপাশে তাকাল কিশোর, যেন চোখে পড়বে ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে পত্রলেখক । রাগে জ্বলে উঠল সে। অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, যেই এ চিঠি লিখে থাকো, ভাল করে শুনে যাও, কোন হুমকিতেই কাজ হবে না, রেডরোজ কটেজের বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত না করে ক্ষান্ত হব না আমি।

নাস্তার টেবিলে বসে গতকালের আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করল কিশোর। চাচীকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল ওই সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

'বসার ঘরে। সেলাই করছিলাম।'

'কি করে বুঝলে আগুন লেগেছে?'

'পোড়া গন্ধ পেলাম। ভাবলাম, রান্নাঘরে বুঝি কিছু পুড়ছে। গিয়ে দেখি কিছু না। হঠাৎ চোখ পড়ল বাগানের দিকে, ধোঁয়া দেখতে পেলাম। ছুটে গিয়ে দেখি ছাউনিটা পুড়ছে।'

'তারপর?'

'তাড়াতাড়ি গিয়ে দমকলকে ফোন করলাম।'

'হুঁ।' এক টুকরো রুটি মুখে পুরে দিল কিশোর। 'আর কিছুই দেখোনি, না? অচেনা কোন লোককে দৌড়ে যেতে, কিংবা অন্য কিছু?'

ওর মুখের দিকে তাকালেন মেরিচাচী, 'তোর কি সন্দেহ হচ্ছে কেউ এসে লাগিয়ে দিয়ে গেছে?'

'যেতেও তো পারে।'

'তোর যত অদ্ভুত কথাবার্তা। না, কাউকেই দেখিনি আমি।'

'কাউকেই না? গাড়িটাড়ি কিছুই দেখোনি? ভাল করে ভেবে বলো।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন চাচী, 'ঠিকই তো বলেছিস! একটা গাড়ি দেখেছি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, আমি জানালা দিয়ে তাকাতেই স্টার্ট নিয়ে চলে গেল!'

চিবানো বন্ধ হয়ে গেল কিশোরের। সামনে ঝুঁকল, 'কি গাড়ি? কি রঙের?'

'নীল রঙ। টয়োটা।'

'দারুণ একটা সূত্র দিলে তুমি, চাচী, থ্যাংক ইউ!'

'কিসের সূত্র? কি বলছিস?'

'এখন বলা যাবে না!'

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে চলে এল কিশোর।

নয়

দুপুরের আগেই মিস চেরির কটেজে দল বেঁধে এসে হাজির হলো গোয়েন্দারা।

আভনে তৈরি হচ্ছে স্পঞ্জ কেক। হলদে হয়ে এসেছে ওপরটা। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে লোভনীয় সুগন্ধ। বার বার সেদিকে তাকাচ্ছে মুসা। তর সইছে না আর।

হুমকি দিয়ে লেখা চিঠিটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

'এঁহ্,' মুখ বাঁকিয়ে বলল রবিন, 'যেন হুমকি দিলেই ভয় পেয়ে যাব আমরা!'

মিস চেরি বললেন, 'আমি বলি কি, ক্ষান্ত দাও তোমরা। আমি চাই না, রেডরোজ কটেজ বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়ে যাক।'

'কক্ষনো না! কিছুতেই না!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দারা।

'দেখো, তোমরা বুঝতে পারছ না। জঘন্য খারাপ কোন লোক আমাদের পেছনে লেগেছে। নিজের স্বার্থের জন্যে অন্যের বাড়ি ভাঙতে, অন্যের বাড়ি পোড়াতে একবিন্দু হাত কাঁপে না তার। এ রকম যার মানসিকতা, যে-কোন রকম ক্ষতি করার আগে একটুও ভাববে না সে। আমি তোমাদের জন্যে ভয় পাচ্ছি।'

'এর চেয়ে খারাপ লোকের পাল্লায়ও পড়েছি আমরা,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, 'বিপদকে আমরা ভয় পাই না। আমাদের শেষ কথা, যে যত ভাবেই হুমকি দিক, রেডরোজ কটেজ ভাঙতে দেয়া হবে না।'

'ঠিক,' তুড়ি বাজাল মুসা, 'আপনি যাই বলুন, মিস চেরি, কিছুতেই এ অন্যায় সহ্য করব না আমরা।'

'হুঁ, তোমাদের দমানো কঠিন,' বোঝানোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন মিস চেরি, 'ঠিক আছে, কটেজ রক্ষা করতে আমাদের সহায়তা করো। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে, কোনো অহেতুক ঝুঁকির মধ্যে যাবে না।'

'যাব না!' কথা দিল কিশোর। এক এক করে বাকি তিনজনও সুর মেলাল ওর সঙ্গে।

আলোচনা অনেক হয়েছে, কাজ শুরু করতে হবে এখন। মিস্টার ওয়াটসনের দেয়া চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদ শেষ হতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি। যে কোনও সময় এসে হাজির হতে পারে বুলডোজার। সেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদিন হট্টগোল করে ঠেকানো যাবে না, রোজ রোজ মানুষ আসবে না বাধা দিতে। অন্য কিছু করতে হবে।

আলোচনা করে একটা চমৎকার বুদ্ধি বের করে ফেলা গেল। তবে তার

তিন গোয়েন্দাদের সবার থাকার দরকার নেই। ঠিক হলো, রবিন আর জিনা থাকবে রেডরোজ কটেজে। মিস চেরিকে সাহায্য করবে। কিশোর আর মুসা যাবে মিস্টার বারগারের বাড়িতে, চিঠির ব্যাপারে তদন্ত করতে।

সেইমত রওনা হলো দু'জনে। টিটু চলল ওদের সঙ্গে, কিশোরের সাইকেলের ঝুড়িতে চেপে।

'মিস্টার বারগারকেই একমাত্র সন্দেহ হয়,' সাইকেল চালাতে চালাতে বলল মুসা। 'হয়তো আমাদের ওপর সাংঘাতিক খেপে গিয়ে এ কাজ করে বসেছেন। যখন দেখলেন, আন্দোলন তুঙ্গে উঠছে, সামনাসামনি বিরোধিতা করে সুবিধে হবে না, ভয় পেয়ে গিয়ে অন্য পথে সেটা ঠেকাতে চাইছেন।'

'আমার একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছে না এ কথা,' মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'মিস্টার বারগারের মত একজন মানুষ অন্যের বাড়িতে আগুন দেবেন, হুমকি দিয়ে চিঠি লিখবেন, ব্ল্যাকমেল করবেন, এটা ভাবতেও খারাপ লাগছে। আমি শিওর, এর ভেতরে অন্য কোন রহস্য আছে। আর যদি সত্যি তিনিই করে থাকেন এ কাজ, তাহলে ধরে নিতে হবে লুই স্টিভেনসনের গল্পের মত ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড হয়ে গেছেন—দিনে নিরীহ ভদ্রলোক, রাতে পিশাচ।'

রেডরোজ কটেজে তখন ও নাটক হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টার মেয়াদ শেষ, বুলডোজার নিয়ে হাজির হয়েছে আগের দিনের সেই তিন ড্রাইভার। কটেজের বাইরে দৈত্যাকার যন্ত্রগুলো রেখে ভেতরে ঢুকল। এক বুড়োকে বাগানের পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁকে মিস চেরির কটেজ কোনটা জিজ্ঞেস করল। দেখিয়ে দিলেন বুড়ো।

কটেজের বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দিল তিনজনের মধ্যে বয়স্ক লোকটা।

দরজা খুলে দি মিস চেরি। 'আরে, আপনারা! আসুন, ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকল তিন ড্রাইভার। ঢুকতেই নাকে লাগল কেকের সুগন্ধ। আভেন থেকে এইমাত্র বের করে বড় বড় দুটো কেক টেবিলে নামিয়ে রেখেছেন মিস চেরি। ওগুলোর পাশে সাজানো রয়েছে বড় এক থালা আপেল পাই। যেমন গন্ধ, তেমনি চমৎকার চেহারা। লোভীর মত ওগুলোর দিকে তাকাতে লাগল ড্রাইভারেরা।

সেদিক থেকে জোর করে চোখ সরাল বয়স্ক লোকটা, মিস চেরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার আমরা কাজ শুরু করতে চাই।'

'তা তো করবেনই,' কোমল গলায় বললেন মিস চেরি, 'আগে নাস্তা করে যান। আপনাদের জন্যেই বানিয়েছি।'

দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকলেন এক বুড়ো। হাতে একটা মদের বোতল। বললেন, 'কেকের সঙ্গে এল্ডারবেরি ওয়াইন কিন্তু দারুণ জমে। খেয়ে দেখেছি। মিস চেরি, বসে যাব নাকি আপনাদের সঙ্গে?'

'আসুন না, অসুবিধে কি? আপনার ওয়াইনের স্বাদ ড্রাইভার ভাইয়েরাও পাক।'

কেক কাটতে মিস চেরিকে সাহায্য করল ফারিহা। গ্লাস বের করে আনল রবিন। সব সাজিয়ে গুছিয়ে ড্রাইভারদের খেতে ডাকা হলো।

দ্বিধা করতে লাগল ওরা। খুব সুগন্ধ কেকের। আপেল পাইয়ের চেহারা তো রীতিমত জিভে পানি এনে দেয়। সেই সঙ্গে এল্ডারবেরি ওয়াইন।

ওদের লোভ বুঝতে পেরে ডাক দিলেন মিস চেরি, 'আসুন, বসে যান। কেক কি বড় টুকরো দেব?'

'না, না, ছোট,' দ্বিধার সঙ্গে বলল বয়স্ক ড্রাইভার।

দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি শুধু এক চুমুক এল্ডারবেরি খাব, আর কিছু না, কি বলিস?' সমর্থনের আশায় তৃতীয় ড্রাইভারের দিকে তাকাল সে।

মাথা নেড়ে সায় জানাল তার সঙ্গী।

খেতে বসে গেল ওরা। আরও কয়েকজন বুড়ো-বুড়ি খাবার নিয়ে এলেন। সরগরম পরিবেশ। ড্রাইভাররা ভাবল, যারা এখনও রেডরোজে আছে তাদের ঘরগুলো যাতে না ভাঙা হয়, সে-জন্যেই ওদেরকে এত খাতির-যত্ন করা হচ্ছে। অন্য কিছু যে ঘটতে পারে কল্পনাও করল না। ওরা কেউ লক্ষ করল না, কোন ফাঁকে বেরিয়ে গেছে রবিন।

বুলডোজারগুলোর কাছে এসে চার পাশে চোখ বোলাল সে। কেউ নেই। সাবধানে উঠে পড়ল একটা ডোজারে। ইগনিশন কী খুলে নিয়ে নেমে এল।

এক এক করে তিনটে ডোজারের চাবি খুলে পকেটে ভরল সে। তাকে এ কাজ করতে কেউ দেখল না। ডোজারের কাছ থেকে সরে এল সে। ড্রাইভারেরা যদি সন্দেহ করে তার পকেট চেক করে, এই ভয়ে চাবিগুলো পকেটে রাখল না, ফেলে দিল একটা ফুলের ঝোপের ভেতরে।

দশ

রবিনের মত অত সহজ হলো না কিশোর আর মুসার কাজ। মিস্টার বারগারের বাড়িতে ঢুকে হোঁতকামুখো সেই মালীকে বাড়ির সামনে কাজ করতে দেখল। কিন্তু আজ আর সেদিনের মত ওদেরকে ঢুকতে দিল না সে। নিশ্চয় কড়া হুকুম দিয়ে দেয়া হয়েছে, বাইরের কেউ যেন কোনমতেই ভেতরে ঢুকতে না পারে।

সুতরাং সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো ওদের। কাজ করতে করতে সরে গেল এক সময় মালী, সদর দরজা থেকে দূরে বাগানের মধ্যে কতগুলো গোলাপের চারার দিকে নজর দিল সে। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল

গোয়েন্দারা। একছুটে চলে এল সিঁড়ির কাছে। বারান্দায় উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঠিক এই সময় কোন কাজে অফিসের বাইরে বেরিয়ে এল ড্রাগন-সেক্রেটারি। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল। সে চিৎকার করার আগেই টিটুকে দেখিয়ে হুমকি দিল কিশোর, 'সাবধান, চেঁচামেচি করলেই কিন্তু কামড় খাবেন। চিৎকার ও একদম সইতে পারে না। কি বলিস, টিটু?'

কিশোর কি করে বোঝাল টিটুকে, সে-ই জানে। চোখের পলকে বদলে গেল টিটু। বিকট ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে গেল মহিলাকে।

এক লাফে পেছনে সরে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল সেক্রেটারি। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল।

হাসতে শুরু করল মুসা।

'পরে হেসো। চলো, সময় থাকতে ঢুকে পড়ি,' বলে মিস্টার বারগারের দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর।

আজ আর দরজায় টোকা দিল না : অহেতুক সময় নষ্ট হবে। নাম বললে হয়তো ওদের ঢুকতে দেবেন না মিস্টার বারগার। মালীকে ডেকে ওদের বের করে দিতে বলবেন। সোজা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। তার পেছনে ঢুকল মুসা আর টিটু।

কাজ করছিলেন মিস্টার বারগার। শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন, 'তোমরা!'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর, 'আপনার কাছে কৈফিয়ত চাইতে এসেছি।'

কিশোরের কথা শুনে আরও অবাক হয়ে গেলেন মিস্টার বারগার।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে টেবিলে রেখে ঠেলে দিল কিশোর। 'এটা আপনাকে দেখাতে এলাম।'

হলুদ খামটার দিকে দীর্ঘ সময় নীরবে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার বারগার। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন। কিশোর লক্ষ করল, হাত কাঁপছে তাঁর।

তবে কি চিনতে পেরেছেন? ওরা যে তাঁকে সন্দেহ করেছে, অনুমান করে ফেলেছেন?

খাম খুলে চিঠি পড়লেন তিনি। মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে দেখিয়ে কি লাভ?'

'লাভ আছে। আমাদের সন্দেহ, খেপে গিয়ে আপনি এ কাজ করেছেন,' জবাব দিয়ে দিল মুসা।

ড্রয়ার খুললেন মিস্টার বারগার। একই রকম দেখতে আরও তিনটে খাম বের করে টেবিলে রেখে ঠেলে দিলেন ওদের দিকে। 'দেখো এগুলো।'

তিনটে চিঠি খুলে পড়ল ওরা। একটাতে, রেডরোজ কটেজ বিক্রির প্রস্তাব, যাতে রাস্তাটা সেই জায়গার ওপর নেয়া যায়। দ্বিতীয়টাতে হুমকি, বিক্রি না করলে খারাপ হবে। তৃতীয়টাতে আরও বড় হুমকি, বলা হয়েছে, ডিটিআর কোম্পানির কাছে জায়গা বিক্রি না করলে তাঁর ছেলে টনিকে কিডন্যাপ করা হবে। প্রত্যেকটাতে সাবধান করা হয়েছে পুলিশের কাছে গেলে ভাল হবে না। লেখকের নাম নেই কোনটাতেই।

এক ধরনের খাম, একই ধরনের কাগজ সবগুলো চিঠির।

'তারমানে,' বোকা হয়ে গেছে যেন মুসা, 'সবগুলো একই লোক পাঠিয়েছে! আমাদেরটা সহ!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'কোন সন্দেহ নেই তাতে। আরেকটা জিনিস দেখো, O অক্ষরগুলো সব এক রকম—ক্ষয়া ক্ষয়া, টাইপ রাইটারের ওই হরফটা নষ্ট। একই মেশিন দিয়ে টাইপ করা হয়েছে চিঠিগুলো।'

মিস্টার বারগার কিছু বলছেন না। তাঁর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করতে পারছে কিশোর, কতটা মানসিক কষ্টে আছেন ভদ্রলোক। কেন তিনি রেডরোজ কটেজ বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন, সে-রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করা হয়েছে।

তাঁর ছেলে টনিকে ওরা ভালমত চেনে, বন্ধুই বলা চলে। ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে পরিচয় হয়েছে। ওদের সঙ্গে একই ম্যাচে খেলেছিল ছেলেটা। শহরে বোর্ডিঙে থেকে লেখাপড়া করে, ছুটিতে বাড়ি আসে। এবারও এসেছে। খুব সহজেই তাকে স্কুল থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, মিস্টার বারগারের ভয় পাওয়াটা অমূলক নয়। এ সব ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে যেতে সাহস করে না সাধারণত লোকে, তিনিও করেননি। ছেলে হারানোর ভয়ে জায়গা বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন। তবে তিরিশজন মানুষকে ঘর ছাড়া করতে কতটা কষ্ট হচ্ছে তাঁর, সেটাও বুঝতে পারল এখন কিশোর।

মুসাও বুঝল।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন মিস্টার বারগার, 'বিক্রি করতে রাজি হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার, কিশোর।'

'বুঝতে পারছি,' সহানুভূতির সুরে বলল কিশোর। 'ভাববেন না, স্যার, আপনি আর এখন একা নন। টনি আমাদের বন্ধু। তার বিপদে পাশে এসে দাঁড়াব আমরা সবাই। এ গ্রামটাও আমাদের। এখানে শয়তানি করে কাউকে পার পেতে দেব না আমরা।'

কে চিঠি লিখেছে, এ ব্যাপারে কোন ধারণা আছে কিনা তাঁকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মিস্টার বারগার বললেন, 'না। আমিও ভেবে অবাক হই, রেডরোজ কটেজ ভেঙে দিলে কার কি লাভ হবে? রাস্তাটা সহজেই অন্য যে কোনখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যখন?'

তাকে আমরা খুঁজে বের করবই।'

ওদেরকে বিদায় দেয়ার আগে চেয়ার থেকে উঠে এলেন মিস্টার বারগার। দু'জনের সঙ্গেই হাত মেলালেন। মুসা আর কিশোর অবাক হলো না, এটাই তাঁর আসল রূপ, ভদ্র, বিনয়ী।

বাইরে বেরোতেই মালীর সঙ্গে দেখা। কড়া চোখে ওদের দিকে তাকাল লোকটা। উঠে আসতে যাবে, চোখ পড়ল সিঁড়ির দিকে। অবাক হলো। স্বয়ং মিস্টার বারগার বেরিয়ে এসেছেন ওদের বিদায় জানাতে। মুসার মনে হলো, খানিকটা হতাশ হয়েই আবার নিজের কাজে মন দিল লোকটা।

এগারো

বিকেল বেলা মিস চেরির বাড়িতে গোয়েন্দাদের মীটিং বসল। চকলেট কেক আর আইস্‌ড্ কেক তৈরি করে রেখেছেন তিনি।

চোখের পলকে বড় বড় দুটো টুকরো খতম করে আরেক টুকরো নিজের পাতে তুলে নিয়ে মুসা বলল, 'আমাদের সব মীটিং এখন থেকে এখানে হওয়া উচিত, ছাউনিতে নয়।'

হেসে উঠল সবাই। এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলল মুসা, যেন সে নিশ্চিত হয়ে গেছে মিস চেরির কটেজটা আর ভাঙা হবে না। তবে টেকার সম্ভাবনা যে দেখা যাচ্ছে, অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটছে, এটা অবশ্য ঠিক।

কে কি করে এসেছে ওরা, এবার সেই রিপোর্ট দেয়ার পালা। রেডরোজে যা যা ঘটেছে, সবিস্তারে বলতে লাগল রবিন আর ফারিহা। ওদের কথা শেষ হলে উপসংহার টানলেন মিস চেরি, 'বুলডোজারের চাবিগুলো না পেয়ে ড্রাইভারদের মুখের যে কি অবস্থা হয়েছিল, যদি দেখতে!'

আবার হাসাহাসি শুরু হলো।

এরপর কিশোর আর মুসা জানাল, মিস্টার বারগারের ওখানে কি জেনে এসেছে। হুমকি দিয়ে চিঠি এসেছে শুনে তো হাঁ হয়ে গেল ফারিহা, রবিনও অবাক। মাথা দোলাতে দোলাতে মিস চেরি বললেন, 'তাই তো বলি মিস্টার বারগারের মত এমন একজন ভালমানুষ হঠাৎ বদলে গেলেন কেন?'

'এখন আমাদের প্রধান কাজ ব্ল্যাকমেলারকে খুঁজে বের করা,' কিশোর বলল।

'যে একটা নীল গাড়ি চালায়,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'গাড়িটা তার না হয়ে তার কোন সঙ্গীরও হতে পারে। পত্রলেখক, নীল গাড়ির চালক আর আমাদের ছাউনিতে যে আগুন দিয়েছে, ওরা এক লোক না-ও হতে পারে।'

'তবে মনে হচ্ছে একই লোকের কাজ। তাই না?'

'আমার সে-রকমই লাগছে,' রবিন বলল।

'যে-ই হোক,' কিশোর বলল, 'ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। ব্ল্যাকমেলার কে, কিছুই জানি না এখনও আমরা। বিশেষ কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না। সূত্র বলতে এখন কেবল একটা নীল রঙের গাড়ি। ওটাকে পেলে অবশ্য চিনে যাব ব্ল্যাকমেলারকে।'

'তাকে চিনতে পারলেই তো হলো না, ধরতে হলে প্রমাণ লাগবে,' মিস চেরি বললেন।

'তাকে চেনাটাও সহজ হবে না,' মিস চেরির সঙ্গে একমত হয়ে বলল মুসা, 'ধরা পড়ার জন্যে আমাদের সামনে এসে নিশ্চয় ঘুরে বেড়াবে না ওই লোক। ছাউনিতে আগুন লাগানোর পর, আমার বিশ্বাস, আরও সতর্ক হয়ে গেছে সে। রাস্তায় বেরোলে সাবধানেই বেরোবে।'

'তা তো বটেই,' কিশোরও এ ব্যাপারে একমত। 'ওকে ধরার একটাই রাস্তা এখন, ফাঁদ পাততে হবে আমাদের।'

চিবানো বন্ধ হয়ে গেল মুসার। 'মানে?'

'আড়াল থেকে ওকে বের করে আনতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি রিঅ্যাক্ট করে ওই লোক, খেয়াল করোনি? কোন ব্যাপার তার পছন্দ মত না হলেই খেপে গিয়ে হুমকি দিতে আরম্ভ করে। মিস্টার বারগার জায়গা বিক্রি করতে রাজি হননি বলে হুমকি দিয়েছে। তাতেও তিনি রাজি না হওয়ায় তাঁর ছেলেকে কিডন্যাপের ভয় দেখিয়েছে। আমরা তার পথে বাদ সাধায় আমাদের বাড়ির ছাউনি পুড়িয়েছে, এর পরও কথা না শুনলে বাড়িটা পুড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু তাতে কি?'

'তাতেই আসল কাজটা সারা যাবে বলে আমার ধারণা। এমন কিছু করতে হবে আমাদের যাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে...'

বুঝে ফেলেছে রবিন, বলল, 'এবং আমরা ফাঁদ পেতে বসে থাকব ওকে ধরার জন্যে!'

হেসে বললেন মিস চেরি, 'কিশোর, ভাল বুদ্ধি করেছ। কিন্তু এতে বিপদের আশঙ্কা আছে।'

'তা তো কিছুটা থাকবেই। শত্রুতা থাকলে বিপদও থাকবে। তাই বলে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না। কি বলো, মুসা?'

'ঠিক।'

রবিন আর মুসাও কিশোরের সঙ্গে একমত। এমনকি টিটুও। কেকের টুকরো শেষ করে ফেলেছে সে। মুখ তুলে বলল, 'খুক!'

'ফাঁদটা তাহলে পাতব কোথায়?' রবিনের প্রশ্ন। 'কি ভাবে?'

'সেটাই এখন মন দিয়ে শোনো। আমার পরিকল্পনায় কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে, ধরিয়ে দেবে। ব্ল্যাকমেলারের মূল লক্ষ দুটো জায়গা—এক, মিস্টার

বারগারের বাড়ি, আরেকটা আমাদের বাড়ি। প্রথম হামলা আসবে এই দুটো জায়গারই কোন একটা জায়গায়।'

কিভাবে কি করতে হবে বুঝিয়ে বলল কিশোর।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হয়ে গেল।

ড্রাইভারদের মদ সরবরাহ করেছিলেন যে বৃদ্ধ তাঁকে ডেকে আনলেন মিস চেরি। সব কথা খুলে বললেন। ফোন করতে বললেন স্থানীয় সংবাদপত্রের অফিসে। কিছুক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে অবশেষে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। ওপাশ থেকে ফোন ধরতেই নিজেকে মিস্টার বারগার বলে পরিচয় দিয়ে বললেন—তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেছেন, রেডরোজ কটেজের জায়গা বিক্রি করবেন না, ওই জায়গার ওপর দিয়ে হাইওয়ে যাবে না—এ খবরটা যেন পত্রিকায় ছেপে দেয়া হয়।

কথা যখন শেষ করলেন রীতিমত কাঁপছেন তখন বেচারা। এতবড় মিথ্যে বলতে গিয়ে দম আটকে আসছিল। তাঁকে দিয়ে এ কাজ করাতে মিস চেরিরও ভাল লাগেনি। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। শুধু রেডরোজই নয়, মিস্টার বারগারের ছেলেকে বাঁচাতেও এ মিথ্যেটুকুর প্রয়োজন ছিল। গোয়েন্দারা গিয়ে তাঁকে সরাসরি প্রস্তাব দিলে তিনি কিছুতেই মানতেন না, পত্রিকাকে বলতেন না যে তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেছেন।

যাই হোক, পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজটা শেষ হয়েছে, পরের কাজের আগে এখন অপেক্ষা করতে হবে। খবর ছাপা হওয়ার পর ব্ল্যাকমেলারের নজরে পড়লে সে কি করবে, তার ওপর নির্ভর করছে বাকিটা। কিশোরের বিশ্বাস, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটে যাবে যা ঘটার।

মুসা বলল, 'কাল যদি তোমাদের বাড়ি আক্রমণ করে লোকটা? তুমি তো বাড়ি থাকতে পারবে না।'

'বাবাকে সতর্ক করে দেব,' কিশোর বলল। 'বলব সারাদিন বাড়ি থাকতে। তবে আমার মনে হয় না আগে আমাদের বাড়ি পোড়াতে আসবে। লোকটা তো আর জানে না চালাকিটা আমরা করেছি। মিস্টার বারগারের ওপর রাগ করেই প্রথমে সে টনিকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে। সুতরাং ওর দিকে কড়া নজর রাখতে হবে আমাদের।'

'ওকে বাঁচাব কি করে আমরা?' জানতে চাইল রবিন।

'কোন ভাবে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পারলে ভাল হত,' মুসা বলল।

'সম্ভব না,' কিশোর বলল। 'সরাতে হলে মিস্টার বারগারকে সব বলতে হবে, সেটা বলা যাবে না। বললেও তিনি এ ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন না।'

'তাহলে?'

'চেষ্টা করলে আমি অবশ্য ওকে সরিয়ে নিতে পারি,' মিস চেরি বললেন। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তাঁর দিকে।

'টনির মা মারা যাওয়ার পর আমি কিছুদিন ওর গভর্নেস ছিলাম। সেই সুবাদে যখন-তখন আমি ও বাড়িতে ঢুকতে পারি এখনও, টনির ঘরে চলে যেতে পারি, তার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতে পারি, এমনকি তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও মানা করেন না মিস্টার বারগার। আরও একটা ব্যাপার, স্ট্যাম্প জমাতে পছন্দ করে টনি। গিয়ে যদি বলি, আমার এক আত্মীয়ের একটা বিরাট স্ট্যাম্প কালেকশন আছে, দেখতে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যাবে সে। তখন তাকে বের করে নিয়ে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই হবে না।'

কি যেন ভাবছে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'ওর বাবাকে না জানিয়ে নিতে পারবেন?'

'পারব। তবে সেটা কি উচিত হবে?'

'আমাদের আসল কথা কাজ উদ্ধার; কোনটা ভাল কোনটা খারাপ ভাবলে চলবে না। তা ছাড়া ওদের ভালর জন্যেই এ কাজ করতে যাচ্ছি আমরা।' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ, 'যদি নিয়ে যেতে পারেন, খুব ভাল হয়। ভালমত ফাঁদটা পাতা যায় তাহলে। আপনি যে টনিকে বের করে নিয়ে গেছেন, এ কথা বাড়ির কেউ যেন না জানে...'

'কিন্তু টনি যে বাড়ি নেই, এ কথা জানতে দেরি হবে না ওর বাবার। তোলপাড় করে ফেলবে সব,' রবিন বলল।

'যাতে না করেন, সেই ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে,' রহস্যময় হাসি হেসে বলল কিশোর।

'আমাকে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে টনি সাজতে হবে। ওর আর তোমার শরীর-স্বাস্থ্য এক, চেহারার সামান্য একটু এদিক ওদিক করে চোখে একটা চশমা লাগিয়ে নিলেই তুমি টনি হয়ে যাবে। এরপর মিস্টার বারগারের বাড়িতে তোমার ঘুরে বেড়াতে আর কোন অসুবিধে হবে না।'

'সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে না?' মিস চোরি বললেন, 'কিডন্যাপার এসে টনি ভেবে ওকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।'

'নিক না, আমি তো সেটাই চাই। তাহলে ও ব্যাটাকে ধরতে আরও সুবিধে হবে আমাদের। চতুর্দিক থেকে ফাঁদ পেতে বসে থাকব আমরা। ওর যা স্বভাব-চরিত্র, কোন না কোন ফাঁদে ধরা ওকে দিতেই হবে।'

বারো

পরদিন খুব ভোরে জেগে গেল কিশোর। উঠে পড়ল বিছানা থেকে। খবরের কাগজের অপেক্ষায় রইল। খবরটা ছাপা হলেই কেবল ওদের কাজ শুরু

করতে পারবে। না হলে কিছু করার নেই। সে নিশ্চিত, কাগজে খবরটা দেখলেই লেগে যাবে ব্ল্যাকমেলার। ওর যা স্বভাব, প্রথমেই হুমকি দিয়ে একটা চিঠি লিখবে মিস্টার বারগারকে। তারপর টনিকে কিডন্যাপ বা অন্য কিছু করার চেষ্টা করবে।

রাতে ঘুমানোর আগে বিছানায় শুয়ে অনেক ভেবেছে কিশোর। পরদিন সকালে ওদের কার কি কাজ হবে, তার একটা নতুন প্ল্যান করেছে। মিস চেরি টনিকে সরিয়ে নেবেন। রবিন যাবে টনি সেজে মিস্টার বারগারের বাড়িতে। প্রথমে ভেবেছিল, সে নিজে আর মুসা আড়ালে লুকিয়ে থেকে চোখ রাখবে রবিনের ওপর। কিন্তু সেটা করার আগে আরেকটা কাজ করতে পারে, পোস্ট অফিসের চিঠি ফেলার বাক্সের ওপর নজর রাখতে পারে। দেখতে পারে, নীল গাড়ি নিয়ে পোস্ট অফিসে যায় কিনা কোন লোক, হলুদ খামে ভরা চিঠি ফেলে কিনা ডাকবাক্সে। যদি ফেলে, লোকটাকে চিনে নেবে, তার গাড়ির নম্বর নেবে, এবং তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাবে মিস্টার বারগারের বাড়িতে রবিনকে পাহারা দেয়ার জন্যে।

কাপড় পরে তৈরি হয়ে কাগজের অপেক্ষায় বসে রইল সে।

গেটে কাগজওয়ালার সাইকেলের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল। কাগজটা হাতে নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়েই মেলল। আছে! প্রথম পাতাতেই হেডলাইন দেয়া হয়েছে:

সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন মিস্টার বারগার
রেডরোজ কটেজের ওপর দিয়ে হাইওয়ে যাবে না

পুরো খবরটা পড়ার আর কোন প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। দৌড়ে এসে ঢুকল বাড়িতে। মেরিচাচী রান্নাঘরে ব্যস্ত। সোজা বসার ঘরে চলে এল সে, ফোন করার জন্যে, জুতো খোলার কথা বেমালুম ভুলে গেল।

প্রথমে রবিনকে ফোন করে নতুন পরিকল্পনার কথা জানাল। ওকে মিস্টার বারগারের বাড়ি চলে যেতে বলল। তারপর ফোন করল মুসাকে। 'বাড়ি থাকো, জরুরী কথা আছে!' বলে লাইন কেটে দিল। বসার ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে খেয়াল করল, জুতো পরা রয়েছে। চমকে গেল। ভাগ্যিস চাচী দেখে ফেলেনি। তাড়াহুড়া করে নাস্তা সেরে টিটুকে সাইকেলের ঝুড়িতে বসিয়ে রওনা হলো গেল মুসাদের বাড়ি।

কিশোরের নতুন পরিকল্পনা মন দিয়ে শুনল মুসা। বলল, 'কোন্ পোস্ট অফিস থেকে চিঠি পাঠায় সে, কি করে জানব? কয় জায়গায় পাহারা দেব?'

'দুই জায়গায়। মিস্টার বারগারের কাছে পাঠানো তিনটে চিঠির দুটো পাঠিয়েছে ডোভারভিল থেকে, একটা গ্রীনহিলস থেকে। আমার নামে যেটা পাঠিয়েছে, সেটাও ডোভারভিল থেকে। বোঝা যাচ্ছে, ওই পোস্ট অফিসের কাছাকাছি কোথাও থাকে সে, কিংবা ওখান থেকে পাঠানো নিরাপদ মনে করে। আমি যাব ওখানে পাহারা দিতে, তুমি গ্রীনহিলসে।'

'আর আমি?' জানতে চাইল ফারিহা।

'তুমি টিটুকে নিয়ে বাড়িতে থাকবে। অত দূরে তোমাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'সেদিন যে গেলাম, পোস্টার লাগাতে।'

'সেদিন তো সবাই একসঙ্গে গেছি। তবে তোমারও একটা কাজ আছে। দুপুরের মধ্যে যদি বাড়ি না ফিরি আমরা, ভাববে বিপদে পড়েছি, ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করে সব জানাবে।'

ওদের সঙ্গে যেতে পারল না বলে হতাশ হলো ফারিহা। কিন্তু কি আর করা। কিশোর ওদের দলপতি, নেতার কথা মানতেই হবে।

রবিন ওদিকে মিস্টার বারগারের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। গেটের বাইরে একটা ঝোপের আড়ালে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল সে। মালী বা অন্য কাউকে দেখতে পেল না। চট করে ভেতরে ঢুকে একটা ফুলের ঝাড়ের আড়ালে চলে এল।

সাড়ে সাতটার দিকে এল খবরের কাগজের হকার। সাইকেল নিয়ে ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখল রবিন। খবর পড়ে মিস্টার বারগারের কি প্রতিক্রিয়া হয়, জানার লোভ সামলাতে পারল না। পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে আড়ালে তাঁর স্টাডির পেছন দিকের জানালার কাছে এসে ঘাপটি মেরে রইল সে।

কয়েক মিনিট পরই মিস্টার বারগারের উত্তেজিত কণ্ঠ কানে এল তার, 'হ্যালো, হ্যালো, আমি এডিটরকে চাই!...এখন সকাল কি বিকাল সেটা আমার বোঝার দরকার নেই, আমি এডিটরকে চাই, এক্ষুণি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি হেনরি বারগার!' ভয়ানক রেগে গেছেন তিনি। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাঁকে দেখতে পেল রবিন, রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেছেন। 'কে? এমিংটন? এটা কি করেছ? এ খবর পেলে কোত্থেকে?...কি বললে?...অসম্ভব! আমি ফোন করিনি! আমি এ খবর দিইনি!...অন্য কেউ দিলে সেটা তোমার বোঝা উচিত ছিল!'

মুচকি হাসল রবিন।

মিস্টার বারগার বলছেন, 'মাপ চাইতে হবে তোমার নিউজ এডিটরকে। আমি কিচ্ছু জানি না, কালকের কাগজের প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে 'ভুল হয়ে গেছে' হেডিং দিয়ে ব্যাখ্যা করে সব বলতে হবে তোমাকে। নইলে তুমি বন্ধু হও আর যাই হও সোজা আদালতে যাব!'

যা শোনার শুনেছে রবিন। আর এখানে থাকার দরকার নেই। সরে এসে আবার লুকিয়ে পড়ল ফুলের ঝাড়ে।

আরও মিনিট পনেরো পর মিস চেরিকে আসতে দেখল। স্কুটার আনেননি। হেঁটে এসেছেন। মাথায় বিশাল হ্যাটে অনেকগুলো ফুল গোঁজা। শার্টের কাপড়ে লাল রঙের বড় বড় ফুল; ধবধবে সাদা প্যান্ট। লাল জুতো। উজ্জ্বল রঙ তাঁর পছন্দ।

সোজা গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন

লেন। আগেই নিশ্চয় ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন টনির সঙ্গে, বেরোতে দেরি হলো না। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এলেন দু'জনে। হেঁটে বেরিয়ে গেলেন গেট দিয়ে।

এইবার বেরোনো যায়, ভাবল রবিন। তবে মিস্টার বারগারের সামনে যেতে ভয় পাচ্ছে। ঠিক করল, পারতপক্ষে তাঁর সামনে যাবে না। কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে নিজে নিজেই রিহার্সাল দিয়েছে। টনিকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে। রাত দুপুরে ঘরের মধ্যে কথা শুনে মা উঠে এসেছিলেন। রবিনকে জেগে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'কই কথা বলছি না তো, বই পড়ছি।'

'এত জোরে জোরে!' অবাক হয়েছেন মা।

'হ্যাঁ, একটা নাটকের পার্ট মুখস্থ করছি।'

'রাত অনেক হয়েছে, শরীর খারাপ হবে, শুয়ে পড়,' বলে চলে গেছেন মা।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে রবিন।

এত চেষ্টার পর এখন কতটা সফল হবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে ওর। তবে দেখা যাক, পরীক্ষা না দিলে তো আর পাস-ফেলের ব্যাপারটা নির্ধারণ করা যাবে না।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সোজা এগোল সদর দরজার দিকে, ভঙ্গি দেখাল যেন এ বাড়িরই ছেলে। দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির ভেতরের কয়েকটা অলিগলি আর বারান্দা হয়ে পেছন দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে চলে এল গেটের কাছের এক বিরাট চত্বরে। একপাশে গ্যারেজ, ঘোড়ার আস্তাবল ছিল এক সময়। এর একটা ঘরে খেলার সরঞ্জাম আর সাইকেল রাখে এখন টনি। ঘরের সামনের চত্বরে ফুটবল প্র্যাকটিস করে।

ঘরে বল পাওয়া গেল। বের করে এনে প্র্যাকটিস শুরু করল রবিন।

তেরো

গ্রীনহিলস পোস্ট অফিসের বারান্দায় খানিক ঘোরাঘুরি করল মুসা। এ ভাবে ঘুর ঘুর করলে সন্দেহ হতে পারে ভেবে নিচে নেমে এল। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে তুলে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাল, যেখান থেকে চিঠি ফেলার বাক্সটা পরিষ্কার চোখে পড়ে। সাইকেলের সীটে উঠে বসে রইল। লোকে দেখলে ভাববে, পরিচিত কারও আসার অপেক্ষা করছে সে।

কোলে একটা শিশুকে নিয়ে প্রথম চিঠিটা ফেলে গেল এক মহিলা।

'এ আমাদের লোক নয়,' ভাবল মুসা।

এরপর এল দাড়িওয়ালা এক লোক। তার হাতের খামটার দিকে তাকাল মুসা। না, এই লোকও নয়।

আসবে, অস্থির হওয়ার কিছু নেই—নিজেকে বোঝাল মুসা। বসে রইল চুপচাপ।

ওদিকে কিশোর বসে আছে ডোভারভিল পোস্ট অফিসের সামনে একটা গাছের নিচে। সুন্দর, রোদ ঝলমলে সকাল। গ্রামটাও বড় সুন্দর, বড় শান্ত। ওর মাথার ওপর মিষ্টি সুরে ডাকছে একটা পাখি।

পোস্ট অফিসে ভিড় মোটেও নেই।

সময় কাটতে লাগল। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। ঘড়ি দেখল কিশোর। এগারোটা বেজে দশ। ইতিমধ্যে চিঠি ফেলতে এসেছে মোটে চারজন লোক, তাদের তিনজনই মহিলা, এবং কোন চিঠির খামই হলুদ নয়। সোয়া এগারোটা নাগাদ চলে যাবে কিনা, কিংবা মুসাকে ফোন করবে কিনা যখন ভাবছে সে, এই সময় গাড়ির হর্নের শব্দ কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা নীল টয়োটা। ধক করে উঠল বুকের ভেতর। ওকে চিনে ফেলতে পারে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে চলে এল কিশোর।

গাড়ি থেকে নামল অচেনা এক লোক। সোজা এগিয়ে গেল চিঠি ফেলার বাক্সের দিকে। ওর হাতের খামটা দেখে আরেকবার চমকানোর পালা। সেই হলুদ খাম, যে খামে ভরে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে, অবিকল এক।

কোন সন্দেহ নেই, এই লোকের অপেক্ষাতেই রয়েছে সে। গাড়ির নম্বরটা মুখস্থ করে নিল।

চিঠি ফেলেই চলে গেল লোকটা, দেরি করল না।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এসে পোস্ট অফিসের বারান্দায় উঠল কিশোর। দেয়ালে বসানো পাবলিক ফোনটার দিকে ছুটল। স্লটে কয়েন ফেলে ডায়াল করতে শুরু করল। মুসাকে বলা আছে, লোকটাকে মুসা যদি দেখে তাহলে ডোভারভিল পোস্ট অফিসের রিসেপশনে ফোন করে কিশোরকে চাইবে, আর কিশোর যদি দেখে তাহলে গ্রীনহিলসের পোস্ট অফিসে করবে। তা-ই করল। রিসেপশনিস্টকে অনুরোধ করল, 'মুসা নামে একজন বসে আছে, তাকে ডেকে দিতে।'

আধ মিনিটও পার হলো না, ফোন ধরল মুসা।

কিশোর বলল, 'এইমাত্র চিঠি ফেলে গেল। তোমার আর বসে থাকার দরকার নেই। রবিনের কাছে চলে যাও। আমিও আসছি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আবার বারান্দা থেকে দৌড়ে নিচে নামল কিশোর। সাইকেল নিয়ে গ্রীনহিলসে ছুটল।

ওকে ডেকে দেয়ার জন্যে রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল মুসা। সে-ও দেরি করল না। মিস্টার বারগারের বাড়ি রওনা হলো।

পনেরো মিনিট পর সময়মতই পৌছল সেখানে। দেখল গেটের বাইরে

একটা নীল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গ্যারেজের সামনের চত্বরে রবিনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সানগ্লাস পরা এক লোক। ওকে টেনে-হিঁচড়ে গেটের দিকে আনার চেষ্টা করছে।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলল মুসা, রবিনকে টনি ভেবে কিডন্যাপ করতে চাইছে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। সাইকেলটা তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে দৌড়ে এসে গাড়ির ব্যাক ডালা তুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

রবিনকে টেনে এনে গাড়ির পেছনের সীটে প্রায় ছুঁড়ে ফেলল লোকটা। পিছমোড়া করে ওর হাত বেঁধে রেখে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

কিছুক্ষণ চলার পর থামল গাড়িটা। ব্যাক ডালার ভেতর থেকে শুনতে পেল মুসা, দরজা খুলে নামল লোকটা। পেছনের দরজা খুলে রবিনকে নামাল। খিকখিক করে হেসে বলল, 'তারপর, মিস্টার টনি বারগার, যাত্রাটা কেমন লাগল?'

ফুঁসে উঠল রবিন, 'আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? জানেন, আমার বাবা পুলিশে খবর দেবে। পুলিশ এসে ঘিরে ফেলবে এ বাড়ি। আমাকে বের করে নিয়ে যাবে। বাঁচতে পারবেন না আপনি।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে বলল লোকটা, 'তুমি যে এখানে আছ কি করে জানছে তোমার বাবা?'

'পুলিশ ঠিকই খোঁজ করে বের করে ফেলবে।'

'না, পারবে না। আমাদের এই বাড়িতে মাটির নিচে চমৎকার একটা কয়লা রাখার ঘর আছে। ওখানে ভরে রাখব তোমাকে। আমরা না জানালে পুলিশ জানতেই পারবে না কিছু।'

'আমরা মানে? আরও কেউ আছে নাকি আপনাদের দলে?'

'থাক, অত কথা শোনার দরকার নেই। এসো আমার সঙ্গে।'

বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। কিছু করতে পারল না। তিন-চার মিনিট পরই সব শান্ত হয়ে গেল। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে ঢাকনা ঠেলে তুলে বেরিয়ে এল মুসা। দেখল, গাছপালায় ঘেরা অনেক বড় একটা বাড়িতে ঢুকেছে। অবাক হলো দেখে, বাড়িটা ওর চেনা, মিস্টার সোয়ানসনের বাড়ি। তিনি একজন ভদ্রলোক, কিডন্যাপের সঙ্গে জড়িত হতেই পারেন না। লোকজন কাউকে চোখে পড়ল না।

রবিনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, শুনেছে মুসা। মাটির নিচের কয়লা রাখার ঘরটা এখন খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লোকটা বেরিয়ে গেলে তারপর ঢোকার ইচ্ছে। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা পরও লোকটা বেরোল না দেখে অস্থির হয়ে উঠল মুসা। আর বসে থাকতে পারল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

সদর দরজার পাল্লা ভেজানো। ঠেলা দিতে খুলে গেল। উঁকি দিয়ে একবার ভেতরটা দেখে নিয়ে চট করে ঢুকে পড়ল সে। বারান্দা ধরে এগোতে গিয়ে কানে এল পাশের ঘরে টেলিফোনে কথা বলার শব্দ। রবিনকে যে ধরে এনেছে সেই লোকটার কণ্ঠ।

দরজায় কান পেতে শুনতে লাগল মুসা।

লোকটা বলছে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মিস্টার বারগারকে চাই!...মিস্টার বারগার বলছেন?...আমাকে চিনবেন না। শেষ চিঠিটা পেয়েছেন?... তাহলে পাবেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই. পোস্ট করে দেয়া হয়েছে। ওতে বলা হয়েছে কি কি করতে হবে আপ াকে। তবু আগেভাগেই খবরটা জানিয়ে রাখি, আপনার ছেলে এ মুহূ,ে আমার কজায়। আমার কথা না শুনলে কোনদিনই আর ফেরত পাবেন না ওকে। আজকের কাগজে দেখলাম রেডরোজ কটেজ বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছেলেকে ফেরত চাইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে...'

আর কিছু না বলে মাঝপথে লাইন কেটে দিল লোকটা।

দরজার কাছ থেকে দ্রুত সরে এল মুসা। লোকটার চোখে পড়ে গেলে এখন সর্বনাশ হবে। এগিয়ে চলল গলি ধরে। কয়লা রাখার ঘরটা কোথায় পাওয়া যাবে? রান্নাঘরের কাছে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। লোকটা বলেছে, সেটা নিচতলাতে আছে।

নিচে নামার পথ খুঁজতে শুরু করল মুসা।

চোদ্দ

নীল গাড়িটা মিস্টার বারগারের বাড়ির কাছ থেকে সরে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর ওখানে পৌঁছল কিশোর। রবিনকেও দেখল না, মুসাকেও না। অনেক খোঁজাখুঁজি করল দু'জনকে, পেল না; ঝোপের ভেতর দেখতে পেল ওদের সাইকেল দুটো। চিন্তায় পড়ে গেল। কি করা যায়? মনে হতে লাগল, খারাপ কিছু ঘটেছে ওদের। হয়তো রবিনকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে কিডন্যাপার, সঙ্গে মুসাকেও নিয়ে গেছে। ওদের বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা দরকার।

সাইকেলে চেপে দ্রুত মুসাদের বাড়ি রওনা হয়ে গেল সে। ফারিহাকে জিজ্ঞেস করা দরকার, মুসা কোন খবর পাঠিয়েছে কিনা।

কিন্তু ফারিহা কিছু বলতে পারল না। আর কোন উপায় নেই, পুলিশকে খবর দিতেই হবে। ফগর্‍্যাম্পারকট নেই। ক্যাপ্টেন রবার্টসনের অফিসে ফোন করল কিশোর। তাঁকে অফিসেই পাওয়া গেল। সংক্ষেপে সব কথা জানাল কিশোর। নীল গাড়িটার নম্বর দিল।

কিশোরকে ফোনের কাছে অপেক্ষা করতে বলে লাইন কেটে দিলেন ক্যাপ্টেন। দশ মিনিট পর ফোন করলেন আবার। জানালেন, গাড়িটা গ্যালিলেসের মিস্টার সোয়ানসনের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। দলবল নিয়ে তিনি সে-বাড়িতে খোঁজ নিতে যাচ্ছেন।

ওকেও তুলে নেয়ার অনুরোধ জানাল কিশোর। বলল, মুসাদের বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কয়লা রাখার ঘরটা বের করতে সময় লাগল না মুসার। রান্নাঘরের কাছে নয়, বেশ খানিকটা দূরে, অন্য জায়গায়। নিচে নেমে রবিনকে বের করে আনল সে। ফিরে এল সেই ঘরটার কাছে, যে ঘরে টেলিফোন আছে, যেখানে ফোনে লোকটাকে কথা বলতে শুনেছে। ফাঁক হয়ে আছে দরজাটা। উঁকি দিয়ে দেখল, ভেতরে কেউ নেই। কাগজপত্র আর ফাইল দেখে বোঝা যায় এটা অফিস ঘর। একটা ছোট টাইপ রাইটার রয়েছে টেবিলে।

যন্ত্রটা দেখে চট করে কথাটা মনে পড়ে গেল রবিনের। মুসাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। সোজা এসে দাঁড়াল টাইপ রাইটারটার সামনে। রোলারে একটা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়ে O অক্ষরটা টাইপ করল। যা ভেবেছিল, তাই। অক্ষরটা ক্ষয়া। চিঠিগুলোতে যেমন দেখেছে। এই মেশিন দিয়েই টাইপ করা হয়েছিল ওগুলো। ডজনখানেক O টাইপ করে নিয়ে খুলে নিল কাগজটা। ভাঁজ করে পকেটে রাখল। পত্রলেখকের বিরুদ্ধে এটা একটা জোরাল প্রমাণ।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল মুসা।

চমকে গেল রবিন, ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

'দেখো এই প্যাডটা! টাইগার ড্যান রোড কোম্পানির নাম ছাপা, ভারওয়ালার কার্টার যারা নিয়েছে!'

ঠিক এই সময় দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। রবিনকে টেনে নিয়ে একটা বড় সোফার আড়ালে বসে পড়তে গেল মুসা। কিন্তু লুকানোর আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা। দেখে ফেলল ওদের।

চিৎকার করে ওদের দিকে দৌড়ে এল সে।

আর বসে থাকার অর্থ হয় না। লাফিয়ে উঠে দু'জন দু'দিক দিয়ে দরজার দিকে ছুটল।

ওদের আগেই দরজার কাছে পৌঁছে গেল লোকটা। ছিটকানি লাগিয়ে দিল। তারপর এগোল রবিনকে ধরার জন্যে।

এর পর দ্রুত ঘটতে লাগল ঘটনা। শোনা গেল পুলিশের সাইরেন। থমকে গেল লোকটা। জানালায় গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেই দৌড় দিল দরজার দিকে। রবিন বা মুসাকে ধরার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না আর।

লোকটা কি দেখেছে, দেখার জন্যে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'আর ভাবনা নেই, রবিন; পুলিশ এসে গেছে!'

বাড়ি ঘিরে ফেলল পুলিশ। গাড়ি থেকে নামলেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন। সঙ্গে

কিশোর।

বাড়িতে দু'জন লোককে পাওয়া গেল—একজন সেই চশমাওয়ালা, যে রবিনকে কিডন্যাপ করেছিল, আরেকজন মোটাসোটা বয়স্ক লোক, দু'জনকেই ধরল পুলিশ। নিয়ে এল হলঘরে।

'কি নাম?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল মোটা লোকটা। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। নিচের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'হার্ব গ্যাটলিঙ।'

'আর আপনার?' চশমাওয়ালার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন।

'ফ্রগ গ্যাটলিঙ।'

'সম্পর্ক আছে নাকি?'

'ও আমার ছেলে,' মাথা নামিয়ে রেখেই জবাব দিল বুড়ো।

'টিডিআর কোম্পানির সঙ্গে কি সম্পর্ক? আমি তো জানতাম ওটা একটা সৎ কোম্পানি।'

'ওটার বেশির ভাগ মালিকানা আমার।'

'মিস্টার সোয়ানসনের বাড়িতে কি করছেন আপনারা?'

'এখন এটা আমার বাড়ি, সোয়ানসনের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।'

'সোয়ানসন বিক্রি করে দিয়েছেন! জানতাম না তো! কেন করলেন? টাকার কোন অসুবিধে ছিল না তাঁর। তা ছাড়া এ বাড়ি তাঁর পছন্দের বাড়ি। হুট করে বিক্রি করতে গেলেন কেন?'

'হুট করে করেননি, দোষটা আমার,' কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল অনুশোচনায় ভুগতে আরম্ভ করেছে হার্ব গ্যাটলিঙ।

'মানে!'

'এই বাড়ির ওপর দিয়ে হাইওয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাই টিডিআর কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়েছে।'

'রাস্তা তাহলে গেল না কেন?'

সব পরিষ্কার হয়ে এল কিশোরের কাছে। হাত তুলল, 'আমি বলি, স্যার, কেন যায়নি। বাড়ির ওপর দিয়ে হাইওয়ে যাবে শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়ে যান সোয়ানসন। টিডিআর কোম্পানির নামে সেটা কিনে নেয় মিস্টার গ্যাটলিঙ। যেই কেনা হয়ে গেল, বাড়িটা ঘুরেফিরে দেখল, লোভ হয়ে গেল রাখার জন্যে। সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করে রাস্তার মুখ অন্য দিকে ঘোরানোর ব্যবস্থা করল, অন্য জায়গার ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল—সেই জায়গাটা হলো মিস্টার বারগারের রেডরোজ কটেজ। যেহেতু রাস্তা বানানোর কন্ট্রাক্ট সে পেয়েছিল, কাজটা করাতে বেগ পেতে হয়নি তার। রাস্তাটা রেডরোজে হলে দুটো সুবিধে হত; নতুন কেনা বাড়িটা বেঁচে যেত, রেডরোজের বিশাল জায়গায় পেট্রল পাম্প, কাফে, মোটর গ্যারেজ, এ সব করতে পারত। মিস্টার বারগারের ছেলেকে কিডন্যাপ করার ভয় দেখিয়ে তাঁকে রাজি হতে বাধ্য করেছিল। আমি শিওর, মিস্টার সোয়ানসনকেও কোন

ভাবে ভয় দেখিয়ে, চাপ দিয়ে বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে। নইলে এত সহজে তিনি বাড়ি ছাড়তেন না।'

জবাব দিল না বুড়ো কিংবা তার ছেলে। মাথা নিচু করে রইল।

হপ্তাখানেক পর মিস চেরির বাড়িতে পার্টির আয়োজন করা হলো। রেডরোজ কটেজ বেঁচে গেছে। একটা বাড়িও আর ভাঙা হয়নি। জায়গা বিক্রি করেননি মিস্টার বারগার। টিডিআর কোম্পানির কাছ থেকে কন্ট্রাক্ট কেড়ে নিয়ে অন্য কোম্পানিকে দেয়া হয়েছে। তারা দেখেশুনে গাঁয়ের বাইরের এমন জায়গা দিয়ে রাস্তা নেয়ার ব্যবস্থা করেছে, যাতে জনসাধারণের কারও কোন ক্ষতি না হয়। কটেজের বাসিন্দা যারা চলে গিয়েছিলেন, তাঁরাও আবার ফেরত এসেছেন।

পার্টিতে অনেককে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তাতে কিশোর গোয়েন্দারা তো আছেই, মিস্টার বারগার এবং তাঁর ছেলে টনি আছে, ক্যাপ্টেন রবার্টসনও দাওয়াত পেয়েছেন। বিরাট এক কেক বানিয়েছেন মিস চেরি। পাঁচ গোয়েন্দার সম্মানে তাতে পাঁচ রকমের সুগন্ধি জিনিস মিশিয়েছেন—ভ্যানিলা, চকলেট, কলা, লেবু আর স্ট্রবেরি।

পার্টিতে মিস্টার বারগার ঘোষণা দিলেন, রেডরোজ কটেজ আর কোন দিন যাতে কোন কারণেই না ভাঙা হয়, তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করবেন তিনি।

হাততালি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে স্বাগত জানাল সবাই।

তাঁর বক্তৃতার পর এগিয়ে এলেন মিস চেরি, উজ্জ্বল নীল আর সবুজ রঙের পোশাক পরেছেন, ঘোষণা করলেন, 'খাবার টেবিলে আসুন সবাই, চা রেডি।'

হুল্লোড় করে উঠল ছেলেমেয়েরা।

****

ঠগবাজি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

বিকেলের প্রচণ্ড ভিড়ে রকি বীচ সোয়াপ মিটের ভেতর দিয়ে পথ করে করে এগোচ্ছে রবিন। সে-বছরের জন্যে স্কুল শেষ, সামনে লম্বা ছুটি, তাই অকারণ বসে না থেকে আবার কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। পার্ট টাইম দুটো চাকরির যে কোন একটা করবে ভাবছে। গত কয়েকটা মাস প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে, বই ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী, তাই আপাতত আর বইয়ের কাছে ঘেঁষার আগ্রহ তার নেই। বাকি রইল গানের কোম্পানিতে চাকরি। সেটাই করবে ঠিক করেছে।

জুনের উত্তপ্ত বিকেলকে আরও গরম করে তুলেছে গরম রক মিউজিক। 'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারস' দল এমন বাজনা বাজাচ্ছে, নাচার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে পা। প্রচুর সাড়া পাচ্ছে ওরা ইদানীং, নানা জায়গা থেকে গান গাওয়ার অফার আসছে। এই তো, আগামী শনিবারে রিচার্ড বিগের রক অ্যান্ড রোল প্রতিযেগিতায় অংশও নিতে যাচ্ছে। আজকে ওরা মনোরঞ্জন করতে এসেছে সোয়াপ মিট মার্কেটের ক্রেতাদের।

রবিনের বাঁ হাতে একটা মলাটের বাক্স। তাতে রয়েছে পুরানো মলিন নোটবুক, পুরানো কলম, কাগজ, ইরেজার, একটা দোমড়ানো ক্যাপ, আর স্কুলের গবেষণা মূলক রচনা-প্রতিযোগিতার জন্যে একটা লেখা—হেডিং দিয়েছে 'নীল মাছির জীবন-চক্র'। সব কিছুর ওপরে ভাঁজ করে রেখেছে একটা খালি ব্যাকপ্যাক। স্কুল থেকে ফিরেছে, তাই সঙ্গেই রয়েছে জিনিসগুলো।

বাক্সটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিল রবিন, নিজের অজান্তেই বাজনার তালে পা মিলিয়ে অনেকটা নেচে নেচে এগোল। স্টেজের দিকে এগোচ্ছে তার বস বার্টলেট লজের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারসকে রিপ্রেজেন্ট করছেন লজ, আর এখানে রবিন হলো তাঁর এক নম্বর সহকারী।

সারি সারি দোকানের পাশ দিয়ে এগোল রবিন। হাতুড়ি-বাটাল থেকে শুরু করে খেলনা এমনকি দামী গহনপাতি পর্যন্ত সব আছে ওসব দোকানে। বাতাসে পপকর্নের সুবাস।

রবিনের ঠিক পেছনেই রয়েছে মুসা। মাঝে মাঝে নাক তুলে পপকর্নের গন্ধ শুঁকছে। গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসের সদস্যদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছে রবিন, তাই মার্কেটে এসে বসে ছিল ওর অপেক্ষায়।

আরও কিছুদূর এগোতে একজায়গায় ভিড় পাতলা হয়ে এল। মুসা বলল, 'অ্যাই, খাওয়ানোর কথা ভুলে গেছ? ফোক্স ওয়াগেনটা অচল হয়েই থাকবে

কিন্তু বলে দিলাম।' রবিনের গাড়িটার কিছু মেরামতি দরকার, সেটার কথাই মনে করিয়ে দিয়ে হুমকি দিল সে।

হাসল রবিন। 'না, ভুলিনি। এখানে খাবে কি করে? দাঁড়াও না, ভিড় একটু পাতলা হোক।'

ডানে একটা স্টলের ওপরে ঝোলানো ব্যানারের ওপর চোখ পড়ল। লাল কাপড়ে সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে:

বিরাট মূল্যহ্রাস
৬ ডলারের টেপ ২ ডলার
একসঙ্গে তিনটা নিলে ৫ ডলার

'আরি, কি কাণ্ড!' বলে উঠল রবিন, 'এত সস্তা!'

এ সবে তেমন আগ্রহ নেই মুসার, গুঙিয়ে উঠল।

কেয়ারই করল না রবিন। 'এসো তো দেখি!' বলেই লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল দোকানের ডিসপ্লে টেবিলের কাছে। নানা রঙের শত শত গান আর মিউজিকের ক্যাসেট ছড়িয়ে রাখা হয়েছে টেবিলটায়। পায়ের কাছে বাক্সটা নামিয়ে রেখে ক্যাসেট বাছতে আরম্ভ করল সে।

বিরক্ত লাগছে মুসার। রবিনকে সরিয়ে আনার জন্যে বলল, 'লজ অপেক্ষা করছেন তো। তোমার গাড়িটাও মেরামত করা দরকার। ওদিকে কিশোরও নিশ্চয় অপেক্ষা করছে।'

'এখনও অনেক সময় আছে আমাদের হাতে। কিশোরকে নিয়েও ভাবি না। সময় কাটানোর জন্যে কিছু না কিছু পেয়ে যাবেই। সকালে দেখলাম একগাদা পুরানো মাল নিয়ে এসেছেন রাশেদ আংকেল, কতগুলো বাতিল ইলেকট্রনিক মেশিন আছে তার মধ্যে। আমি শিওর, ওগুলো ঘাঁটাঘাঁটিতেই ব্যস্ত এখন সে। আমাদের জন্যে মোটেও অস্থির হবে না।'

'বেছে দেব?' জিজ্ঞেস করল ক্যাসেটের দোকানদার।

কালো একজোড়া চোখের দিকে তাকাল রবিন। লোকটা এশিয়ান। আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাচ্ছে টেবিলে, গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসের বাজনার তালে তালে। সবাইকে সংক্রমিত করে ফেলছে মিউজিকটা। অস্থির মনে হচ্ছে লোকটাকে।

'না, আমিই পারব, ধন্যবাদ,' মানা করে দিল রবিন। 'বেশিক্ষণ লাগবে না বাছতে। 'দারুণ সংগ্রহ তো আপনাদের।'

'তিনটা কিনে ফেলো, এক ডলার রেয়াত পাবে,' বলল দোকানদার। রিনরিনে কণ্ঠস্বর। কিন্তু কথায় প্রাণ নেই। তাকিয়ে রয়েছে জনতার দিকে, যেন কারও ওপর নজর রাখছে।

'জলদি করো,' তাগাদা দিল মুসা।

একটা টেপ তুলে নিল রবিন, বুশহোয়াকার ব্যান্ডের একটা পুরানো ধাঁচের গান। তারপর নিল একটা ক্যারিবিয়ান ব্যান্ড, সবশেষে একটা ওয়াটার্স ওয়ান্ডারফুল।

একটা পাঁচ ডলারের নোট বাড়িয়ে দিল দোকানদারের দিকে। মুসার দিকে তাকিয়ে ক্যাসেটগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ডিনামাইট!'

নোটটা বাক্সে রেখে দিল দোকানদার।

'তুমি যা শুরু করলে, গানই তো শেষ হয়ে গেল ওদিকে,' রওনা হয়ে গেল মুসা।

বাক্সে ক্যাসেট ভরে দৌড়ে এসে তার পাশাপাশি হলো রবিন।

স্টেজের দিকে এগোতে এগোতে মুসা বলল, 'সত্যিই ভাল গায় গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারাররা।'

'তা তো গায়ই। লজ কি আর সহজে ভোলার লোক। তাঁর ধারণা, রিচার্ড বিগ কনটেস্টে ওরাই জিতবে। দশ হাজার ডলারে কনট্রাক্ট করেছে।'

'কবে হচ্ছে?'

'আর তিন দিন। শনিবার রাতে, লস অ্যাঞ্জেলেসে।'

অবশেষে সোয়াপ মিটের কেন্দ্রে পৌছল দু-জনে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়ায় স্টেজ করা হয়েছে। এখান থেকে আশপাশের দোকানগুলো সব দেখা যায়। এক হাজার স্টল হবে, অনুমান করল রবিন। লোকে হাসছে, নাচছে, কটন ক্যান্ডি খাচ্ছে, আর দর কষাকষি করছে দোকানদারদের সঙ্গে। সবাইকে গরম করে রেখেছে যেন গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারস।

ঘুরে স্টেজের পেছন দিকে চলে এল দুই গোয়েন্দা। এখানটায় কোলাহল অনেকটা কম, সহজে লজের সঙ্গে কথা বলতে সুবিধে হবে রবিনের। প্যান্টের মধ্যে শার্টের নিচের অংশটা ভাল করে গুঁজে নিল মুসা। কিন্তু অস্বস্তি লাগল। বের করে রাখলেই আরাম লাগে।

রবিনের ওপর চোখ পড়তে একগাদা অ্যামপ্লিফায়ারের বাক্সের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন লজ। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। হাসিখুশি মুখ, চোখের দৃষ্টিতে শিশুর সরলতা।

রবিনের হাতের বাক্সটার ওপর চোখ পড়ল তাঁর। 'কি আছে ওতে?'

'এই বাতিল জিনিস সব, স্কুলের। আর তিনটে গানের ক্যাসেট। মূল্যহ্রাস দেখলাম, কিনে ফেললাম।'

গানের সব কিছুতেই লজের প্রবল আগ্রহ। 'দেখি তো?'

বুশহোয়াকারের ক্যাসেটটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বললেন লজ, 'আহ্, আমাদের যে কবে এ রকম ক্যাসেট হবে!'

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'হায়, হায়!'

'কী?' জানতে চাইল মুসা।

'লেবেলে বুশহোয়াকারের বানান ভুল!'

বানানটা দেখল মুসা—B u s h w a c k e r s. ভুলটা ধরতে পারল না। বলল, 'কই, ঠিকই তো আছে।'

'না, নেই,' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'ডব্লিউর পরে আরেকটা এইচ থাকার কথা, নেই!'

'রেকর্ড কোম্পানি তো ব্যাকরণ বই প্রকাশ করে না যে বানান নিয়ে মাথা ঘামাবে। ও রকম ভুল হয়েই থাকে।'

কিন্তু তার কথা সমর্থন করলেন না লজ, বললেন, 'না, বড় বড় কোম্পানিগুলোর সব কিছু নিয়েই খুঁতখুঁতি। নামের বানান তো বটেই। কারণ জাল হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।'

তিনটে ক্যাসেটই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখল ওরা। লেবেলের কাগজের রঙটা মলিন মনে হলো, নতুন ক্যাসেটে সাধারণত যেমন ঝকঝকে থাকে তেমন নয়। ধারগুলোও ঘষা ঘষা। একটা কভারের ওপরের লেখাটা সাধারণ টাইপরাইটারে টাইপ করা। অন্য দুটো কভার আসলগুলোর ফটোকপি, কালার জিরোক্স মেশিনে কপি করা। বুশহোয়াকারের কভারটা দেখে মনে হলো কাঁচা হাতে রঙ করে কভার তৈরি করেছে কোন অদক্ষ আর্টিস্ট, নামের বানান ভুল, তারপর মেশিনে সেটার কালার কপি করে নিয়েছে।

'ক্যাসেটগুলো বাজিয়ে শোনা দরকার,' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। কোমরে ঝোলানো ওয়াকম্যানটার ক্লিপ খুলে হাতে নিল।

একটা ক্যাসেট মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ে ইয়ারফোন কানে লাগাল। সুইচ দিয়ে কয়েক সেকেন্ড শুনেই তাড়াতাড়ি কান থেকে সরিয়ে নিল ইয়ারফোন। নীরবে তুলে দিল রবিনের হাতে। 'বাপরে বাপ, কানের বারোটা বাজবে!'

রবিনও শুনল। আসল শব্দের চেয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডের শব্দই বেশি, খালি গোঁ-গোঁ আর কিঁচকিঁচ করে। সাংঘাতিক বিরক্তিকর।

প্রথম দুটো তো কোনমতে শোনা যায়, তৃতীয়টা একেবারেই বাজে। একটানে ইয়ারফোন খুলে নিয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'ব্যাটা ঠকিয়েছে আমাকে!'

দুই

'ডাকাত!' আবার বলল রবিন।

'তা বটে,' লজ বললেন, 'সোয়াপ মিটে আরও অনেক ডাকাত আছে। দোকান দিতে আসেই ওরা ডাকাতি করার জন্যে।'

'ঘটনাটা কি?' কিছুই বুঝতে পারছে না মুসা। 'রেকর্ড খারাপ?'

'টেপ পাইরেটস বলে এদেরকে,' বুঝিয়ে দিল রবিন। 'রেকর্ড কিংবা টেপ থেকে নকল করে ওরা, ছিল-ছাপ্পড় মেরে আসল বলে চালিয়ে দেয়। কোয়ালিটি হয় জঘন্য। কি সাংঘাতিক, শেষ পর্যন্ত আমাকেও ঠকিয়ে দিল!'

'হ্যাঁ, গানের মাস্টারকে,' হেসে ভুরু নাচালেন লজ, 'কি করতে চাও এখন?'

লজের দিকে তাকাল রবিন, মুসার দিকে ফিরল। চিবুক তুলল। 'টাকা ফেরত আনতে যাব!'

'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না?' মুসা বলল অনেকটা অভিযোগের সুরেই, 'খাওয়ালেও না, পরিচয়ও করালে না...'

'অনেক সময় আছে। আমরা আসতে আসতে গান শেষ হয়ে যাবে ওদের, পরিচয় করাতে তখনই সুবিধে। এসো।'

মলাটের বাক্সটা নিয়ে আবার ফিরে চলল রবিন। বিড়বিড় করে কিছু বলছে, বোধহয় গাল দিচ্ছে ঠকবাজদের। তাকে অনুসরণ করল মুসা আর লজ।

'ওই যে স্টলটা,' হাত তুলে লজকে দেখাল রবিন।

'অ্যাই,' মুসা বলল, 'এখন দু-জন লোক।'

দ্বিতীয় লোকটাও এশিয়ান। প্রথমজনের চেয়ে লম্বা, গাট্টাগোট্টা। তবে একই ধরনের চৌকানা চোয়াল, কঠিন চেহারা, ডান চোখের নিচ থেকে একটা কাটা দাগ নেমে এসেছে চোয়ালের কাছে। তাতে কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চেহারাটাকে। রবিন ভাবল, চেহার যেমন, হয়তো স্বভাবেও তেমনই ভয়ঙ্কর লোকটা।

তাড়াহুড়ো করে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্টলের পেছনে দাঁড়ানো একটা নীল ডজ গাড়িতে তুলছে দু-জনে।

বড় ডিসপ্লে টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা, রবিন আর লজ। বেশির ভাগ টেপই আবার বাক্সে প্যাক করে ফেলা হয়েছে। চারপাশে তাকাল রবিন। আর কোন দোকানিই এত তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে যাওয়ার কথা ভাবছে না।

'টেপগুলো নেব না,' চোরের সঙ্গে গলাবাজি না করে ভদ্রভাবেই বলল রবিন। 'টাকা ফেরত দিন। এগুলো নকল জিনিস,' টেপ তিনটে বাড়িয়ে ধরল সে। 'পাঁচ ডলার দিয়েছিলাম।'

দ্রুত কাজ করছে লোকগুলো। ফিরেও তাকাল না। বেঁটে লোকটা এত দ্রুত বাক্সে ক্যাসেট ভরছে, মনে হচ্ছে মেশিন। বাক্স নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলছে দ্বিতীয়জন, অর্থাৎ কাটা দাগওয়ালা লোকটা। বাক্স রেখেই দৌড়ে ফিরে আসছে, ছোঁ দিয়ে খালি আরেকটা বাক্স তুলে নিয়ে তাতে ক্যাসেট ভরছে। ভরা হয়ে গেলে রাখার জন্যে ছুটে যাচ্ছে আবার। অচেনা একটা ভাষায় নিচুস্বরে কথা বলছে দু-জনে, যার কিছুই বুঝতে পারছে না রবিন। বার বার চোখ তুলে জনতার দিকে তাকাচ্ছে ওরা।

'দেখুন,' স্বর আরেকটু চড়িয়ে বলল রবিন, মলাটের বাক্সে শক্ত হলো তার হাতের চাপ, 'এই টেপগুলো ভাল না। আমার টাকা ফেরত দিন। এখুনি!'

এবারও সাড়া মিলল না। রবিনকে যেন দেখতেই পাচ্ছে না লোকগুলো।

'দেখুন,' এইবার এগিয়ে গেলেন লজ, 'শুনতে পাচ্ছেন? টেপগুলো নকল, পাইরেসি করা হয়েছে। ছেলেটা তার টাকা ফেরত চাইছে। পুলিশের

ঝামেলায় যেতে চান না নিশ্চয়। টাকাটা দিয়ে দিন। গোলমাল না করলেই খুশি হব।'

ক্যাসেট ভরা থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল লম্বা লোকটা। বিদেশী ভাষায় কি যেন বলল। তারপর রাগত চোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে তার হাত থেকে ক্যাসেটগুলো প্রায় কেড়ে নিল।

'আরে, আরে!' বাক্সটা শক্ত করে ধরে আরেক হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটগুলো ধরার জন্যে বাঁকা হয়ে গেল রবিন।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। আছাড় দিয়ে ক্যাসেটগুলো বাক্সে ফেলল লোকটা। আরও কয়েকটা ক্যাসেট নিয়ে বাক্সে ফেলে ডালা লাগিয়ে দিল।

অনেক সহ্য করেছে মুসা। ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে গেল তার। রাগ থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। খপ করে দু-হাতে চেপে ধরল দুই পাইরেটের একটা করে হাত। কঠিন স্বরে বলল, 'টাকাটা ফেরত দিন! এক্ষুণি!'

চেহারার ভাব পাল্টে গেল লোকগুলোর। মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। চোখে আতঙ্ক।

অবাক হলো মুসা। তাকে দেখে নিশ্চয় নয়। মুহূর্তের জন্যে হাতের চাপ শিথিল করল।

এই একটা মুহূর্তই প্রয়োজন ছিল ওদের। মোচড় দিয়ে হাত ছুটিয়ে নিয়ে টেবিলে পড়ে থাকা শেষ কয়েকটা টেপ তুলে নিয়ে বাক্সে ফেলল। তারপর বাক্স নিয়ে দৌড় দিল ভ্যানের দিকে।

হাই জাম্পারের মত একলাফে টেবিল ডিঙাল মুসা। ছুটল লোকগুলোর পেছনে।

টেবিলের পাশ ঘুরে তাকে অনুসরণ করল রবিন আর লজ।

এই সময় কানে এল চিৎকার। দুপদাপ করে তাদের পেছনে দৌড়ে আসছে কে যেন।

মরিয়া হয়ে বাক্সগুলো ভ্যানের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিল লোকগুলো। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কাঁধের ওপর দিয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চেয়েই ড্রাইভিং সিটের দিকে ছুটল লম্বা লোকটা। দড়াম করে পেছনের দরজা লাগিয়ে দিল তার বেঁটে সঙ্গী।

ভ্যানের কাছে পৌঁছে গেছে মুসা, এই সময় আরও দু-জন লোক তারই মত করে ডিসপ্লে টেবিলটা টপকে তেড়ে এল পাইরেটদের।

আগন্তুকদের একজনের সোনালি চুল, বড় বড় পায়ের পাতা, ঘন ভুরু, কঠিন, শীতল চেহারা। হাতের ধাক্কায় দু-দিকে সরিয়ে দিল মুসা আর লজকে।

তার সঙ্গের অন্য লোকটা পাইরেটদের মতই এশিয়ান। কালো চোখের তারায় আগুন।

একটানে ভ্যানের পেছনে দাঁড়ানো বেঁটে পাইরেটকে কাছে এনে

চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল সোনালি চুল লোকটা। পড়ে গেল বেঁটে। লোকটা তখন ছুটে গেল লম্বা লোকটাকে ধরার জন্যে। দরজা লাগাতে যাচ্ছিল লম্বু, পারল না, কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সীট থেকে একেবারে মাটিতে ফেলে দিল সোনালি চুল।

তড়বড় করে কোনমতে উঠে দাঁড়াল আবার বেঁটে। কাছেই দাঁড়ানো সোনালি চুলের সঙ্গে আসা এশিয়ান লোকটা, চেপে ধরল তাকে, রবিনের কাছে দুর্বোধ্য সেই একই রকম বিদেশী ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করতে লাগল। জবাব দিল না বেঁটে। পালানোর চেষ্টা করতে লাগল।

একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল মুসা, রবিন আর লজ।

'ব্যাপারটা কি, বলো তো?' লজের প্রশ্ন।

'আল্লাই জানে!' মাথা নাড়ল মুসা।

'তাজ্জব ব্যাপার,' বিড়বিড় করল রবিন। 'কিশোর থাকলে এখন হত। তিন গোয়েন্দার জন্যে কেস পেয়ে যেত আরেকটা।'

তুমুল লড়াই বেধে গেছে এখন। পাল্টা আক্রমণ করে বসেছে দুই পাইরেটও। দু-জনের সঙ্গে দু-জন লড়ছে। সাহায্য করার কথা ভাবছে মুসা। কিন্তু কাদের করবে? ভাল লোক কোন পক্ষ?

লজের দিকে তাকাল সে।

তার নীরব প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন তিনি। নীরবেই হাত নেড়ে জবাব দিলেন, জানি না।

আশপাশে লোক জমতে আরম্ভ করেছে। লড়াই এখন তুঙ্গে। হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল মুখে কাটা-দাগওয়ালা লোকটা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল তেড়ে আসছে সোনালি চুল।

রবিনের দিকেই আসছে লোকগুলো। পথরোধ করার চেষ্টা করল সে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল লম্বা লোকটা। গতি কমাল না। সামনে পথ নেই দেখে ঘুরে আবার ভ্যানের দিকে এগোল লোকটা। লেগে রইল সোনালি চুল।

পড়ে গেছে রবিন। তার হাতের বাক্স মাটিতে পড়ে খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু কিছু জিনিস চলে গেছে পাশের দোকানটার কাছে। শক্ত কিছুতে ঠুকে গেল মাথা। চোখের সামনে ঝিকিয়ে উঠল যেন হাজারটা নানা রঙের তারকা।

তিন

'রবিন! অ্যাই রবিন! রবিন!'

চোখ মেলে দেখল সে, তার মুখের কাছে ঝুঁকে আছে মুসা আর লজ। মনে হলো, একপাশে কে যেন তার বাক্সটা হাতানোর চেষ্টা করছে। বাতাসে

ভাসতে ভাসতে উঠে দাঁড়াল যেন একজন মানুষ, হাতে মলাটের বাক্স।

পাগল হয়ে গেলাম নাকি!—ওঠার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু কয়েকশো মন ভারী হয়ে গেছে যেন শরীর। চোখ মুদল আবার।

মুখের আরও কাছে মুখ এনে চিৎকার করে ডাকল মুসা, 'রবিন!'

'এই,' লজ ডাকলেন, 'ঠিক আছো তুমি, রবিন? কি অসুবিধে?'

মাটিতে চিত হয়ে আছে সে। মাথা রয়েছে পাশের দোকানের ধাতব টুলবক্সটার কয়েক ইঞ্চি দূরে। বাক্সটাতে বিক্রির জন্যে রাখা হয়েছে পাওয়ার টুলস।

ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার গুঙিয়ে উঠল সে।

চেপে তাকে শুইয়ে দিল মুসা, 'থাক, থাক, শুয়ে থাকো।'

লজ বললেন, 'ভালো না লাগলে ওঠো না।'

চোখ মেলল রবিন। 'এখনও মারপিট করছে ওরা?' মাথার যেখানে ব্যথা লেগেছে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে আঁউক করে উঠল। আর জায়গা পেল না ব্যথা লাগার, একেবারে মাথায়!

'নিজেই দেখো,' লজ বললেন।

দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল রবিন। 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। চোখের সামনে ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গেছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। কেউ আর ভেসে বেড়াচ্ছে না। লড়ুয়েদের ঘিরে ধরেছে বিশাল জনতা। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, গোঙানি, ঘুসির শব্দ ভেসে আসছে।

ছুটে গিয়ে ভ্যানের পেছন থেকে ইয়া বড় এক রেঞ্চ টেনে বের করল কাটা-দাগওয়ালা। সোনালিচুলোর পেট সই করে বাড়ি মারল।

বাঁকা হয়ে গেল সোনালিচুলোর শরীর। কাতরে উঠল ব্যথায়। কোন সুযোগ দিল না তাকে দাগওয়ালা, ঘুসি মারল চোয়ালে। তারপর দৌড়ে গিয়ে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল বেঁটে পাইরেটও। তার আক্রমণকারীকে লাথি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে-ও দৌড় দিল গাড়ির দিকে। একটানে ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে ফেলে লাফিয়ে উঠে বসল। দুলে উঠে চলতে শুরু করল ভ্যান। পেছনে উড়ল ধুলোর মেঘ।

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল আক্রমণকারী। দৌড়ে গিয়ে ঝুলে পড়ল দরজার হাতল ধরে। কিন্তু থাকতে পারল না। হাত ছুটে গেল। উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সোনালিচুল। দূরে চলে গেছে ভ্যান। ধরার আর কোন উপায় নেই দেখে রাগে লাথি মারল মাটিতে। লাথি মেরে ফেলে দিল দোকানের ডিসপ্লে টেবিলটা।

একটা গাড়িকে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখে লাফ দিয়ে সরে গেল জনতা, ফাঁক তৈরি হয়ে গেল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

সোনালিচুলোর রাগ গিয়ে পড়ল তার এশিয়ান সঙ্গীর ওপর। তার কাঁধ

চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গর্জে উঠল। কুঁকড়ে গেল লোকটা, মাথা নাড়তে লাগল। আবার ধমকে উঠল সোনালিচুল। ধাক্কা দিয়ে তাকে পাশে সরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল জনতার ভিড়ে।

ভয়ে ভয়ে সেদিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল এশিয়ান লোকটা, তারপর সে-ও হাঁটা দিল উল্টো দিকে।

'গেল আমার পাঁচটা ডলার!' মুখ বাঁকাল রবিন।

'কাণ্ডটা করল কি!' মুসা বলল, 'কেন করল বলো তো?'

'টেপগুলো কেনার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলে? মনে হচ্ছিল, তাড়া আছে যেন লোকটার। বার বার চোখ তুলে তাকাচ্ছিল জনতার দিকে। মনে হচ্ছিল ভয় পাচ্ছে।'

'তুমি ভাবছ, সে জানত অন্য দু-জনও সোয়াপ মিটে এসেছে?'

'হয়তো। সে-জন্যেই দ্বিতীয় পাইরেটটা দোকানে এসে ঢুকেছিল, দু-জনে মিলে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে পালাতে চেয়েছে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মুসা, 'তা হতে পারে।'

উঠে দাঁড়াতে গেল রবিন। হাত চলে গেছে মাথার পেছনের আহত জায়গায়।

তাকে সাহায্য করল মুসা আর লজ।

'আস্তে, তাড়াহুড়ো কোরো না,' সাবধান করল মুসা।

দাঁড়াতে পারল রবিন।

পড়ে থাকা মলাটের বাক্সটাতে রবিনের জিনিসগুলো গুছিয়ে তার হাতে তুলে দিয়ে বলল মুসা, 'নাও।'

মজা শেষ। চোখের পলকে যেমন জমে গিয়েছিল জনতা, তেমনি করেই খালি হয়ে গেল আবার। দু-একজন অতি উৎসাহী কেবল এখনও দাঁড়িয়ে আছে ডিসপ্লে টেবিলটার কাছে—অবাক হয়ে দেখছে, যেন ওটাই সমস্ত গণ্ডগোলের মূল।

'মনে হয় ওদেরকেও তোমার মতই ঠকিয়েছিল ব্যাটারা,' সোনালিচুলোদের কথা বলল মুসা, 'সে-জন্যেই পিটাতে এসেছে।'

'হতে পারে,' একমত হলো রবিন। 'আমারই তো ধরে মারতে ইচ্ছে করছিল।'

'থাক, আর গরম হয়ে লাভ নেই,' লজ বললেন। 'কাজ ফেলে এসেছি, ভুলে গেছ?'

'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারস!' মুসা বলল।

ফিরে তাকাল তিনজনে। স্টেজের ওপর মহা উত্তেজনায় লাফাচ্ছে, দাপাচ্ছে, নাচছে, ঘুরছে, কুদছে অ্যাডভেঞ্চারাররা। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে বাদকের দলও। এমন ভঙ্গি করছে, পারলে ভেঙে ফেলে বাদ্যযন্ত্রগুলো। তাদের উত্তেজনা শ্রোতাদেরও সংক্রমিত করেছে। সোয়াপ মিট অনেক বড় জায়গা, তার ওপর রক মিউজিকের এমন শোরগোল, সুতরাং জনতার একটা

ক্ষুদ্র অংশই কেবল জানতে পারল লড়াইয়ের খবরটা।

'সোনালিচুল-আর তার সঙ্গী কোন ব্যান্ডের লোকও হতে পারে,' লজ অনুমান করলেন। 'ওদের গানই হয়তো চুরি করে মেরে দিয়েছে পাইরেটরা। খবর পেয়ে ধোলাই দেয়ার জন্যে রেগেমেগে ছুটে এসেছে অন্য দু-জন।'

'টেপ পাইরেসি। অন্যায় পথে সহজে টাকা কামানোর চেষ্টা,' মন্তব্য করল রবিন।

'আমি হলেও রেগে যেতাম। সোনালিচুলদের দোষ দিতে পারছি না।'

'এ সব জিনিস নিয়ে পাইরেসি কি খুব চলে নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

'চলে। এটা মস্ত সমস্যা ক্যাসেট ব্যবসায়ীদের জন্যে। কোন একটা ব্যান্ড নাম করে ফেললে, তাদের ক্যাসেট বিক্রি বেশি হলেই পাইরেসি শুরু হয়ে যায়। কপিরাইটের আইন করেও ঠেকানো যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা খবর বেরিয়েছিল পত্রিকায়। পাইরেসি করছিল একটা লোক। তাতে একটা রেকর্ডিং ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল তিন কোটি বিশ লাখ ডলার।'

'খাইছে!' শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'এত্তো টাকা!'

'শুধু কোম্পানিটাই এত টাকা লস দিয়েছে—কম্পোজার, গায়ক আর বাদকেরা তো বাদই। তারা তাদের রয়্যালিটি হারিয়েছে। সব যোগ করলে কত টাকা হবে, ভাবো? কল্পনা করতে পারছ অবস্থাটা?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

স্টেজের কাছাকাছি চলে এসেছে তিনজনে। গায়ে-লাগালাগি ভিড় শ্রোতাদের। কেউ কোমর দোলাচ্ছে, কেউ পা ঠুকছে, কেউ গলা মেলাচ্ছে। চুপ করে নেই কেউ। মিউজিকটা এমনই, স্থির থাকতে দিচ্ছে না কাউকে। মাথার ওপরে স্টেজে একটা গানের শেষ পর্যায়ে চলে গেছে অ্যাডভেঞ্চারারবরা। স্টেজের পেছনের ফ্লোরবোর্ডের নিচে বাক্সটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিল রবিন।

'গান চলার সময় ওদের সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল,' লজ বললেন। 'পরের সেট শুরু করার আগে বলে নেব। মুসা, এখনও তোমার পরিচয় হয়নি ওদের সঙ্গে, না?'

'না,' গায়কদের সঙ্গে কথা বলার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এখন কেমন আড়ষ্ট বোধ করছে মুসা। গানের ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন করলেই আটকে যাবে। সঙ্গীত সম্পর্কে তার ধারণা বড়ই কম।

বুঝতে পারলেন লজ। হাসলেন। 'ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে?'

'না, না!'

গান থামল, শেষবারের মত শ্রোতাদের দোলা দিয়ে বাজনাও বন্ধ হলো। তুমুল করতালি শুরু হলো, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ শিস। হাসিমুখে, অতি বিনয়ে মাথা নুইয়ে তাদের প্রশংসার জবাব দিল গায়ক-বাদকরা। যন্ত্রপাতি রেখে নেমে আসতে লাগল স্টেজ থেকে।

লজের ওপর চোখ পড়তেই 'হে! হে! হে!' করে চিৎকার করে উঠল লম্বা, পাতলা এক তরুণ। সিল্কের মত চুল, একই রকম ফুরফুরে লম্বা দাড়ি। আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে লজের পিঠে ঠাস করে এক থাপ্পড় মারল, আরেক হাতে ধরা দুটো ড্রামস্টিক তাঁর নাকের সামনে এনে বাড়ি মারার ভঙ্গিতে নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখালাম? গরম করে দিয়েছি না?'

'তোমরা তো সব সময়ই গরম, বারডি,' থাপ্পড়টা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে লজের, কোনমতে হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন মুখে। 'আগুনের মত গরম।' মুসাকে বললেন, 'ও বারডি, ড্রামার। ওর কাঠিতে জাদু আছে।' আরও অনেক গায়ক-বাদক এসে ঘিরে ধরেছে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে পরিচয় দিলেন মুসার, 'ও হলো মুসা আমান, আমাদের রবিনের বন্ধু।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

স্টেজের কিনারেই কাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে জটিল একটা সুর তুলে ফেলল বারডি। ছিন্ন, মলিন জিনসের প্যান্টের ওপরে লাফিয়ে উঠল তার ঢোলা সাদা শার্টের ঝুল।

'কেমন বুঝলে?' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল সে, 'ভাল লাগল না? সেভেনটিন এইট টাইম!'

এই সেভেনটি এইট টাইমটা যে কি জিনিস কিছুই বুঝল না মুসা।

'দারুণ হে, তোমার তুলনা হয় না,' মুসার হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে জবাব দিলেন লজ। 'মুসা, ও হলো ববি।' ছোটখাটো এক তরুণীকে চোখের ইশারায় দেখালেন তিনি।

'আমি করি গলাবাজি,' গানের সুরে কথা বলল ববি। পানের আকৃতির মুখ, লম্বা কালো চুল, গায়ের লাল চামড়ার পোশাকটায় হাতা নেই, কাঁধের কাছে প্যাড লাগিয়ে উঁচু করা। মুসা আন্দাজ করল, হাতাদুটো টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। সুন্দর বাহুদুটো দিয়ে লজের কোমর জড়িয়ে ধরে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'গান কেমন লাগল?'

'চমৎকার!'

'শুধু চমৎকার?'

'অসাধারণ!'

হেসে কোমর ছেড়ে দিল ববি।

'সত্যি অসাধারণ!' আবার বললেন লজ।

মিষ্টি করে হাসল ববি। হাত বাড়িয়ে আস্তে রবিনের গালে চড় মেরে তাকে আদর করল।

হাসল রবিন।

অবাকই লাগল মুসার, এই পাগলের আড্ডায় কাজ করে কি ভাবে রবিন! হাসি দেখে তো মনে হচ্ছে না কোন অসুবিধে হয় তার!

মাথা কামানো একটা লোক বলল, 'এই মহাকাশ যাত্রার যুগে মানুষের ব্যবহার আরও আধুনিক হওয়া উচিত।' মুসার মনে হলো, ববির গাল চাপড়ে

আদর করার ভঙ্গিটা ন্যাকামি মনে হয়েছে লোকটার কাছে।

'এ হলো টোগোরফ,' পরিচয় করালেন লজ। 'কীবোর্ডিস্ট। অর্গান মিউজিক থেকে রেইনড্রপ, সব কিছুতে ওস্তাদ। সে নিজেই একটা জীবন্ত অর্কেস্ট্রা।'

মুসাকে অভিবাদন করল টোগোরফ। রোদে চকচক করছে তার কামানো খুলি। ঝিক করে উঠল ডান কানে পরা একটা রিঙ। খেয়াল করল মুসা, অ্যাডভেঞ্চারারদের সবার ডান কানেই একটা করে সোনার রিঙ পরা। পুরানো টাক্সেডো পরেছে টোগোরফ, বেল্টের জায়গায় মোটা করে পাকানো একটা সাদা দড়ি বেঁধেছে। ট্রাউজারের হাঁটুতে বিশাল ছিদ্র। হাসি পেল মুসার। জীবন্ত একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল দাঁড়িয়ে আছে যেন তার সামনে।

'জীবনটা একেবারেই অর্থহীন,' দার্শনিক তত্ত্ব ঝাড়ল টোগোরফ। 'ইন্টারগ্যালাকটিক সিনথেসাইজারে অতি সাধারণ প্রোটোপ্লাজমে পরিণত হচ্ছি আমরা।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। কি বলবে? কথাটার মাথামুণ্ড কিচ্ছু বুঝতে পারেনি।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন লজ, 'ভয় নেই, ওর কথা কেউই বুঝতে পারে না।'

টুইডের স্পোর্ট কোট পরা একটা লোককে টেনে নিয়ে এল ববি। লোকটার পরনে সাদা কর্ডুরয়ের আঁটো প্যান্ট, পায়ে কাউবয় বুট। মুসার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'ও আমাদের জ্যাক।'

এলোমেলো ধুসর চুল জ্যাকের, উঁচু কপাল, ধোঁয়াটে ধূসর চোখ।

'গিটারিস্ট এবং কম্পোজার,' গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন লজ। 'অ্যাডভেঞ্চারারদের বেশির ভাগ গানেরই গীতিকার ও সুরকার সে। ওর সম্পর্কে আর বেশি বলার দরকার আছে?'

'না,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'শনিবার রাতে যে জিতবেই ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'শনিবার রাত?' যেন মুসার কথার প্রতিধ্বনি করল জ্যাক। কুঁচকে গেল ভুরু। ধোঁয়াটে চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'শনিবার রাতে কি হবে?'

'রিচার্ড বিগের প্রতিযোগিতা,' জ্যাককে মনে করিয়ে দিলেন লজ। মুসার দিকে ফিরে বললেন, 'বড় বেশি ভুলো মন। যা শোনে সব ভুলে যায়। মাথার মধ্যে কেবল এক চিন্তা ঘুরপাক খায় সারাক্ষণ—গান আর সুর, সুর আর গান।'

'দি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর,' নাটকীয় ভঙ্গিতে সুর করে বলল ববি।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল যেন জ্যাক, 'পারব না।'

'কি পারবে না?' লজ অবাক।

'শনিবার রাতে থাকতে পারব না। সেদিন আমাদের বিয়ে। কাল রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমরা। শনিবার সন্ধ্যা আটটায় বিয়ে।'

চার

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই, মুসা বাদে, সে এর মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছে না।

তীক্ষ্ণ কিঁচকিঁচ করে উঠল ববি, 'বলো কি!'

'সর্বনাশ করে দিয়েছে!' চিৎকার করে বলল বারডি। রেগে গেছে শুনেই। ভেবেছে কি? ডোবাবে ব্যান্ডটাকে? প্রতিযোগিতায় জিততে পারলে কি পরিমাণ সাড়া পড়ে যাবে ভুলে গেছে?

জ্যাককে বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন আর লজ। তার মাথার ঠিক আছে কিনা প্রশ্ন তুলে বসল ডারবি। বিয়েটা যে একটা অর্থহীন, ফালতু ব্যাপার, এই নিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব ঝাড়ল টোগোরফ। অস্থির ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল ববি। কিন্তু সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো গেল না জ্যাককে। বলে দিল, ওই দিন বিয়ে সে করবেই, প্রাণ যায় যাক।

এতক্ষণে বিস্ফোরিত হলো ববি, চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান!' ঘুসি মেরে বসল জ্যাকের বুকে, 'স্বার্থপর!' ঠাস করে চড় মারল গালে। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে এল।

তার রাগ দেখে কথা বন্ধ হয়ে গেল সকলের।

প্রচণ্ড রাগে হিসহিস করে বলল ববি, 'এইসব স্বার্থপরের দলে আর নেই, আমি যাচ্ছি! গান গাওয়া বন্ধ!'

প্রমাদ গুণলেন লজ। একের পর এক ধাক্কা।

ববিকে যে দলটার প্রয়োজন, এটা মুসার মত বাইরের লোকও বুঝতে পারছে। জ্যাককে যেমন প্রয়োজন, ববিকেও প্রয়োজন।

দ্বিধায় পড়ে গেল জ্যাক। কি বলবে বুঝতে পারছে না।

যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল ববি।

খপ করে তার হাত চেপে ধরলেন লজ, 'ববি, পাগলামি কোরো না!'

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল ববি। তবে গেল না, শোনার জন্যে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়াল। তার রাগত ভঙ্গিই জানিয়ে দিচ্ছে—ঠিক আছে বলো, আমার পছন্দ হলে বিবেচনা করব।

'তোমার গুণ আছে, ববি,' কোমল স্বরে বোঝাতে চাইলেন লজ, 'যেখানে খুশি কাজ পাবে। ইচ্ছে করলেই ঢুকে যেতে পারবে অন্য কোন দলে। কিন্তু চুক্তি বলেও তো একটা কথা আছে। ইচ্ছে করলেই যা খুশি করতে পারো না।'

'সেটা তো জ্যাকের বেলায়ও প্রযোজ্য। তাকে কিছু করতে পারছেন না কেন? শনিবার রাতে বিয়েটা না করলেই কি তার চলছিল না? এতগুলো মানুষকে গাধা বানাতে চাইছে! ভেবেছে কি সে? আপনার যা ইচ্ছে করুন,

আমি আর থাকছি না।'

গটমট করে হাঁটা দিল সে।

'ববি,' ডাক দিল রবিন। দৌড়ে গেল মেয়েটার কাছে। কানে কানে কি বলতেই জোরে মাথা নাড়তে লাগল ববি। তারপর একবার মাথা ঝাঁকাল। কয়েক সেকেন্ড পর আরও দু-বার।

জ্যাকের বুকে খোঁচা মারলেন লজ।

ববির দিকে তাকিয়ে আছে জ্যাক। কেমন বোকা বোকা লাগছে তাকে। ফিরে তাকাল, 'বলুন?'

'তোমার বান্ধবীর নাম কি? যাকে বিয়ে করতে চাও?'

'এলেনা গিলবার্ট।'

'এলেনা!' আবার রাগ চড়ে গেল ববির, চিৎকার করে উঠল, 'ওইটা! ওটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তুমি!'

শান্তকণ্ঠে লজ বললেন, 'আমি ফোন করে কথা বলব তার সঙ্গে। তারিখটা বদলাতে অনুরোধ করব।'

'ভীষণ খেপে যাবে,' সাবধান করল জ্যাক, তবে ভারমুক্ত মনে হলো তাকে।

'গেলে যাক না! ওরকম একটা মেয়েমানুষের পরোয়া করো নাকি তুমি? আমার সঙ্গেই খালি তোমার যত চালাকি, আর কারও সঙ্গে পারো না!' রাগ কিছুতেই যাচ্ছে না ববির। গজগজ করতে থাকল।

ববির কথার জবাব দিল না জ্যাক। গালাগালিটা নীরবে হজম করল। খানিকটা নরম হয়েছে মনে হলো তাকে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। পুরো ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে।

ঘড়ি দেখলেন লজ। 'সময় হয়ে গেছে। পরের সেট দরকার। এসো, যাই।'

সমস্ত গণ্ডগোলের হোতা জ্যাক জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, সুদর্শন মুখের ওপর এসে পড়া কয়েকটা চুল সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই সেটে কোন গান গাইব?'

স্টেজের দিকে এগোনোর সময় তারবি বলে দিল, কোনটা গাইতে হবে।

কীবোর্ডের সামনে বসে টোগোরফ বলল, 'প্যাক্স ভবিস্কাম।' এই ল্যাটিন কথাটার মানে—তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, কিংবা তুমি শান্তিতে থাকো। গম্ভীর কণ্ঠে বাণীটা বর্ষণ করে লজের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

নিচু স্বরে মুসা বলল, 'মাথা কি সব কটারই গরম নাকি?'

হেসে জবাব দিল রবিন, 'যতটা ভাবছ ততটা নয়।'

ওদের কথা শুনে ফেললেন লজ, বললেন, 'জ্যাকের কথা খেপিয়ে দিয়েছে সবাইকে।'

'এখন কিন্তু শান্ত লাগছে তাকে,' মুসা বলল। 'এত তাড়াতাড়ি মেনে

নিল?'

'ওর কথা আর বোলো না,' হাত নাড়লেন লজ। 'কথায় কথায় এনগেজমেন্ট করা ওর একটা বদস্বভাব। কোন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেই হলো। এই নিয়ে ডজনখানেক বার করেছে এই কাণ্ড। এই বিয়েটাও হয় কিনা দেখো।'

'ববিকে কি বলে থামালে?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা; 'আগুনে পানি ঢেলে দিলে মনে হলো?'

'ও কিছু না,' হাসল রবিন। 'জানা থাকলে তুমিও পারতে। ববির সঙ্গেও দু-বার এনগেজমেন্ট করেছে জ্যাক। দুই বারই ভেঙেছে। আসলে বিয়ে করার সাহসই নেই ওর। ববি এখনও ভালবাসে তাকে। তার পাগলামিকে প্রশ্রয় দেয়। ভাবে, এক সময় না এক সময় তাকে বিয়ে করবেই জ্যাক। আমি তাকে সে-কথাই মনে করিয়ে দিয়ে বললাম—যতই বলুক, অন্য কাউকে বিয়ে করবে না জ্যাক, প্রতিযোগিতায় যেতে ভয় পাচ্ছে বলেই এই বিয়ের বাহানা ফেঁদেছে। সে এখনও তোমাকেই ভালবাসে। এবং সেই কথাটা তার ভাল করে বোঝার জন্যে সময় দিতে হবে তোমাকে।'

'তুমি একটা জিনিয়াস,' হা-হা করে হাসল মুসা। 'তুমিও জিনিয়াস, কিশোরও জিনিয়াস, কেবল আমিই গাধা।'

'তোমার কাজে তুমিও জিনিয়াস,' রবিন বলল। 'তুমি যা পারো, আমরা তা পারি না।'

বেজে উঠল জ্যাকের গিটার এক এক করে বাজতে শুরু করল অন্যদের বাদ্যযন্ত্রগুলোও। দেখতে দেখতে জমে গেল মিউজিক। শুরু হলো গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারদের আরেকটা চমৎকার গান। গরম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমেই। একটা সময় মুসার মনে হলো, বাজনায় এত উত্তাপ আর কোন ব্যান্ডই সৃষ্টি করতে পারে না।

রবিনকে বললেন লজ, 'এসো, আমাদের শনিবার রাতের প্রোগ্রামটা করে ফেলি। আমি চাই. রকি বীচের প্রচুর সমর্থক গিয়ে হাজির হোক লস অ্যাঞ্জেলেসে, গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসকে প্রেরণা দিক। অতিরিক্ত সমর্থক দেখলে বিচারকরাও দ্বিধায় পড়ে যাবে। অন্য কারও পক্ষে রায় দিতে হাজারবার চিন্তা করবে। বুদ্ধিটা ভাল করেছি না? রকি বীচে প্রচুর বিজ্ঞাপন করতে হবে, প্রচার করে দিতে হবে খবরটা, পোস্টার লাগিয়ে ভরে ফেলতে হবে; দরকার হলে লস অ্যাঞ্জেলেসে যাতায়াত ভাড়া দেব সমর্থকদের। ভাল লাগুক আর না লাগুক, তাদের যেতে হবে। আজকে সোয়াপ মিটে এই গানের ব্যবস্থাটা যে করেছি, এটাও কিন্তু এক ধরনের প্রচার। বুঝতে পারছ?'

'তা তো পারছি। কিন্তু প্রচারের জন্যে ঘোরাঘুরি লাগে। আমার গাড়িটাই তো বিকল হয়ে পড়ে আছে।'

'আজই সেরে ফেলব,' সমস্যার সমাধান করে দিল মুসা।

'তাহলে তো হয়েই গেল,' লজ বললেন। একগাদা হলুদ রঙের ছাপানো

কাগজ বের করে রবিনের হাতে দিলেন। পোস্টার। 'কাল সকাল থেকেই শুরু করে দাও।' স্টেজের দিকে ফিরলেন। আবার উদ্দাম হয়ে উঠেছে গায়ক-বাদকেরা। প্রশংসার দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন তিনি, 'মাথায় কিছুটা দোষ আছে ওদের, স্বীকার করি, তবে ট্যালেন্টও আছে। ডিনামাইট একেকটা! প্রতিযোগিতায় গেলে হারবে না!'

পুরানো মডেলের টেপ রেকর্ডার মেশিনের যন্ত্রাংশগুলো পড়ে আছে কিশোরের টেবিলে। বিশাল একটা যন্ত্র। বাজছিল না বলে সব টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলেছে সে। পরীক্ষা করার পর বুঝল, কিছুই খারাপ হয়নি মেশিনটার, কেবল ভালমত ধোয়ামোছা আর টিউনিং দরকার।

কাজটা সারতে সময় লাগল, তবে কঠিন হলো না। শেষ করার পর দুর্দান্ত একটা টেপ রেকর্ডারের মালিক হয়ে গেল সে। একেবারে স্টুডিও কোয়ালিটি জিনিস।

'কি করবে এটা দিয়ে?' জানতে চাইল মুসা।

ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর, 'ইচ্ছে করলে ভাল দামে বেচতে পারব।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে, তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে বসে আছে তিনজনে।

বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। হাত নেড়ে বলল, 'আমার কথাটা কি শুনবে এবার, না কি?'

হাতের স্ক্রু-ড্রাইভারটা টেবিলে রেখে দিয়ে রবিনের দিকে মুখ তুলল কিশোর, 'হ্যাঁ, বলো এবার। নকল টেপ পয়সা দিয়ে কেন কিনতে গিয়েছিলে?'

'পয়সা কম হলে কিনব না?'

'চাইবে ভাল জিনিস, দেবে কম পয়সা, তা তো হয় না। খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। একে ঠকা বলতে পারো না।'

'আমি কি কোটিপতি নাকি?' তার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে রেগে গেল রবিন। 'অল্প পয়সায় ভাল জিনিস দিচ্ছে ভাবলাম বলেই তো গেলাম, মূল্যহ্রাস...'

'হ্রাস মূল্যে কেউ কখনও ভাল জিনিস দেয় না। ভালগুলো বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর খুঁতখুঁত থাকে যেগুলোতে, আসল দামে আর নিতে চায় না লোকে, সেগুলোর দামই কমিয়ে দেয়া হয়, এই বোধটুকু থাকা উচিত সবার। মূল্যহ্রাসে কিনতে গেলে খারাপ জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, ধরে নিয়েই যেতে হবে দোকানে। কত কনসেশন পেয়েছ?'

'ছয় ডলারের টেপ দুই ডলারে। একসঙ্গে তিনটে কিনলে আরও এক ডলার কম, মোট পাঁচ ডলার। আমি কিনেছিলাম তিনটা।'

'ক্যাসেটের বাক্সগুলো যে দিয়েছে এই বেশি। ওই দামে ভাল গান আশা করলে কি করে?'

রবিন আবার রেগে উঠতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি হাত তুলল মুসা, 'আগে আসল কথাটা শোনো, তারপর মন্তব্য করো। ওরা টেপ পাইরেটস।'

'মানে?' এই প্রথম সামান্য আগ্রহ দেখা দিল কিশোরের চোখে।

খুলে বলল সব মুসা।

'যে দু-জন আক্রমণ করল ওরাও খদ্দের নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।

'তা ছাড়া আর কি হবে?'

'জানি না। তবে ঠকা খেয়েও মারতে আসতে পারে, তোমাদের মত। ওরাও কি টাকা ফেরত চাইতে এসেছিল?'

'চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগল একজন,' রবিন বলল। 'কিন্তু কিচ্ছু বুঝলাম না। ভাষাটা অচেনা।'

'হুঁ। ডজ ভ্যানটার নম্বর রেখেছ?'

ঢোক গিলল মুসা। হাবা হয়ে গেল রবিন, এই সহজ কথাটা মনে পড়েনি বলে।

'না,' স্বীকার করল দু-জনেই

ওদের এই বোকামিতে হতাশ হয়েই যেন মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। 'সূত্র মিস করলে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে নিয়ে কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে শুরু করল। ভাবছে, মারামারিটা কেন হয়েছে, এটা জানার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে—সাধারণ কোন ব্যাপার, না গুরুতর?

টেপ কিনতে গিয়ে এ ভাবে বোকা বনার কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না রবিন, রাগটা যাচ্ছে না তার। যত ভাবছে আরও রেগে যাচ্ছে। টাকার মায়ায় নয়, এ রকম একটা গাধামি করল বলে। অস্পষ্ট একটা ঘটনা আচমকা যেন আঘাত হানল স্মৃতির পর্দায়—মাথায় বাড়ি খেয়ে পড়ে ছিল সে···ভাসতে দেখেছিল একজন মানুষকে···কি ছিল ওটা? দৃষ্টি বিভ্রম?

লোকগুলোকে কোথায় পাওয়া যাবে, ভাবতে গিয়েই চকিতে মাথায় এল আইডিয়াটা। আরও আগেই আসা উচিত ছিল ভেবে কপাল চাপড়াল।

'কি হলো?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'পাঁচ ডলারের জন্যে পাগল হয়ে যাচ্ছ?'

থাবা দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল শুরু করল রবিন। সোয়াপ মিটের বিজনেস অফিসের নম্বর চাইল অপারেটরের কাছে। পকেট থেকে কলম বের করল, কিন্তু কাগজ পেল না হাতের কাছে, তাই হাতের তালুতেই লিখে নিল নম্বরটা।

আবার ডায়াল করল দ্রুত। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই বলল, 'স্টেজের কাছ থেকে কিছুটা দূরে, ছয় নম্বর সারিতে একটা ক্যাসেটের স্টল দেয়া হয়েছিল। ওটা কাদের? মূল দোকানটার নাম বলতে পারেন?'

চুপ করে ওপাশের কথা শুনল সে। তারপর, 'অনেক ধন্যবাদ' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

কিশোরকে বলল, 'স্টলটা নেয়া হয়েছে হাবিজ উমরাওয়া নামে এক লোকের নামে। থাকে রকি বীচেই, ছয়শো বাষট্টি নম্বর সেইন্ট মার্টিন ড্রাইভে।'

ফোন বুকটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর। আঙুল চালাল সারি সারি নামগুলোর ওপর। 'কই, ডিরেকটরিতে হাবিজ উমরাওয়ার নাম নেই।'

ইনফরমেশনে খোঁজ নিল সে। ওরাও বলতে পারল না।

'নেই, তাহলে ঠিকানা দিল কেন?' হাল ছাড়তে পারল না রবিন।

'দাঁড়াও, কম্পিউটারে চেক করি। ডিস্কে একটা ক্রস-রেফারেন্স সিটি ডিরেকটরি আছে।'

মুসা বলল, 'তোমরা যাও, দেখোগে। আমি রবিনের গাড়িটা সেরে ফেলি।'

একটা গাড়ি মেরামতের ওঅর্কশপও করা হয়েছে ইয়ার্ডের ভেতর। কিশোরের দূর সম্পর্কের খালাত ভাই, গাড়ির জাদুকর বলা হয় যাকে, সেই নিকি পাঞ্চের আগ্রহেই কাজটা করেছে তিন গোয়েন্দা। এতে মুসার আগ্রহও কম নয়। নিকি কাজ করে কাজ করে, হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। একেবারে গায়েব। অনেক দিন আর তার কোন খোঁজ-খবর থাকে না। তারপর যে ভাবে চলে যায়, তেমনি ভাবেই ফিরে আসে আবার। এবার যে গেছে, তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে। তারমানে ফেরার সময় হয়ে গেছে তার, যে কোন দিন ফিরে আসতে পারে।

রবিনের ফোক্সওয়াগেনটা পড়ে আছে ওঅর্কশপের ভেতর। সেদিকে এগোল মুসা।

কিশোর আর রবিন ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।

কম্পিউটার অন করল কিশোর। কীবোর্ডে উড়ে বেড়াতে লাগল তার আঙুল। পর্দায় দ্রুত আসা-যাওয়া করছে নানা রকম তথ্য।

অবশেষে থামল কিশোরের আঙুল, 'এই যে জবাব! কিন্তু পছন্দ হবে না তোমার। ছয়শো ষাট আছে, ছয়শো চৌষট্টি আছে, কিন্তু বাষট্টি নেই।'

বকের মত গলা বাড়িয়ে পর্দার দিকে তাকাল রবিন। 'এর মানে কি?' যেন কম্পিউটারকেই করল প্রশ্নটা।

'খালি প্লট হতে পারে, বাড়িঘর ওঠেনি তাই নম্বরও পড়েনি এখনও।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন, 'আমাদের একমাত্র সূত্রটাও মাঠে মারা যাবে!'

নীরবে হাত ওল্টাল কিশোর। কি বলতে চাইল কিছু বোঝা গেল না।

জেদ চেপে গেল রবিনের। 'আমি ছাড়ব না ওদের। খুঁজে বের করবই। পাঁচটা ডলার কিছু না, কিন্তু যে ভাবে বোকা বানিয়েছে, সহ্য করতে পারছি না। আজ রাতে আবার যাব আমি সোয়াপ মিটে, লজ যেতে বলেছেন। তখন খোঁজ করব ব্যাটাদের।'

পাঁচ

পরদিন সকালে চোখেমুখে গরম লাগতে ঘুম ভেঙে গেল রবিনের। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। হায় হায়, এত বেলা! আজ পোস্টার লাগানোর কথা, লাগাবে কখন! গতরাতে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছে। ক্লান্ত হয়ে ধপাস করে পড়েছিল বিছানায়, আর কিছু মনে নেই।

ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বাজে। কি সর্বনাশ! দুপুরই তো হয়ে গেল! তার ওপর গাড়িটা নেই। এমন একটা রোগ হয়েছে গাড়িটার, মুসাও ধরতে পারছে না। এখন নিকিভাই ভরসা। সে কবে আসবে তার কোন ঠিক নেই। ততদিন বিকল হয়ে পড়ে থাকবে গাড়ি। ধুর, খারাপ হওয়ার আর সময় পেল না! বহুবার দেখেছে রবিন, জরুরী কাজের সময়ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটা বাতিল হয়ে বসে থাকে।

কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে এল সে। দ্রুতহাতে কাপড় পরতে শুরু করল।

শোবার ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামল। নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। বাবা-মা, দু-জনের একজনও নেই। বাইরে গেছেন। বাবা নিশ্চয় অফিসে, আর মা বাজারে কিংবা বান্ধবীর বাড়িতে।

ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল সে। ওপাশ থেকে সাড়া এলে বলল, 'মিস্টার লজ? গুড মর্নিং।' রিসিভারের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'আমার গাড়িটা সারাতে পারেনি এখনও মুসা। একটা গাড়ি লাগে যে?'

'চলে এসো। দেখি গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এদিকে আমার হয়েছে এক বিপদ।'

'বিপদ?'

'হ্যাঁ। চলে এসো, জলদি। এলেই শুনবে।'

হাঁপ ছাড়ল রবিন। লজ খুব ভাল বস। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে পুরানো মলাটের বাক্সটা বিছানার নিচ থেকে টেনে বের করল। খালি ব্যাকপ্যাকটা রয়েছে সব জিনিসের ওপরে। পোস্টারগুলো তাতে ভরতে যেতেই চোখে পড়ল জিনিসটা।

ব্যাকপ্যাকের ভেতরে একটা বাদামী কাগজে মোড়া প্যাকেট। ওটা তার নয়। কৌতূহলী হয়ে খুলল। ভেতরে দুটো সাদা বাক্স। লেবেল লাগানো রয়েছে: AMPEX 1/4-INCH TAPE.

একটা বাক্স খুলল সে। ভেতরে পাওয়া গেল এক রিল টেপ।

অন্য বাক্সটাও দেখল তখন। একই রকমের আরেকটা রিল আছে

এটাতেও। মাঝের প্লাস্টিকের তৈরি গোল চাকাটা, অর্থাৎ হাব--যাতে গোটানো হয়েছে ফিতেগুলো, তার একটাতে সাদা গ্রীজ পেন্সিল দিয়ে নম্বর লেখা রয়েছে, REEL 1, অন্যটাতে REEL 2.

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার বাক্সে এগুলো এল কি করে? জিনিসগুলো কি?

এই সময় মনে পড়ল লজের কথা, অপেক্ষা করবেন তিনি।

রিলগুলো বাক্সে ভরে আবার ব্যাকপ্যাকে রেখে দিল। পোস্টারগুলোও একই ব্যাগে ভরে নিয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে এল নিচে। গ্যারেজ থেকে সাইকেল বের করে রওনা হলো।

প্রথমে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল সে। কিশোরকে পাওয়া গেল তার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে। নাস্তা খাচ্ছে।

রিলের বাক্সগুলো টেবিলে ফেলে দিল রবিন।

'কি···?' মাখন মাখানো রুটির আধখাওয়া টুকরো সহ হাতটা থেমে গেল মাঝপথে।

'দেখো এগুলো, কিছু বোঝো কিনা। কাল সোয়াপ মিটে আমার কাছে ছিল বাক্সটা। এখন ব্যাকপ্যাক খুলতে গিয়ে দেখি কে জানি রেখে দিয়েছে। তুমি দেখো, আমার তাড়া আছে, যাচ্ছি···'

'যাও।' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। রুটির বাকি টুকরোটা মুখে ফেলে দিয়ে বাক্সদুটো টেনে নিল।

ওঅর্কশপ থেকে প্রায় দৌড়ে বেরোল রবিন। রাস্তায় পড়ে দ্রুত প্যাডাল ঘোরাতে লাগল। যত তাড়াতাড়িই চালাক, একবার গাড়ি চালিয়ে অভ্যাস হয়ে গেলে সাইকেল আর ভাল লাগে না, মনে হয় নড়তেই চায় না যেন।

লজের বাড়ি মাইলখানেক দূরে। বাড়ির অর্ধেকটা জুড়ে তাঁর অফিস।

গাছপালা, পথচারী, আর পার্ক করা গাড়িগুলোকে দ্রুতবেগে পাশ কাটাতে থাকল রবিন।

লজের বাড়ি থেকে ব্লকখানেক দূরে থাকতে সাইকেলের পাশে চলে এল একটা নীল ভ্যান। চেনা চেনা লাগল। অন্যমনস্ক না থাকলে ও-রকম গাড়ি কোথায় দেখেছে সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারত সে। কিন্তু এখন কয়েক সেকেন্ড পার করে দিল।

হঠাৎ মনে পড়ল টেপ জালিয়াতদের গাড়িটা ছিল এ রকম।

প্যাসেঞ্জার সীট থেকে মুখ বের করল এক এশিয়ান। চিনে ফেলল রবিন এই লোকটাই তাকে নকল টেপ বিক্রি করেছিল। এখানে কি করছে সে?

চিৎকার করে বলল রবিন, 'এই মিয়া, আমার পাঁচ ডলার ফেরত দাও!'

চমকে গেল লোকটা। ড্রাইভ করছে যে তার দিকে তাকিয়ে 'হাবিজ' বলে চিৎকার করেই মাথা নামিয়ে ফেলল। গাড়ি চালাচ্ছে গালে কাটা দাগওয়ালা লোকটা, দেখতে পেল রবিন। এইবার আর নম্বর প্লেট দেখার কথা ভুলল না সে। দেখার জন্যে পিছাতে গেল, কিন্তু পারল না। গাড়িটা

পাশাপাশি থেকে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল গালকাটা, চেনার চেষ্টা করল, কিংবা কিছু বুঝতে চাইল, তারপর আচমকা গতি বাড়িয়ে দিল গাড়ির। পেছনটা নজরে এল রবিনের। কিন্তু নম্বর প্লেটের লেখা দেখার উপায় নেই, কাদায় মাখামাখি। তীব্র গতিতে একটা মোড়ের কাছে গিয়ে হারিয়ে গেল গাড়িটা।

অবাক লাগল রবিনের। ভাবতে ভাবতে চলল লজের বাড়ির দিকে।

লজের অফিস। দুটো ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছে রবিন আর ফেয়ারি মরটারসন। শিল্পীদের অটোগ্রাফ দেয়া ছবি সাঁটা রয়েছে লজের ডেস্কের পেছনের দেয়ালে। দেয়ালের একপাশে ঘরের এককোণে রাখা একটা পুরানো আমলের পিয়ানো, অন্য কোণে একটা স্টেরিও সেট। তার মাঝখানের ফাঁকটুকুতে খাঁচায় বন্ধ বাঘের মত পায়চারি করছেন লজ। অস্থির ভঙ্গিতে আঙুল চালাচ্ছেন চুলে, হাসিখুশি মুখটা থেকে হাসি মুছে গিয়ে সেখানে ঠাঁই নিয়েছে উদ্বেগ।

'এই হলো ব্যাপার, রবিন,' অবশেষে বললেন তিনি। 'আমাকে ওমাহায় যেতেই হবে। আজকের ফ্লাইটেই চলে যাব। কয়েক দিন থাকব। ডাক্তার বলেছে, অপারেশনটা জটিল কিছু নয়, তবু কাউকে না কাউকে তো থাকতেই হবে রোগীর পাশে। মায়ের কাছে ছেলের চেয়ে বড় আর কে আছে, বলো?' থেমে গিয়ে ডেস্কের ওপর দিয়ে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দিলেন লজ। হাসার চেষ্টা করলেন। 'অফিসটা তোমাদেরই সামলাতে হবে। আমি জানি, পারবে তোমরা।'

'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'শনিবারের আগেই চলে আসব আমি। ওদের খুনখারাপিটা কেবল ততদিন ঠেকিয়ে রাখো, তাহলেই হবে।'

লজের কথার ভঙ্গিতে হাসল রবিন, 'ঠিক আছে।'

ফেয়ারি বলল, 'ঠেকানো কতখানি যাবে বুঝতে পারছি না। ববি আর জ্যাকটাকে তো মাঝে মাঝে বদ্ধ উন্মাদ মনে হয় আমার। খেপা।' ফেয়ারি মানে পরী, পরীর মত অত সুন্দরী না হলেও যথেষ্ট সুন্দরীই বলতে হবে মেয়েটাকে। লম্বা শরীর, সোনালি চুল। কলেজে পড়ে। রবিনের মতই পার্ট-টাইম চাকরি করে, লজের সেক্রেটারি। 'মারামারি না করে একসঙ্গে শনিবার পর্যন্ত থাকতে পারবে ওরা?'

'জানি না। তবে রোজ একবার করে যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হবে মুখে মুখে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

হাসল তিনজনেই।

অফিসের বেল বাজল।

দরজা খোলার জন্যে উঠে গেল ফেয়ারি। লজকে জিজ্ঞেস করল, 'কেউ আসার কথা আছে আপনার কাছে?'

'না। দাঁড়াও, আগে আমি বেরিয়ে যাই!' ডেস্কের নিচ থেকে ধুলো পড়া একটা ব্রীফকেস টেনে বের করলেন লজ। তার মধ্যে জরুরী কাগজপত্র ঠেসে ভরতে লাগলেন।

রবিনও উঠে দাঁড়াল।

গাড়ির চাবি বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন লজ। 'নাও, তোমার কাজ হয়ে গেলে ফেয়ারিকে দিয়ে দিও। গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারদের নিয়ে বেশি ভাবতে যেয়ো না। আরও কাজ আছে।'

'ঠেকায় না পড়লে কে ভাবতে যায়।'

'ওরা ভালই থাকবে। পাগলও নিজের ভালটা বোঝে।'

'দেখা যাক।'

ডেস্ক ঘুরে এ পাশে চলে এলেন লজ। 'যাই তাহলে।'

দরজা খুলে গেল। ফেয়ারি জানাল, 'মিস্টার আইজাক ডেভিড কিউরান দেখা করতে চান।'

'কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার, লজ,' বাইরের অফিস থেকে শোনা গেল একটা নাকে-লাগা কণ্ঠ, ফেয়ারির পেছনে। 'আমি জানি আপনার সময়ের অনেক দাম। গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসের ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেয়ারি। লজের অনুমতি না পেলে যেন কিছুতেই ঢুকতে দেবে না আগন্তুককে।

চোখ ঘুরিয়ে কপালে চাপড় মারলেন লজ, নিচু স্বরে বললেন, 'মরার আর সময় পেল না!'

খবরের কাগজের লোক আইজাক ডেভিড কিউরান। সমালোচনা লেখে। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় সঙ্গীতের ওপর লেখার হাত তার মত আর কারও নেই। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা বড় কাগজে হপ্তায় দু-বার তার লেখা ছাপা হয়। অনেকেই তার লেখার ভক্ত। যথেষ্ট ক্ষমতা।

এই লোককে চটানো উচিত হবে না। মনস্থির করে নিলেন লজ। ডাকলেন, 'আসুন। আপনি এসেছেন, খুশি হয়েছি। ফেইরি, কফি।'

সরে পথ করে দিল ফেইরি। জায়গার অভাবে তার প্রায় গা ঘেঁষে ঘরে ঢুকল কিউরান খাটো, গোলগাল একজন মানুষ, রবিনের মনে হলো অস্বাভাবিক আকারের একটা বেঙ।

'মিস্টার কিউরান,' পরিচয় করিয়ে দিলেন লজ, 'ও রবিন মিলফোর্ড।'

'ভাল।' কিউরানের বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়, রবিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। কুতকুতে নীল চোখ, কানের কাছে ধূসর হয়ে এসেছে চুল, ভুরভুর করে দামী পারফিউমের গন্ধ ছড়াচ্ছে। 'অ্যাডভেঞ্চারারদের কেউ?'

'রবিন আমার অ্যাসিসটেন্ট।'

হাত বাড়িয়ে দিল রবিন।

অ্যাডভেঞ্চারারদের কেউ নয় শুনে আগ্রহ হারিয়েছে কিউরান। হাত

বাড়িয়েও ফিরিয়ে নিতে গেল, আবার কি ভেবে বাড়িয়ে রাখল। তার আঙুলগুলো ধরে আলতো চাপ দিতে দিল রবিনকে। তারপর তাড়াহুড়ো করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে ফেলল তার সিল্কের স্যুটের পকেটে।

লোকটার আচরণে রাগ লাগল রবিনের, তবু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে বলল, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, স্যার।'

'আমিও,' কোনমতে দায়সারা জবাব দিল কিউরান। লজের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারস আমার সবচেয়ে প্রিয়, এ কথা ঘোষণা করে যদি পত্রিকায় লিখে দিই—আমার ধারণা ওরাই রিচার্ড বিগ কনটেস্ট জিতবে, কেমন হয়?'

ঝুলে পড়ল লজের চোয়াল। বন্ধ করে ফেললেন আবার। 'খুব ভাল ধারণা। প্রশংসা করতে হচ্ছে।'

ক্যানভাসের চেয়ার দুটোকে ভালমত দেখে নিল কিউরান, পছন্দ হলো না, কোনটাতে বসবে ঠিক করতে পারছে না। ওগুলোতে বসলে যেন দামী প্যান্টটা নষ্ট হবে। তবু বসতে একটাতে হবেই, সে-জন্যে বসে পড়ল।

উত্তেজনায় টকটকে লাল হয়ে গেছে লজের মুখ। ফিরে গিয়ে আবার ডেস্কের ওপাশে বসলেন। কেটে পড়ার সুযোগ পেয়ে আর একটা মুহূর্তও দেরি করল না রবিন, যেন পিছলে বেরিয়ে এল বাইরের অফিসে। পেছনে আস্তে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

এই অফিসের দেয়ালে সাঁটানো রয়েছে কয়েকটা বুকিং চার্ট। লজের সঙ্গে চুক্তিতে কাজ করে এমন কিছু গ্রুপের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিও আছে। ফেয়ারির দিকে তাকাল রবিন। ভীষণ রেগেছে মেয়েটা। চিনামাটির দুটো মগ ঠকাস করে টেবিলে আছাড় দিয়ে রেখে ফাইলিং কেবিনেটের ওপর রাখা কফির পটটা নামিয়ে আনল।

রাগে জ্বলছে তার চোখ। 'আমাকে চিমটি কেটেছে বুড়ো বদমাশটা, বিশ্বাস করতে পারো! আমার পেছনে যখন দাঁড়িয়েছিল, তখন। গায়ে কি দুর্গন্ধ! কেবল লজের কাজে এসেছে বলে কিছু বললাম না, নইলে স্যান্ডেল দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করে দিতাম!'

'লোকটাকে আমারও ভাল লাগেনি,' রবিন বলল। 'কোলা ব্যাঙ!'

চিনি আর চামচ ট্রে-তে ফেলে দিয়ে ফেয়ারি বলল, 'নিজের কফি নিজেই বানিয়ে নিক, আমি পারব না। দিলাম যে এইই কত না। অসহ্য লোক!'

ফেয়ারির রাগ দেখে হেসে ফেলল রবিন। শুধরে দিয়ে বলল, 'লোক না, অসহ্য বেঙ।'

লজের কালো চকচকে গাড়িটা নিয়ে মেইন স্ট্রীট ধরে চলল রবিন। লম্বা, রাজকীয় গাড়িটার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে লোকে। তাকানোর মতই জিনিস। ১৯৬৯ সালে তৈরি ক্যাডিলাক, ফ্লিটউডের বডি। বছর দশেক আগে নিলামে কিনেছিলেন লজ। কিছু পরিবর্তন করে নিয়ে একটা দুর্দান্ত জিনিস

বানিয়ে ফেলেছেন। নরম চামড়ার গদি, অন্য যে সব জায়গায় সাধারণত রেক্সিন ব্যাবহার করা হয়, সেখানেও চামড়া। ড্যাশবোর্ড তৈরি হয়েছে কালো কুচকুচে ওয়ালনাট কাঠ দিয়ে। ঝরঝরে ফোক্সওয়াগেন চালানোর পর এই জিনিস হাতে পড়লে মহারাজা মনে হবে নিজেকে। রবিনের তা-ই হচ্ছে।

একটা পার্কিং লনে এনে গাড়ি রাখল সে। ব্যাকপ্যাক হাতে নিয়ে নামল। মেইন স্ট্রীটের ধারে এখানে সারি সারি খাবারের দোকান, ফাস্ট ফুড। টীন এজার ছেলেমেয়ে আর কলেজ ছাত্রদের ভিড়। গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত জোগাড়ের অতি উত্তম জায়গা এটা।

রাস্তার দুই ধারে এ মাথা ও-মাথায় ঘুরতে থাকল রবিন, দোকানদারদের অনুমতি নিয়ে পোস্টার সাঁটিয়ে দিতে লাগল ডিসপ্লে উইন্ডো অথবা বুলেটিন বোর্ডে।

ঘণ্টাখানেক পর একটা ডোনাট শপের সামনে এসে দাঁড়াল সে। পোস্টার লাগিয়ে ভেতরে ঢুকে লাইনে দাঁড়াল, আভেন থেকে নামানো গরম গরম বাটার-মিল্ক ডোনাট কেনার জন্যে।

একহাতে ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে, আরেক হাতে ডোনাট নিয়ে কামড় বসাতে বসাতে গ্র্যান্ড অ্যাভিনিউ পেরোল সে। সেখানে পোস্টার সাঁটাবে বইয়ের দোকান আর কফিশপগুলোতে। ডোনাট শেষ করে চেটেপুটে আঙুল পরিষ্কার করল।

ইঁট বিছানো একটা গলি ধরে বিশ কদম এগিয়েছে, এই সময় কানে এল খসখস শব্দ। দ্বিধা করল, তারপর ফিরে তাকাল।

হঠাৎ করেই মোটা কালো একটা কাপড় এসে পড়ল তার মাথায়। নাক-চোখ ঢেকে ফেলা হলো ওটা দিয়ে।

হাত থেকে কেড়ে নেয়া হলো ব্যাকপ্যাক। ইস্পাত কঠিন আঙুল চেপে ধরল তার হাত, মুচড়ে নিয়ে গেল পিঠের কাছে।

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, নড়তে পারছে না।

ছয়

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। চোখের সামনে কালো অন্ধকার। কাপড়ে কান ঢাকা থাকায় রাস্তার শব্দও শুনতে পাচ্ছে না ঠিকমত, কেমন চাপা অদ্ভুত সব আওয়াজ। যে তাকে ধরে আছে সে কিছু বলল না তাকে, কিছু করারও যেন ইচ্ছে নেই।

'কে আপনি?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন, কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। জবাবে আবার খসখস শব্দ। এতক্ষণে খেয়াল করল, তার পা মুক্ত রয়েছে, এবং তাকে ধরে রাখা হয়েছে পেছন দিক থেকে।

প্র্যাকটিস করে করে ভালই রপ্ত হয়ে গেছে কারাতের অনেক কৌশল। আচমকা সামনে ঝুঁকে গেল সে। কারাতের উশিরো-কেকোমি কায়দায় পেছনে ছুঁড়ে দিল পা।

মাংসে গিয়ে লাগল লাথি। গুঙিয়ে উঠল লোকটা।

ঢিল হয়ে গেল ইস্পাত কঠিন আঙুল, উপুড় হয়ে পড়ে গেল রবিন। পেছনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। কারাতকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল সে।

মাথার কালো কাপড় টেনে, ছিঁড়ে খুলে ফেলল। কিন্তু গলিটা শূন্য, একজন মানুষও নেই। ক'-জোড়া পায়ের শব্দ শুনেছিল মনে করার চেষ্টা করল—একজোড়া, না দুই জোড়া?

ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল। জিপার খোলা। মাটিতে পড়ে আছে অনেকগুলো পোস্টার। ব্যাগটা খোলা হয়েছে, ভেতেরের জিনিস বের করে ছড়িয়ে ফেলেছে।

এই পোস্টার দেখার শখ হয়েছিল কার? এ ভাবে মরিয়া হয়ে উঠল কেন? নাকি অন্য কিছু খুঁজেছে ব্যাগে? টেপের রিল দুটো?

দুপুর আড়াইটায় সাইকেল চালিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল রবিন। গাড়িটা গ্যারেজে রেখে চাবিটা ফেয়ারিকে দিয়ে আসার সময় গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসদের খবর জেনে এসেছে, শান্তই আছে ওরা। এখানে এসেছে তার ওপর যে হামলা হয়েছিল এ কথা কিশোরকে জানাতে।

ওঅর্কশপের দিকে এগোতে গিয়ে আরেকটু হলেই সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে ভেসে আসছে রক অ্যান্ড রোলের চমৎকার, স্পষ্ট মিউজিক।

ওঅর্কশপে ঢুকে দেখল, টেবিলের সামনে দুটো চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে মুসা আর কিশোর, দুই হাত মাথার পেছনে, আরাম করে বাজনা শুনছে। তালে তালে পা নাচাচ্ছে। টেবিলে বড় বড় দুটো প্লেট। তাতে খাবারের টুকরো-টাকরা দেখেই অনুমান করে ফেলল কি খেয়েছে দু-জনে, নিশ্চয় মেরিচাচীর তৈরি ফ্রুটকেকের অনেকখানি সাবাড় করে দিয়েছে।

'ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলস না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল মুসা।

কিশোর জবাব দিল না। রক মিউজিক ভাল লাগে না তার, কিন্তু এখন যেন অন্য জগতে চলে গেছে। চোখ বোজা।

সাইকেলটা রেখে এসে একটা টুলে বসল রবিন। মিউজিক বাজছে গতকাল যে যন্ত্র ঠিক করেছিল কিশোর, সেটাতে। সামনে ঝুঁকল টেপটা দেখার জন্যে। অবাক হয়ে গেল। সকালে যে দুটো টেপ পেয়েছিল ব্যাকপ্যাকের মধ্যে, তারই একটা।

'অ্যাই, শোনো…'

বলতে গিয়ে মুসার কাছে আবার বাধা পেল রবিন, একই ভঙ্গিতে ঠোঁটে

আঙুল তুলে শব্দ করল সহকারী গোয়েন্দা, 'শ্‌শ্‌!'

কিছুই না বুঝে মাথা ঝাঁকাল রবিন। সে-ও চোখ মুদল। তালে তালে পা ঠুকতে ঠুকতে আস্তে আস্তে সঙ্গীতে ডুবে গেল। প্রশ্ন করার কথা, কিংবা নিজের কাহিনী বলার কথা ভুলে গেল। মুসা কিংবা কিশোরের চেয়ে অনেক বেশি সঙ্গীত-প্রেমিক সে।

রিলটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না।

তারপর রবিন বলল, 'যন্ত্রটা তাহলে কাজে লেগে গেল।'

হাসল কিশোর। 'আশ্চর্য, তাই না? এত তাড়াতাড়ি লেগে যাবে কল্পনা করিনি। জিনিসটা বড়ই ভাল। হাই কোয়ালিটি। টেকনিক্যাল কিছু কিছু ত্রুটি অবশ্যই আছে, পুরানো মডেল হওয়ার কারণে…'

'ও-সব আলোচনা এখন থাক, কিশোর,' হাত তুলে বাধা দিল মুসা। এক্ষুণি কিশোরকে না ঠেকালে অন্তত বিশ মিনিটের একটা কট্টর লেকচার শুনতে হবে ইলেকট্রনিকস সম্পর্কে। 'আসল কথা বলি। রবিন, রিলগুলো কোথায় পেয়েছিলে?'

কি করে বাক্সগুলো পেয়েছে ব্যাকপ্যাকের মধ্যে, খুলে বলল রবিন।

'কে রাখল?' অবাক হয়ে প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল মুসা।

'আমারও সেটাই প্রশ্ন। আজ সকালে লজের ওখানে যাওয়ার সময় কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল জানো?' নীল ভ্যানটার কথা বলল রবিন। 'গালকাটা লোকটার নামই মনে হয় হাবিজ উমরাওয়া। বেঁটে পাইরেটটাকে তাকে ওই নামেই ডাকতে শুনেছি।'

'আজকে…'

কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন, বলল, 'না, আজও নম্বর রাখতে পারিনি। প্লেটটা কাদায় ঢাকা ছিল।'

'এটা বেআইনী।'

'আইনের কাজ কোনটা করেছে শুনি?' ফোঁস করে উঠল মুসা, 'টেপ নকল করা, নকল জিনিস বিক্রি, রেঞ্চ দিয়ে পেটে বাড়ি মারা, কোনটা আইন সঙ্গত?'

'আরও একটা বেআইনী কাজ করেছে আজ,' রবিন বলল। রাস্তায় কি করে তার মাথায় কালো কাপড় চেপে ধরেছিল, জানাল সে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। আনমনে বলল, 'উদ্ভট কিছু ঘটনা, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে একটার সঙ্গে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল কঠিন শব্দ ব্যবহার আর দুর্বোধ্য করে কথা বলা; মনে মনে প্রমাদ গুণল মুসা। গ্রীক ভাষা শুরু হতে দেরি নেই! বলল, 'সোয়াপ মিটের মারামারির সঙ্গে এর নিশ্চয় সম্পর্ক আছে।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' চুলে ঘনঘন আঙুল চালাচ্ছে রবিন। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, মাথায় আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে আছে সে, একটা লোক ভাসছে চোখের সামনে, হাতে মলাটের বাক্স…

মুসা আর কিশোর দু-জনেই তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি দেখেছি, বেঁটে পাইরেটটা বাতাসে ভাসছে, তারপর বসে পড়ল আমার বাক্সটার কাছে। মনে হলো, চুরি করবে বুঝি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কোন কিছু ভরে রাখার জন্যে ওটা হাতে নিয়েছিল সে।'

'হুঁম!' মাথা দোলাল কিশোর। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখ। 'ঘটনাটা কি ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করা যাক। চারজন লোক সোয়াপ মিটে মারামারি করেছে—কিসের জন্যে? এই রিলগুলোর জন্যে। একজোড়ার কাছে ছিল এ দুটো, অন্য জোড়া এগুলো আদায় করতে চেয়েছে ওদের কাছ থেকে। তুমি বেঁটে পাইরেটটাকে তোমার বাক্সের কাছে বসতে দেখেছ, তারমানে রিলগুলো তার কাছে, অর্থাৎ পাইরেটদের কাছে ছিল। পরে যারা হামলা করেছে, তারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।'

'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু আজ সকালে আমার সাইকেলের পাশে চলে এল কি করে ভ্যানটা? কাকতালীয় মনে হচ্ছে না?'

'না, হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'খোঁজ করে কাউকে বের করে ফেলাটা কঠিন কিছু না। হরদম সেটা করছি আমরা। টেপ ফেরত দেয়ার সময় লজ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। তাঁকে চিনে ফেলতে পারে ওরা। তারপর তোমার ঠিকানা বের করাটা সহজ।'

'তা পারে।'

'বেশ,' আগের কথা টেনে আনল কিশোর, 'ধরা যাক, বেঁটে পাইরেটটা রিলগুলো ব্যাকপ্যাকে লুকিয়ে ফেলেছিল, যাতে হামলাকারীরা সেগুলো না নিতে পারে।' উঠে দাঁড়াল সে, পায়চারি শুরু করল। 'হয়তো ওই সময়টায় হেরে যাচ্ছিল পাইরেটরা। ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তোমার বাক্সটাকে পাশের দোকানের জিনিস মনে করেছিল বেঁটে লোকটা।'

'হতে পারে,' মেনে নিল রবিন।

'পরে রিলগুলোর জন্যে ফিরে এল সে। দোকানদারকে বাক্সটার কথা জিজ্ঞেস করল। ওরা পড়ল আকাশ থেকে। তখন তোমার কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল, বাক্সের কাছে পড়ে আছ তুমি, মাথায় ব্যথা পেয়ে, তোমার সঙ্গে ছিলেন বার্টলেট লজ, গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারের নামও হয়তো বলতে শুনেছে তোমাদেরকে। সুতরাং বিজনেস অফিসে চলে গেল লোকটা, লজের নাম বলল, তাঁর ঠিকানা জেনে নিল। আজ সকালে ভ্যান নিয়ে সেখানে গিয়েছিল সে আর তার লম্বা দোস্ত···'

'আর সে-সময় রবিন সাইকেল নিয়ে উড়ে যাচ্ছে লজের অফিসে!' মুসা বলল। 'পথে দেখা।' সুর করে গেয়ে উঠল একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'দু-জনে দেখা হলো···' কিশোরের কাছ থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট নিয়ে শোনে সে।

চুপ করে রইল রবিন।

বলতে থাকল কিশোর, 'লজের অফিসে দেখেছে লোকগুলো। বাইরে

থেকে। নজর রেখেছে। বেরোতে দেখেছে তোমাকে। গাড়ি নিয়ে যেই বেরোলে, পিছু নিল তোমার।'

'ওদের জানা ছিল, রিলগুলো কোথায় রেখেছে,' কিশোর থামতেই রবিন বলল। 'ব্যাকপ্যাকটা চিনতে পারল বেঁটে পাইরেট।'

'এবং গলির মধ্যে সুযোগ পেয়ে কেড়ে নিতে চাইল,' কথা শেষ করে, সন্তুষ্ট হয়ে এসে আবার চেয়ারে বসল কিশোর। হাত দুটো আড়াআড়ি রাখল বুকের ওপর। 'ঘটনাগুলো আর বিচ্ছিন্ন নেই, যোগসূত্র বেরিয়ে গেল।'

'অনুমান ভুল মনে হচ্ছে না,' রবিন বলল।

'ঠিকই লাগছে,' মুসা বলল।

নাক কুঁচকাল কিশোর, 'অবশ্যই ঠিক। আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না।'

টেবিলে রাখা রিল দুটোর দিকে তাকাল তিনজনে।

'তারমানে এগুলো খুব গরম জিনিস,' বলল রবিন। 'তো, কি জানতে পারলাম?'

'এগুলো স্টুডিও কোয়ালিটি,' জবাব দিল কিশোর। 'এই টেপ রেকর্ডারটা ফিফটিন আই-পি-এস মেশিন। আই-পি-এস মানে হলো ইঞ্চেস পার সেকেন্ড। সাধারণ টেপ রেকর্ডারগুলো এর অর্ধেক হয়, সাড়ে সাত আই-পি-এস। রিলগুলো যেহেতু এটাতে বাজল, তার অর্থ রেকর্ড করা হয়েছে ফিফটিন দিয়ে।'

'তাতে সুবিধেটা কি?' জানতে চাইল মুসা।

'রেকর্ডিং হেডের ওপর দিয়ে যত দ্রুত পার হয়ে যাবে ফিতে তত ভাল রেকর্ডিং হবে। আসলের কাছাকাছি থেকে যাবে সাউন্ড কোয়ালিটি। রেকর্ডিং ভাল হলে প্লে-ও ভাল হবে। উঁচুমাত্রার টেপ স্পীড হাইয়েস্ট সাউন্ড ফ্রিকোয়্যান্সির জন্যে জায়গা বের করে দেয়। তা ছাড়া এই টেপগুলো ক্যাসেটের ফিতের চেয়ে চওড়া, সিকি ইঞ্চি, এটা আরেকটা বিরাট সুবিধে...'

কিশোরকে থামানোর জন্যে বলল রবিন, 'বুঝলাম এগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি। কিন্তু এর জন্যে লড়াই বাধাল কেন লোকগুলো?'

একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। জবাবটা কারও জানা নেই।

অবশেষে রবিন বলল, 'যে মিউজিকটা শুনলাম, ওটা ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলস, আমি শিওর।'

'কোন অ্যালবাম?' মুসার প্রশ্ন।

'জানি না। গানটা চিনতে পারিনি।'

'অন্য রিলটাও শোনা যাক,' প্রস্তাব দিল কিশোর। 'সময় হিসেব করে যা বুঝলাম, দুটো এক এল-পিতে ধরে যাবে। তারমানে দুটো টেপে একসেট।'

'খাইছে, দারুণ হয় তাহলে!' মুসা বলল। 'একটাতেই সারাদিন চালিয়ে নিতে পারব।'

দ্বিতীয় রিলটা মেশিনে পরাল কিশোর। প্লে বাটন টিপে দিল।

রিলটা শেষ হওয়ার পর আবার প্রথমটা পরাল, শুরু থেকে সবটা রবিনের শোনার জন্যে। বিশেষজ্ঞের মতামত দরকার।

শুনে বলল রবিন, 'ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলসই। কিন্তু গানগুলো একটাও চিনতে পারলাম না। এগুলো হয় অতিরিক্ত পুরানো, নয়তো একেবারে নতুন।'

'আমিও কোনটাই চিনলাম না,' মুসা বলল। 'কিশোর, তুমি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'তোমরাই যখন পারলে না, আমি আর পারি কি করে?'

এদিক এদিক দৃষ্টি ঘুরতে লাগল রবিনের। স্থির হলো তার ফোক্স ওয়াগেনের ওপর। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'হলো না, না?'

'না, রোগটা ধরতে পারছি না।'

'এমন কি হলো যে তুমিও বুঝতে পারছ না!'

'না পারলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এখনও বড় ওস্তাদ হতে পারিনি। মনে হচ্ছে জটিল কোন গোলমাল। আমি ফেল। এটা সারাতে এখন নিকিভাইয়ের হাত দরকার।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'নিকিভাইয়ের কোন খবর আছে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সাইকেলটার দিকে তাকাল রবিন। গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ সাইকেল ধরলে কি আর ভাল লাগে?

তার মনের কথাটা পড়তে পারল মুসা, বলল, 'চলো, আমার গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'চলো,' অনেক কষ্টে যেন শব্দটা উচ্চারণ করল রবিন।

১৯৬৭ মডেলের হলুদ রঙের শেভি বেল এয়ার গাড়ির ট্রাংকে রবিনের সাইকেলটা তুলে নিল মুসা। নতুন কেসটা নিয়ে কিশোরকে ভাবার সুযোগ দিয়ে রওনা হয়ে গেল বাড়ির উদ্দেশে। প্রথমে যাবে রবিনদের বাড়িতে।

'ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলসরা খুব হট গ্রুপ, না?' শান্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল মুসা। যানবাহনের ভিড় নেই।

'হ্যাঁ। ওদের অ্যালবামগুলো বড় সাংঘাতিক, হিট হবেই। গায়কদের গলা ভাল, জোরাল মিউজিক।'

'হুঁম!' চুপ হয়ে গেল মুসা। ইঞ্জিনের ব্যাপারে রবিন যেমন আনাড়ি, গান আর মিউজিক সম্পর্কে মুসাও তেমনি অজ্ঞ।

রবিনদের ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল সে।

'নামো,' ডাকল রবিন। 'খিদে পেয়েছে নিশ্চয়, খেয়ে যাও। আমার পেট জ্বলছে। সেই যে কখন একটা ডোনাট খেয়েছি, ব্যস।'

গুড়গুড় করে উঠল মুসার পাকস্থলী। 'ভাল কথা মনে করেছ।'

রান্নাঘরে ঢুকল দু-জনে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। ফ্রিজ থেকে

খাবার বের করে টেবিলে সাজাল রবিন। তাকে সাহায্য করল মুসা। খেতে বসল।

'আন্টি নেই?' জানতে চাইল মুসা।

'না। বাড়ি একেবারে খালি।' বিরাট এক স্যান্ডউইচে কামড় বসাল রবিন।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মুসা, 'খাইছে! দেখো!'

মুসার দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালার দিকে ফিরল রবিন।

বাইরে, জানালার ওপর দিক থেকে দুটো বড় বড় পা নেমে আসছে দড়ি বেয়ে। আস্তে আস্তে দেখা দিল শরীরের নিচের অংশ।

একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

ততক্ষণে মাটিতে নেমে পড়েছে সোনালি চুলওয়ালা লোকটা।

'সোয়াপ মিটে দেখেছি না আপনাকে!' চিৎকার করে বলল রবিন।

তার কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'ওগুলো কোথায়?'

'কোনগুলো?' মুসার প্রশ্ন।

'টেপ!' ধমকে উঠল লোকটা, 'ভাল চাও তো দিয়ে দাও! নইলে...'

সাত

টেবিলে রাখা টেপ দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। তার মন বলছে, রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ও দুটোর মধ্যেই। জবাবটা কি এখনও বুঝতে পারেনি।

আরেক বার সোয়াপ মিটে মারামারি থেকে গলির মধ্যে রবিনের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটা গোড়া থেকে ভাবল।

ডজ ভ্যানের লোকগুলোকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে, মনে হলো তার। সোয়াপ মিটে স্টল নেয়ার জন্যে যে ঠিকানা দিয়েছে ওরা, ওটার অস্তিত্ব নেই, বানানো। রকি বীচে শত শত নীল ডজ ভ্যান আছে। লাইসেন্স নম্বর না জেনে খুঁজতে বেরোনো অন্ধকারে অদেখা লক্ষ্যের দিকে গুলি ছোঁড়ার সামিল। কোন দেশী ওরা, তা-ও জানে না। শুধু এশিয়ান দিয়ে কাজ চলবে না। ভিয়েতনামি থেকে মঙ্গোলিয়ান—সবাইকে এশিয়ান ধরা হয়।

নিচের ঠোঁট ধরে জোরে একবার টান মারল সে।

টেপ দুটোর দিকে তাকাল আরেকবার। গোল করে গুটানো ফিতেগুলোর একেকটা চাকতির ব্যাস দশ ইঞ্চি মত হবে। আসলেই কি সব কিছুর মূলে এগুলো? ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেল গ্রুপেরই গাওয়া গানের রেকর্ড? রবিন যখন বলেছে, তাই হবে। গানের কোন তথ্যের ব্যাপারে তার ওপর ভরসা করা যায়।

ট্রেলারের ভেতর হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। কম্পিউটারের সামনে বসে DataServe-কে কল করল। এটা একটা ইনফরমেশন সার্ভিস, মাসে মাসে অল্প কিছু টাকা করে এদেরকে ফী দিতে হয়, ব্যবহার করার জন্যে।

কীবোর্ড দিয়ে টাইপ করল সে: MUSIC INDUSTRY.

পর্দায় সেটা আসার অপেক্ষা করল। তারপর আবার টাইপ করল: WILD ANGELS.

জ্বলন্ত কয়লা রঙের লেখায় ভরে যেতে লাগল গাঢ় অন্ধকার পর্দা। দলের সদস্যদের নাম, জন্ম তারিখ, যন্ত্রপাতি, ম্যানেজমেন্ট, কোথায় কোথায় ট্যুর করেছে, প্রথম রেকর্ড করা অ্যালবাম—কত বছর আগে করেছিল, হিট অ্যালবাম, কয়টা পুরস্কার পেয়েছে, কোন কোম্পানি তাদের রেকর্ড বের করেছে, সব।

হাসল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের অনেক বড় আর সম্ভ্রান্ত একটা কোম্পানির সঙ্গে দলটাকে জড়িত দেখে। কোম্পানিটার নাম, দি মিউজিশিয়ানস লিমিটেড। কোম্পানির প্রেসিডেন্টের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে নিল সে।

তারপর রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

•

সরু হয়ে এল সোনালিচুলো লোকটার চোখের পাতা। শীতল, কঠিন চেহারা, ঘোলাটে চোখ, চোখের পাতায় পাপড়ি নেই। গাঢ় রঙের জাম্পস্যুট পরনে, হাতে দস্তানা, সামান্য কুঁজো হয়ে এগোল আক্রমণের ভঙ্গিতে। বড় বড় পা দুটো ফাঁক করা।

'টেপগুলোর জন্যে এত অস্থির হয়েছেন কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'তার মানে পেয়েছ ওগুলো!'

'না পেলেও এ প্রশ্নটা করা স্বাভাবিক,' রবিন বলল। 'আপনি হলেও করতেন।'

'দেখো, ছেলে,' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা, থাবা মেরে ধরার চেষ্টা করল রবিনকে, 'আমার সঙ্গে বেশি চালাকি কোরো না!'

আক্রমণ ঠেকাতে তৈরি হয়ে গেল মুসা। এই লোক সহজে ছাড়বে না।

রবিনকে ধরে ফেলেছে লোকটা।

চিৎকার করে রবিন বলল, 'ছাড়ুন!' একঝটকায় ছাড়িয়ে নিল হাত। 'বুদ্ধি নেই আপনার? থাকলে বোঝা উচিত ছিল রাস্তাতেই নীল ভ্যানের সেই লোকগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।'

'আবারও চালাকির কথা...' বলেই লাফ দিয়ে এগোল রবিনকে ধরার জন্যে।

আর সহ্য করল না মুসা। সামনে এগিয়ে লোকটার শরীরের মাঝামাঝি ঘুসি মেরে বসল, কারাতের প্রচণ্ড শক্তিশালী টেটি-জুকি।

কিন্তু ঝট করে বসে পড়ে মার এড়াল লোকটা। উঠেই ঘুরে মারল

দৌড়। বোধহয় বুঝে গেছে, ওদের সঙ্গে মারামারি করে সুবিধে করতে পারবে না। মার তো খাবেই, ধরাও পড়বে।

'ধরো, ধরো!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

লোকটার পেছনে ছুটল ওরা।

রেডউডের তৈরি বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল লোকটা। হাত বাড়িয়ে ওপরটা ধরে এক দোলা দিয়ে সার্কাসের দড়াবাজিকরের মত ডিগবাজি খেয়ে চলে গেল ওপাশে।

মুসা আর রবিনও বেড়া ডিঙাল। ওরা রাস্তায় নামতে নামতেই লাল একটা ফোর্ড পিন্টোতে চড়ে বসল লোকটা।

প্রাণপণে দৌড় দিল ওরা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল লোকটা। চলতে শুরু করল গাড়ি। চোখের পলকে গতি বেড়ে গেল। সরে যেতে লাগল মোড়ের দিকে।

গাড়িটাকে ধরা যাবে না বুঝে নম্বর প্লেটের দিকে নজর ফেরাল দুই গোয়েন্দা। YBH এই তিনটা অক্ষর পড়ে শেষ করতে করতেই মোড়ের ওপাশে চলে গেল গাড়ি।

'ধুর!' থেমে গিয়ে বলল মুসা, 'এ ব্যাটাও গেল! অর্ধেকটা নম্বর দিয়ে একেও খুঁজে পাব না!'

'ওরও কোন কাজ হয়নি আমাদের কাছে এসে,' সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মুসার কাঁধে হাত রাখল রবিন। 'কিছু নিতে পারেনি।'

বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল ওরা।

একই সঙ্গে কথাটা মনে পড়ল দু-জনের। চট করে তাকাল পরস্পরের দিকে।

'ওপরতলায়!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

দৌড়ে বাড়িতে ঢুকল দু-জনে। একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে উঠে এল ওপরের ঘরে। নিজের ঘরের দরজা খুলল রবিন।

থমকে দাঁড়াল।

কথা হারিয়ে ফেলেছে যেন রবিন।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে।

দেয়াল থেকে সমস্ত পোস্টার টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। কেবিনেটের ড্রয়ারগুলো খুলে উল্টে রাখা হয়েছে মেঝেতে, ভেতরের জিনিস সব ছড়ানো। কাপড়, কাগজ, কলম, বই, স্যুভনির সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র। কোথাও খুঁজতে বাকি রাখেনি লোকটা। এত কষ্ট করেও রিলগুলো পায়নি বলেই খেপেছে।

একটুকরো ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে নিল রবিন। লেখা রয়েছে: লাইফ সাইকেল অভ...

'বাক্সটা পেয়েছে,' বলল সে। 'ওর মধ্যেই ছিল লেখাটা।'

'কিন্তু যা নিতে এসেছিল, পায়নি।'

'এখুনি কিশোরকে ফোন করে বলা দরকার লুকিয়ে ফেলুক।'
ফোন করল রবিন।
চতুর্থ বার রিঙ হওয়ার পর জবাব দিল অ্যানসারিং মেশিন। মেসেজ শুনতে লাগল সে।
'কি হলো, নেই?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
মাথা নাড়ল রবিন, কথা শুনছে ওপাশের।
মেশিনে রেকর্ড করে রেখে যাওয়া কিশোরের কথা শেষ হলে মেশিনকে মেসেজ দিল সে রেকর্ড করার জন্যে, 'কিশোর, টেপগুলো লুকিয়ে ফেলো! পিছে লোক লেগেছে। সাবধান থাকবে। আমরা আসছি।'
'গেল কোথায়?' মুসার প্রশ্ন। 'আমরা এসেছি ক'-মিনিট আর হয়েছে?'
'জানি না।'
আবার এসে মুসার গাড়িতে চাপল দু-জনে।
'গেল কোথায়?' একই প্রশ্ন করল মুসা। 'কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়নি তো ওকে?' ইগনিশনে মোচড় দিতেই জেগে উঠল ইঞ্জিন।
'কেন করবে?'
'কি করে বলব···হয়তো লোকটা ভেবেছে, কিশোর অনেক বেশি জেনে ফেলেছে।'
ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাল মুসা। ঢুকে পড়ল ইয়ার্ডের গেট দিয়ে। ওঅর্কশপের সামনে এসে ব্রেক করল।
'কিশোর!' চিৎকার করে ডাকল সে। 'আছো নাকি তুমি?'
'নেই,' রবিন বলল। 'থাকলে অ্যানসারিং মেশিন জবাব দিত না। সে-ই দিত।'
ওঅর্কশপে নেই কিশোর। হেডকোয়ার্টারেও পাওয়া গেল না।
'গেল!' ধপ করে একটা টুলে বসে পড়ল রবিন, 'কিশোরও গেল, টেপগুলোও!'

আট

'মুসা, অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছি আমরা। ফোন করেছি আরও আগে। এত জলদি এসে টেপগুলো সহ কিশোরকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না সোনালিচুলো।'
'তাহলে কার কাজ?' মুসার প্রশ্ন।
'দুই পাইরেট হতে পারে।'
'খুব খারাপ হয়ে যাবে তাহলে।'
বাইরে বেরোল দু-জনে।

কয়েকজন খদ্দের দেখা গেল। ওদের দিকে তাকালও না মুসারা, পুরো ইয়ার্ড চষে ফেলল কিশোরের খোঁজে। উঁচু হয়ে থাকা একটা জঞ্জালের স্তূপের অন্যপাশে আসতেই মেরিচাচীর মুখোমুখি পড়ে গেল।

ভুরু কুঁচকালেন তিনি, 'কি খুঁজছিস?'

'কিশোরকে। দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখেছি,' কতগুলো পুরানো বাক্স তুলে ঝুড়িতে রাখছেন তিনি। 'এই তো, বেরিয়ে গেল।'

'কোথায়?'

'জিজ্ঞেস করিনি। বলল, একটা জরুরী ডেলিভারি দিতে হবে, ইয়ার্ডের একটা ট্রাক নিয়ে গেল,' আরেকটা বাক্স তুলে, মুছে ঝুড়িতে ফেললেন তিনি।

'একা?'

'একা,' বলেই মুখ তুলে তাকালেন মেরিচাচী। হাসলেন। 'কেন, খুব দরকার নাকি তাকে?'

আর এখানে থাকা বিপজ্জনক। জেরা করে বের করে ফেলবেন চাচী, ওরা যে আরেকটা কেসে জড়িয়েছে। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে চলে এল ওখান থেকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা। যাক, কিশোর তাহলে কিডন্যাপ হয়নি।

ওঅর্কশপে ফিরে এল দু-জনে।

'একটা কোন ব্যাপার নিশ্চয় আছে,' রবিন বলল। 'একা একা গেল, সঙ্গে করে টেপগুলো নিয়ে গেল...'

'এই যে, আরেকজন কই?' দরজার কাছে শোনা গেল একটা খুশি খুশি কণ্ঠ।

চমকে ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'খাইছে! নিকিভাই! চলে এসেছ!'

'তোমাকে যে কি খোঁজা খুঁজছি!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'কোন কথা শুনতে চাই না, আগে আমার গাড়িটা ঠিক করে দাও!'

আন্তরিকতায় একে অন্যের হাতে থাপ্পড় মেরে হাত মেলানোর পালা শেষ করল ওরা।

পিঠের ব্যাকপ্যাকটা খুলে ঝপাৎ করে টেবিলে ফেলল নিকি। 'কি হয়েছে গাড়িটার?'

'স্টার্ট হয় না।'

'মুসাও ফেল?'

'একেবারে।'

হাতা গুটিয়ে গিয়ে হুড তুলে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ল নিকি।

মুসাও গেল সঙ্গে সঙ্গে। ফিরিস্তি দিতে লাগল, 'চোক ভালভ চেক করেছি, ঠিক আছে। অটো চোক কাজ করে। থ্রটল ভালভও ঠিক আছে...'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল নিকি। 'কারবুরেটরে তেল উপচে পড়ছে। রেঞ্চ আর

স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে এসো।'
টেবিলের ওপর বসে পা নাচাতে নাচাতে দু-জনের কাজ দেখছে রবিন।
বোকা হয়ে গেছে মুসা। গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে। এই সহজ কথাটা তার মনে পড়ল না! কারবুরেটর চেক করলেই হয়ে যেত। গিয়ে চেক করেছে কঠিন সব জায়গায়। একটিবারের জন্যেও কারবুরেটর দেখার কথা মনে হয়নি।
রবিনকে বোঝাতে লাগল নিকি, 'কারবুরেটর হলো অনেকটা টিউবের মত। তেল আর বাতাস মিশ্রিত হয় এখানে। মাত্রা একটু কম-বেশি হলেই তেলে ভরে যায় ভেতরটা। ব্যস, ইঞ্জিন বন্ধ।'
'স্টার্টও হবে না?' রবিনের প্রশ্ন।
'না।'
কারবুরেটরটা আলগা করে বের করে আনল মুসা।
সাবধানে মুছতে লাগল নিকি। জ্ঞান দিতে থাকল রবিনকে, 'কারবুরেটর খোলা তেমন কঠিন কাজ না, তবে জানা না থাকলে একেবারেই হাত দেয়া উচিত নয়।'
দক্ষ হাতে, সার্জন যেমন করে রোগীর অপারেশন করেন, তেমনি ভঙ্গিতে কারবুরেটরটা খুলে টুকরো টুকরো করে ফেলল নিকি।
নীডল ভালভটা মুখে লাগিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল। 'শুনছ? শিসের মত শব্দ বেরোচ্ছে না? তার মানে লিক আছে। ফুটো হয়ে গেছে কোন ভাবে। তারমানে এইটাই রোগ, এতেই সমস্যা।'
'বের তাহলে করেই ফেললে,' রবিন বলল।
মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কিনতে হবে নাকি পার্টসটা?'
'আগে দেখি, এখানে আছে কিনা। ওই দিকটায় দেখো তো, ফোক্স ওয়াগেনের একটা পুরানো কারবুরেটর ফেলে রেখেছিলাম।'
উঠে গেল মুসা।
'নিকিভাই, তুমি আসলেই জাদুকর!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল রবিন। 'ইঞ্জিন তোমার সঙ্গে কথা বলে!'
'জাদুকর-ফাদুকর কিছু না, সেন্সটা কেবল দরকার, তাহলেই ইঞ্জিন ঠিক। অত কঠিন কিছু না। তারপর বলো, এদিককার খবর কি? কিশোর কোথায়?'
'তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' সোয়াপ মিটের ঘটনাটা নিকিকে বিস্তারিত জানাতে লাগল রবিন। বলতে গিয়ে মনে পড়ল গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসদের কথা। গোলমাল বাধিয়ে বসেনি তো? মনকে বোঝাল সে, না, এখনও শান্তই আছে ওরা। নাহলে তাকে ফোন করত ফেয়ারি।
'এই যে, পেয়েছি!' ঘরের কোণ থেকে চেঁচিয়ে জানাল মুসা, এমন করে ধরে আছে পুরানো পার্টসটা, যেন অলিম্পিকের কাপ। দৌড়ে এল নিকির কাছে। 'এটা?'

হাত বাড়াল নিকি, 'হ্যাঁ। বারোশো সিরিজের ইঞ্জিন ছিল এটা। ভাল জিনিস।'

'মনে রাখো কি করে এত কথা...'

মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'মুসা, এই মুসা, তোমার ফোন।'

উঠে গেল মুসা। আধ মিনিট পরেই ফিরে এল মুখ চুন করে। 'মা করেছে। এখুনি বাড়ি যেতে বলেছে। জরুরী কাজ।' গজগজ করতে লাগল সে, 'কাজের আর সময় পেল না!'

'চলে যাও,' নিকি বলল। 'গোলমালটা কোথায় ছিল, দেখেই তো গেলে।'

কিন্তু এখানকার এই আড্ডা আর ইঞ্জিনের কাজ ফেলে যেতে কি আর ইচ্ছে করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিয়ে নিজের গাড়িতে বসতে হলো মুসাকে।

নিকির দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'আজকে মুসার আশা ছাড়তে পারো। আন্টি যখন ডেকেছে, সারাদিনে ছাড়বে না।'

'কাজের মধ্যে থাকা ভাল,' হেসে বলল নিকি। 'আমার মত ভাদাইম্যা হওয়া উচিত না কারও। তা তোমার টেপের গল্প তো শেষ করলে না।' একটা পরিষ্কার নেকড়ায় পুরানো কারবুরেটরটা রেখে সেটাও খুলতে আরম্ভ করল সে।

সব কথা খুলে বলার পর কিশোর যে রহস্যজনক ভাবে বেরিয়ে গেছে এ কথা জানাল।

মাথা নাড়ল নিকি, 'তাকে নিয়ে ভাবার কিছু নেই। অতিমাত্রায় সতর্ক। এসে পড়বে।' নীরবে কাজ করতে করতে হঠাৎ তুড়ি বাজাল সে, 'পেয়েছি!'

'কি, ইঞ্জিনের রোগ?'

'না, তোমাদের সাহায্য করার উপায়। একজনকে চিনি, টেপ পাইরেসিতে জড়িত ছিল। তাকে খুঁজে বের করে খবর নেব, পচা ক্যাসেটগুলো কারা বিক্রি করেছে তোমার কাছে; এই কারবার করে বড়লোক হতে চায় কে?'

'পারবেন?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে গেল রবিন, 'খুব ভাল হয় তাহলে!'

'না, হয় না। খুব খারাপও হতে পারে,' চোখ সরু করে বলল নিকি, 'পাইরেটিং ব্যবসা কোটি কোটি টাকার কারবার। বাধা পেলে খুন করতেও দ্বিধা করবে না ওরা!'

নয়

'কোথায় পেলে এগুলো?' বিশাল টেপ-সিসটেমটা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস

করলেন দি মিউজিশিয়ান কোম্পানির প্রেসিডেন্ট বার্নার্ড এ. স্মিথসন। মোটাসোটা শরীর, ছয় ফুট লম্বা মানুষ, রাগত চোখে তাকিয়ে আছেন কিশোরের দিকে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আঙুলে চেপে ধরা সিগার। বিলাসবহুল অফিসের পেছনের দেয়ালে ডিসপ্লে র‍্যাকে সাজানো রয়েছে সারি সারি গোল্ড অ্যান্ড প্ল্যাটিনাম রেকর্ড। দানবীয় এই রেকর্ড কোম্পানি সৃষ্টিতে ওগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি।

প্রেসিডেন্টের রাগের বিন্দুমাত্র পরোয়া করল না কিশোর। আরাম করে হেলান দিল গদিমোড়া চেয়ারে। শান্তকণ্ঠে বলল, 'আপনাআপনিই চলে এল হাতে।'

টেপদুটো ড্রয়ারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন স্মিথসন। চামড়ায় মোড়া উঁচু চেয়ারটায় পিঠ খাড়া করে বসলেন। গায়ে দামী স্পোর্টস জ্যাকেট, পরনে ধূসর রঙের স্ল্যাকস। দরজি দিয়ে সেলাই করা শার্টের গলার কাছটায় দুটো বোতাম খোলা, তিনটে সোনার চেন বেরিয়ে আছে।

'এ দুটো ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলসদের নতুন এল-পি *গন টু হেভেনের* মাস্টার টেপ,' বিড়বিড় করলেন তিনি। ফেটে পড়লেন পরক্ষণে, 'সর্বনাশ করে ফেলেছে আমার! কে করেছে তা-ও জানতে পারব না!'

'আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে দেখতে পারেন, স্যার,' মোলায়েম স্বরে বলে পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল কিশোর।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কার্ডটায় একবার নজর বুলিয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি, 'চোরগুলোকে ধরার জন্যে বড় বড় ডিটেকটিভকে হাজার হাজার ডলার দিয়েছি আমি। ওরাই কিছু করতে পারেনি। কপিটা কে করেছে, ধরতে পারেনি। তোমরা তিন কিশোর আর কি করবে?'

'দায়িত্ব দিয়েই দেখুন না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে জবাব দিল কিশোর। 'প্রথমেই ভাবুন, টেপগুলো কেউ বের করতে পারেনি, আমরা পেরেছি। অ্যাক্সিডেন্টালিই হোক আর যে ভাবেই হোক, বের তো করে এনেছি। বয়েস কম হওয়াতে একটা বড় সুবিধে আছে আমাদের—অস্বীকার করতে পারবেন না—বড়রা পাত্তা দেবে না আমাদের। খুব একটা নজর দিতে চাইবে না আমাদের দিকে। তদন্ত করতে গিয়ে সেই সুযোগটাই নেব আমরা। তা ছাড়া আরও একটা কথা বলি আপনাকে, এ সব কাজ অনেক করেছি আমরা। এমন কিছু কেসের সমাধান করেছি, যেগুলো নিয়ে পুলিশও হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘনঘন কয়েকবার সিগারে টান দিলেন স্মিথসন। আবার তাকালেন সামনে পড়ে থাকা কার্ডটার দিকে।

সহজ ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ লাগছে নাকে, অসহ্য এই সিগার, কিন্তু তা-ও নাক কুঁচকানো থেকে বিরত থাকছে অনেক কষ্টে, পাছে আবার বিরক্ত হয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্ট, হাতছাড়া

হয়ে যায় কেসটা।

'একটা কথা বুঝতে পারছি,' বলল কিশোর, 'পুলিশকে জানাতে চাইছেন না ব্যাপারটা, নাহলে এতদিনে জানিয়ে দিতেন।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচু করলেন স্মিথসন। 'চালাক ছেলে। তেমন প্রয়োজন না পড়লে পুলিশকে জানাতে চাই না। কারণ, ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাচ্ছি। চুরির কথাটা কেবল সিকিউরিটি গার্ডদের বলেছি। এখানকার স্টাফরা বড় বেশি খুঁতখুঁতে, একটুতেই সন্দেহ করে বসে। পুলিশকে তদন্ত করতে আসতে দেখলেই উল্টোপাল্টা ভেবে বসতে পারে। কি করবে তখন কে জানে! তবে শেষ পর্যন্ত কিছু করা না গেলে না জানিয়ে আর পারব না। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার।'

'আপনার স্টাফদের জন্যেও আমরা সুবিধেজনক,' কিশোর বলল। 'আমাদেরকে চোখেই পড়বে না ওদের।'

'ধরো তোমাদেরকে কাজটা দিলাম। কোনখান থেকে শুরু করবে?'

'দুটো প্রশ্ন দিয়ে। প্রথম প্রশ্ন, কতদিন হলো টেপগুলো হারিয়েছেন?'

চোখ বন্ধ করে গলগল করে বিষাক্ত ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন দি মিউজিশিয়ানের কর্ণধার। 'দুই বছর।' চোখ মেলে কিশোরের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা প্রথম বুঝলাম, আমার ছেলে যখন আমাদেরই একটা গ্রুপের একটা টেপ বাড়ি নিয়ে এল। কোয়ালিটি এতই ভাল, মনে হলো আমাদের তৈরি মাস্টার প্রিন্ট। কিন্তু কভারটা মিলল না, অন্য রকম। সন্দেহ জাগল। টেপটা পরীক্ষা করালাম। জানা গেল, আমাদের নয় ওটা, অন্য কেউ করেছে।'

'মাস্টার টেপ থেকে কপি করা?'

'কোয়ালিটি যা, তাতে তো তাই মনে হয়।'

'আপনাদের মাস্টার টেপ জিনিসটা কি, বলবেন?'

'প্রথমে আমরা টোয়েন্টি-ফোর-ট্র্যাক মাস্টার রিল তৈরি করে নিই, সাধারণত দুই ইঞ্চি চওড়া টেপে। গোটানো চাকাটার ব্যস দশ ইঞ্চি মত, তুমি যেগুলো পেয়েছে অতবড়। যত রকমের ইলেকট্রনিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করা দরকার, সব ওই চওড়া টেপগুলোতে করে নিই আমরা। তারপর সেগুলো থেকে কপি করি কম চওড়াগুলোতে,' ড্রয়ারে রাখা একটা টেপে টোকা দিলেন স্মিথসন, 'এ সব টেপে।'

'তার মানে এ দুটো আপনাদের করা বড়গুলোর কপি।'

'হ্যাঁ। তারপর এ সব সরু মাস্টার টেপ থেকে রেকর্ড আর ক্যাসেট তৈরি করি আমরা, যেগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, নিয়ে গিয়ে তোমরা বাজাও। কপি করার সময় চালাতে চালাতে এক সময় নষ্ট হয়ে আসে সরু মাস্টারগুলো, সে-জন্যেই এই ধরনের মাস্টারও অনেকগুলো তৈরি করে রাখতে হয় আমাদের।'

'বাজারে ছাড়ার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়া ডেজ-এর কপি করা আরম্ভ

করেছেন?'

'না!' কটকটে হয়ে গেল স্মিথসনের কথা, 'এই ব্যাপারটাই মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে আমার। টোয়েন্টি-ফোর-ট্র্যাক মাস্টারের কপি করে এ দুটো বানিয়েছে কেউ। দি মিউজিশিয়ানসে কাজ করে এমন কারও পক্ষেই কেবল সম্ভব।'

'তারমানে ঘরের ইঁদুর…'

ইনটারকম বাজল। সুইচ টিপে জিজ্ঞেস করলেন স্মিথসন, 'বলো?'

'আইজাক ডেভিড কিউরান নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, স্যাব,' জবাব এল পুরুষ কণ্ঠে।

'এক সেকেন্ড।'

ইনটারকম অফ করে দিলেন স্মিথসন। কিশোরকে বললেন, 'ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। একটা জ্বালাতন। কিন্তু খবরের কাগজ তো, কিছু বলতেও পারি না। গন টু হেভেন নিয়ে ওকে লিখতে বলব ভাবছি।'

'দারুণ একটা রেকর্ড হবে।'

'আমারও তাই ধারণা,' উঠে দাঁড়ালেন স্মিথসন। 'প্রথম ধাক্কায়ই দশ লাখ কপি বিক্রি হয়ে যাবে, আমি শিওর।'

সোনার বর্ডার দেয়া গিটার আকৃতির অ্যাশট্রেতে পোড়া সিগারটা গুঁজলেন তিনি। 'তোমাদেরকে একটা সুযোগ দেব ভাবছি। কাল সকাল ন-টায় চলে এসো এখানে।'

'আসব।'

কিশোরও উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। কার্ড বের করে পেছনে একটা ব্যক্তিগত নম্বর লিখে দিলেন তিনি। 'আমার বাড়ির ফোন। যখন ইচ্ছে কোরো।'

'থ্যাংকস।' কার্ডটা পকেটে ভরে রাখল কিশোর। দরজার দিকে এগোল।

সঙ্গে এলেন স্মিথসন। 'এখানে কারও কাছে তোমাদের আসল পরিচয় দেবে না,' হুঁশিয়ার করে দিলেন তিনি। 'আমি বলে দেব, আমার পরিচিত তোমরা, স্কুল ছুটি, তাই পার্টটাইম চাকরি করতে চাও। দিয়ে দিয়েছি চাকরি। তাতে কারও সন্দেহ জাগবে না। কারণ লোক আমাদের দরকার আছে।' টান দিয়ে দরজার পাল্লা খুললেন, 'তোমার স্মার্টনেস আমার ভাল লেগেছে, সে-জন্যেই কাজটা দিলাম। তা ছাড়া,' হাসলেন তিনি, 'আমাদের বেশির ভাগ ক্রেতা তোমাদের বয়েসী, টীনএজার। গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও তোমাদের তিনজনকে দিয়ে আরও একটা কাজ হতে পারে আমার, ভবিষ্যতে, মার্কেট যাচাইয়ের একটা সুবিধে পাব।'

রিসিপশন এরিয়ায় বেরিয়ে এলেন দু-জনে। স্মিথসনের সেক্রেটারি একজন সুদর্শন যুবক, বসের মত সে-ও সোনার চেন পরেছে। কথা বলছে বেঁটে, গোলগাল একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে। দুই হাতের দুই আঙুলে হীরা

বসানো দুটো সোনার আঙটি পরেছে সাংবাদিক। পারফিউমের হালকা গন্ধ যেন স্থির হয়ে আছে বাতাসে।

'আপনার কোন কথা শোনার আমি দরকার মনে করছি না,' যুবককে ধমকাচ্ছে সে। উঁচু স্বর, কথা বলার সময় নাকে লেগে যায়, মনে হয় যেন ফুটোতে শ্লেষ্মা ভরে আছে। 'আপনি কে…'

সেক্রেটারির সঙ্গে একজন বাইরের লোকের এই আচরণ রাগিয়ে দিল স্মিথসনকে।

শব্দ শুনে মোটা ধড়ের ওপর ঘুরে গেল বেঙের মাথার মত মাথাটা। চোখ পড়ল দি মিউজিশিয়ানের প্রেসিডেন্টের ওপর। চোখের পলকে বদলে গেল মুখের ভাব, বিগলিত হাসি ফুটল।

'এই যে, বার্নার্ড,' আন্তরিকতায় ভরে গেল কণ্ঠ, খাটো পায়ে অনেকটা বেঙের মতই গড়িয়ে গড়িয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল কিউরান। 'দেখা আবার হয়েই গেল। খুব খুশি হলাম। কি রত্ন এবার দান করার ইচ্ছে আমাকে?'

জোর করে প্রেসিডেন্টকে হাসতে দেখল কিশোর। তেলানো স্বভাবের সাংবাদিককে সে-ও পছন্দ করতে পারল না।

'আসুন, কিউরান,' অফিসে যাওয়ার জন্যে ডাকলেন স্মিথসন, 'ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলসদের দুর্দান্ত একটা নতুন রেকর্ড শোনাব আপনাকে। সাংঘাতিক গরম। হিট যে কি পরিমাণ করবে গানটা শুনলেই আন্দাজ করতে পারবেন।'

অফিসে ঢুকে গেলেন দু-জনে। দরজা লাগিয়ে দিলেন স্মিথসন।

সেদিকে তাকিয়ে ঘৃণায় মুখ বাঁকাল সেক্রেটারি। 'ব্যাটা শয়তানের চ্যালা! মিস্টার স্মিথসন ওর সঙ্গে না মিশলেই ভাল করতেন!'

সেক্রেটারির মত একই কথা কিশোরও ভাবছে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল রিসিপশন থেকে।

•

'আচ্ছা, কিশোর মাঝে মাঝে এত রহস্যময় আচরণ করে কেন, বলো তো?' সে রাতে মুসার গাড়িতে চড়ে বলল রবিন। তার গাড়িটা এখনও দেয়নি নিকি; ভালমত দেখে দিতে চায়, যাতে কিছুদিন শান্তিতে চালাতে পারে।

'এত রাতে এই জরুরী তলবেরই বা মানে কি?' মুসার প্রশ্ন। 'কিসের মিটিং করবে?' ছায়াঢাকা পাম গাছ আর পার্ক করে রাখা গাড়ির ওপর ঘুরছে তার বেল এয়ারের হেডলাইটের আলো।

'রাত বেশি হয়নি। মাত্র ন-টা বাজে। আন্টি খুব খাটিয়েছেন বুঝি তোমাকে?'

'কোমর বাঁকা করে দিয়েছে। মাকে চেনো না, কোনমতে কাজ করানোর চান্স পেলেই হয় একবার।'

বাড়ি চলে এসেছিল রবিন। কিশোরের ফোন পেল, হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। মুসার বাড়িতে চলে এল রবিন। তাকে নিয়ে চলেছে এখন ইয়ার্ডে।

ওঅর্কশপে পাওয়া গেল কিশোরকে।

রবিন বলল, 'না বলে কোথায় চলে গিয়েছিলে, কিশোর? আমরা চিন্তায় বাঁচি না। ভাবলাম, সোনালি চুল লোকটা তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে। কি হয়, কোথায় যাও না যাও, আমাদেরকে একটু জানিয়ে গেলেও তো পারো। আমরা কি আর কাজ করি না তোমার সঙ্গে?'

দুই সহকারীর অপেক্ষায়ই ওঅর্কশপে বসে ছিল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল। 'বলার প্রয়োজন মনে করিনি তখন, তাই বলিনি। এখন বলা দরকার।'

'তাহলে আর কি,' রাগ করেই বলল মুসা। 'বলে ধন্য করো।'

হাসল কিশোর। 'খামোকা আমার ওপর রাগ করছ তোমরা।'

দি মিউজিশিয়ান কোম্পানিতে গিয়ে কি কি করে এসেছে, দুই সহকারীকে জানাল সে।

'মরেছি!' হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল রবিন, 'একসঙ্গে কয় জায়গায় যাই! তোমার সঙ্গে যাওয়ারই বেশি ইচ্ছে আমার, কিন্তু ওদিকে লজকে কথা দিয়েছি তাঁর অফিস দেখব। ফেয়ারি একা পারবে না।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল, 'তুমি?'

'আল্লাই জানে, কি হবে!' মুখ বাঁকিয়ে মুসা বলল, 'আজকে তো আমার বারোটা বাজিয়েছে মা। কাল ভোরে উঠেই বাড়ি থেকে পালাব ভাবছি, মা ধরে ফেলার আগেই।'

'বেশ, সকাল সকাল চলে এসো তাহলে।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে আবার গাড়িতে করে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল মুসা আর রবিন। দু-শো গজ এগোতে না এগোতে রিয়ার ভিউ মিররে দেখল মুসা, আরেকটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠেছে। ওদের পিছু নিল গাড়িটা।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। রাস্তায় গাড়ি থাকতেই পারে, যে কোন পথে চলতেও পারে। কিন্তু আরও কিছুদূর যাওয়ার পর যখন আরেকটা গাড়ি আলো জ্বেলে পিছু নিল, অবাক হতেই হলো তাকে। দুই দুইটা ব্লক পেরিয়ে আসার পরও যখন একই ভাবে পেছনে লেগে রইল দুই জোড়া হেডলাইট, গুরুত্ব না দিয়ে আর পারল না।

ঘোষণা করল, 'বিপদ আসছে!'

দশ

অন্ধকারে একের পর এক মোড় নিতে লাগল মুসা। ঘুরে বেড়াতে লাগল ব্লকগুলোর ভেতরের অলিগলিতে। কারা ওরা? রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু

বুঝতে পারছ?'

পেছনের সীটে বসে পাশে ঝুঁকে পড়েছে রবিন। পেছনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। 'দুটো ছোট গাড়ি। আরেকটা মোড় নাও কোথাও, দেখি চিনতে পারি কিনা।'

মোড় নিল মুসা।

'সামনেরটা সাদা ডাটসান বি-টু-টেন,' জানাল রবিন। 'পেছনেরটা হোন্ডা সিভিক। রঙ চিনতে পারছি না ওটার। হলুদ-টলুদ হবে। দুটোই পুরানো। নম্বর প্লেট দেখতে পাচ্ছি না।'

'আর?'

'আর কিছু না। কি করব?'

'বুঝতে পারছি না,' উদ্বেগে ভরা কণ্ঠ মুসার। টায়ারের শব্দ তুলে মোড় নিল আবার। সামনে একটা ট্র্যাফিক সার্কেলের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হলো মুখ। নিজেকেই যেন বোঝাল, 'হ্যাঁ, কাজ হতে পারে!'

'কী?'

'সিনেমায় যে ভাবে খসায় সে-ভাবে চেষ্টা করব। রাস্তায় ভিড় কম আছে। শক্ত হয়ে বসো।'

উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে রইল রবিন। সার্কেলের দিকে ছুটল মুসা। চার দিকে চারটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে ওখান থেকে। সার্কেলের ভেতরে একটুকরো ঘাসে ঢাকা জমির মাঝখানে একটা ফ্ল্যাগপোল বসানো।

সার্কেলটায় পৌঁছে ওটাকে পাশে রেখে তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করল সে। ক্রমেই গতি বাড়াচ্ছে। ভয়ানক শব্দ করছে বেল এয়ারের পুরানো এঞ্জিন। পেছনে দুটো গাড়িই লেগে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

'মনে হয় কাজ হবে!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন।

চক্রটার অর্ধেক পার হয়ে এল ওরা…চার ভাগের একভাগ…তারপর হঠাৎ দেখা গেল ঘুরে পেছনের গাড়ি দুটোর পেছনে চলে এসেছে।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল প্রথম গাড়িটার ড্রাইভার। পরক্ষণেই দ্বিতীয়জন ব্রেকে চাপ দিল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। ধ্রাম করে গিয়ে গুঁতো লাগাল প্রথমটার পেছনে। আর্তনাদ করে উঠল ধাতব বডি, বাঁকাচোরা হয়ে গেল।

বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে মুসা। ডানে কাটল। সামনের হোন্ডাটার পেছনের বাম্পারে তার গাড়ির ঘষা লেগে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটল। তবে এর বেশি কিছু হলো না, বেরিয়ে এল নিরাপদেই। তীব্র গতিতে পার হয়ে এল হোন্ডা এবং ডাটসান, দুটো গাড়িকে।

আবার ঠিকমত দম নিতে পারল রবিন। পেছন ফিরে তাকাল।

গতি বাড়িয়ে আবার তাদের পিছু নিল ডাটসান।

হোন্ডাটা আর ওটার পেছনে রইল না, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

এবার কি? ভাবছে মুসা।

ডাটসানের গায়ে একপাশ থেকে বাড়ি মারল হোন্ডা। আগুনের ফুলকি ছুটল।

সার্কেল ঘিরে পাশাপাশি ছুটতে লাগল দুটো গাড়ি।

পাশে সরতে লাগল ডাটসান। ধাক্কা মেরে বসল হোন্ডাকে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘষা লেগে তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল।

'বাহ্, চমৎকার!' রবিন বলল।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

'ওরা এখন একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগেছে।'

'এই সুযোগে পালাতে হবে আমাদের।'

ছুটতে ছুটতে চারটে রাস্তার একটার মুখের কাছে আসতেই শাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল মুসা। ঢুকে পড়ল রাস্তাটায়। পেছন থেকে শোনা গেল আবার সংঘর্ষের শব্দ।

গুলি হলো চারবার।

'লোকগুলো যে-ই হোক,' শঙ্কিত গলায় বলল রবিন, 'ডেঞ্জারাস!'

'মাথায়ও মনে হয় দোষ আছে। প্রথমে আমাদের পিছু নিল, তারপর নিজেরা নিজেরাই মারামারি শুরু করে দিল। এ রকম করল কেন?'

'বুঝতে পারলাম না। সঙ্গে পিস্তল আছে, আমাদের গুলি করার জন্যে এনেছিল নাকি কে জানে! কিশোরকে ফোন করে সাবধান করে দেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ,' মুসা বলল। 'এখন ওরা তোমার আর কিশোরের ঠিকানা জেনে গেছে।'

পরদিন সকালে নিজের গাড়ি চালিয়ে অফিসে যেতে পারল রবিন। আগের রাতে বাড়ি ফিরে দেখে ড্রাইভওয়েতে বসে আছে ওটা। ইঞ্জিনের অবস্থা আর দেখার প্রয়োজন মনে করেনি, নিকির হাত ঘুরে এসেছে যখন, নিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়তে পারে যেখানে খুশি।

সারাটা সকাল লজের অফিসে বসে কাজ করল সে, কিন্তু বার বার মনে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল আগের রাতের ঘটনার কথা। লোকগুলো নিশ্চয় ভেবেছে, মাস্টার টেপগুলো এখনও তার কাছে আছে। নিকির হুঁশিয়ারি মনে পড়ল—কোটি কোটি টাকার কারবার···দশ-বিশটা খুন করতেও দ্বিধা করবে না ওরা···

সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল রবিন। আর ওদেরকে হেলাফেলা করা যায় না। মনে পড়ল, রাতে সঙ্গে পিস্তল নিয়ে এসেছিল ওরা।

এগারোটার দিকে অফিসে ঢুকল ববি। পরনের সব কিছু ধূসর রঙের—জুতো, আঁটো প্যান্ট, লম্বা ঝুলওয়ালা পুরুষের শার্ট। মাথার কুচকুচে কালো চুলগুলোকেও ঢেকেছে একটা ধূসর স্কার্ফ দিয়ে। তার এখনকার মেজাজের সঙ্গে মানিয়ে গেছে এই রঙ। ছোট্ট মুখটায় উদ্বেগের ছাপ।

কেঁদেছে, তাই চোখের পানিতে ধুয়ে গেছে মাসকারা, চোখের নিচে কালি।

'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব,' রবিনকে বলল সে। ঝটকা দিয়ে এমন একটা ভঙ্গিতে তাকাল ফেয়ারির দিকে, বুঝিয়ে দিল তার সামনে বলতে চায় না।

উঠে দাঁড়াল রবিন। বলল, 'আসুন।'

ববিকে লজের অফিসে নিয়ে এল সে।

পকেট থেকে ধূসর একটা রুমাল বের করে নাক-চোখ মুছল ববি। ফিসফিস করে বলল, 'ও চলে গেছে।'

'কে?'

'জ্যাক, আর কে? সোয়াপ মিটে সেদিন গান গেয়ে যাওয়ার পর আর কোন খোঁজ নেই তার।' খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরল ববি, 'রবিন, ওকে খুঁজে বের করে দাও!'

আস্তে করে তার কাঁধ চাপড়ে দিল রবিন। কি বলবে ভাবছে।

তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে ববি।

'তার আত্মীয়-স্বজনকে জানানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ওরা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না,' আবার চোখে রুমাল চাপা দিল ববি।

'তাই,' লজের চেয়ারটাতে বসল রবিন। খুব আরাম। ফোন গাইড থেকে জ্যাকের নম্বর খুঁজে বের করে ডায়াল করল।

ওপাশে রিঙ হয়েই চলল, কেউ ধরল না। বিশবার রিঙ হওয়ার পর লাইন কেটে দিল সে। তারপর খুঁজে বের করল জ্যাকের বাড়ির নম্বর।

এইবার রিসিভার তোলা হলো ওপাশে। 'হ্যালো?' সন্দেহ ভরা কণ্ঠস্বর।

'আপনি কি জ্যাকের কিছু হন?'

'আমি মিসেস ফ্রেড, ওর মা। কাকে চান?'

'অমি রবিন মিলফোর্ড, ট্যালেন্ট এজেন্সি থেকে বলছি। জ্যাককে দরকার।'

'সে তো এখানে থাকে না। আলাদা বাসা আছে।'

'সেখানে করেছিলাম, কেউ ধরল না।'

'তার ভাইয়ের কাছে করে দেখুন। ওর নাম ম্যাক, ম্যাকিনটশ ফ্রেড।' লাইন কেটে দিল মহিলা।

ফোন বুক থেকে নম্বর বের করে জ্যাকের ভাইকে ফোন করল রবিন।

জবাব এল, 'হালো?'

'মিস্টার ফ্রেড? আমি রবিন মিলফোর্ড, ট্যালেন্ট এজেন্সি থেকে বলছি। জ্যাকের সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'যাবে। রকি বীচ জেনারেল হাসপাতালে ফোন করে দেখতে পারেন।'

'হাসপাতাল!' রবিন বলতেই চেয়ারে ঝট করে পিঠ সোজা করে ফেলল ববি।

'কাল থেকেই আছে ওখানে,' ম্যাক বলল।
'কেন?'
'তাকেই জিজ্ঞেস কোরো।'
বোকা হয়ে গেছে যেন রবিন ম্যাককে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল। ববির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটাও চেয়ে আছে তার চোখে চোখে।
'চলুন, যাই।'
কেঁদে কেঁদে বলতে শুরু করল ববি, 'আমি জানতাম···জানতাম···এমনই কিছু একটা হবে···'

দি মিউজিশিয়ানের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে আগের রাতের ঘটনা সব কিশোরকে বলল মুসা।
শুনে কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে দুটো দলের দলাদলির মাঝখানে পড়ে গেছি আমরা।'
এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করব?'
'যা করছি, তদন্ত।'
'সেটা করতে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'
'আমারও না। সে-জন্যেই মিউজিশিয়ানের কাউকে বুঝতে দেয়া যাবে না আমরা চাকরির নামে আসলে ওখানে কি করছি। পাইরেটদের স্পাই থাকতে পারে।'
বিশাল সাততলা বিল্ডিঙে দি মিউজিশিয়ানের অফিস। ছাতে বিরাট একটা সোনালি রঙের রেকর্ড দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, বহু মাইল দূর থেকেও চোখে পড়ে সেটা। পুরু কার্পেটে ঢাকা প্রতিটি করিডর। আধুনিক ধোপ-দুরস্ত পোশাক পরা কর্মচারীরা ব্যস্ত ভাবে চলাফেরা করছে। ডোনার হাম্বারসন নামে একজন কর্মচারীকে ছেলেদের আসার কথা বলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন স্মিথসন। ফলে ওদের কোন অসুবিধে হলো না। যা যা কাগজপত্র দেখতে চাইল কিশোর, দেখানো হলো তাকে। কোন ব্যান্ড কবে কোথায় গান গাইতে গেছে, আগামীতে যাবে, কি ভাবে বিজ্ঞাপন করা হয়, কি করে ক্যাসেট আর রেকর্ড বিক্রি হয়, সব।
'তিনশোর বেশি লোক কাজ করে এখানে,' এলিভেটরে করে মাটির তলার মেইলরুমে নামার সময় ডোনার জানাল। একটা টেবিলে স্তূপ হয়ে আছে পোস্টঅফিসের খাম। মেঝেতে খোলা পড়ে আছে একটা কাপড়ের ব্যাগ। সে-সব দেখিয়ে বলল সে, 'সমস্ত চিঠিপত্র এখানে এসে জমা হয়। বাইরে থেকে যেগুলো আসে, অফিসের বিভিন্ন বিভাগে পাঠিয়ে দেয়া হয়। যে সব চিঠি বাইরে পাঠানোর দরকার পড়ে, তা-ও এখানে পাঠিয়ে দিই আমরা। ভক্তদের চিঠিপত্রও ডাকে এখানেই আসে। আমরা তখন যার যারটা তার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করি।' ফ্রম দি স্পেস দলের বিখ্যাত গিটারিস্ট

হ্যারিসন বেন্ডার-এর নাম লেখা একগাদা চিঠি দেখাল ডোনার।

'এই তাহলে ব্যাপার,' মুসা বলল। 'আমার একটা কৌতূহল ছিল, ভক্তদের চিঠিগুলো পায় কি করে ওরা?'

'এই মেইলরুমটাই তোমার হেডকোয়ার্টার, মুসা,' ডোনার বলল। 'তোমাকে রানারের কাজ করতে হবে। এবং কাজটা কাজই, হেলাফেলা করলে চলবে না।'

মুসা ভেবেছিল, এখানে স্মিথসনের মেহমান হয়ে আরামে কাটিয়ে দেবে কয়েকটা দিন, কিন্তু এমন একটা তৃতীয় শ্রেণীর খাটুনির কাজ তাকে দেয়া হবে কল্পনাই করতে পারেনি। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি বলে ফেলল কিশোর, 'মুসার এ-সব কাজ পছন্দ। দৌড়াদৌড়ি করতে ভাল লাগে তার, ব্যায়াম হয়। আমার কাজটা কি?'

'প্রেসিডেন্ট সাহেব বলে দিয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে থাকবে তুমি।'

একজন কর্মচারীকে কিছু বলার জন্যে ডোনার সরতেই কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে অভিযোগের সুরে কিশোরকে বলল মুসা, 'তুমি থাকবে ওপরতলায় আরামে বসে, আর আমি দৌড়াদৌড়ি করে পায়ের বারোটা বাজাব, না?'

'চুপ! আসছে!'

ওদেরকে দোতলায় নিয়ে এল ডোনার। বিশাল উঠানের মত এক ঘর। দেয়াল-জোড়া আয়না এখানে, মস্ত টবে লাগানো সবুজ পাম গাছ, তামার চকচকে ফিটিংস, মার্বেলের মেঝে।

'রেকর্ড করাতে এলে শিল্পীরা এখানেই বসে,' ডোনার বলল।

'খাইছে!' অবাক হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে মুসা।

'জায়গা বানিয়েছেন বটে!' কিশোরও মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

হাসল ডোনার। 'এসো।'

অনেক বড় একটা হলঘরের পাশ দিয়ে ওদেরকে নিয়ে চলল সে, একপাশে সারি সারি কাঁচের দরজা লাগানো ঘর, দেয়ালও কাঁচের, আরেক পাশে কাঠের দরজা আর দেয়াল লাগানো অফিস ঘর। দেয়ালে লাগানো শিল্পীদের অটোগ্রাফ দেয়া ছবি।

'সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার আর টেকনিশিয়ানরা এখানে কাজ করে,' ডোনার বলল। 'রেকর্ড, এডিটিং, রিপ্রডিউস, সবই এখানে করি আমরা।'

'দেখো!' হাত তুলে দেখাল মুসা, 'লস অ্যাঞ্জেলেস ফ্রিওয়েজ! দুর্দান্ত ওরা!'

চামড়ার পোশাক পরা তিনজন গায়ককে নেচে নেচে গান গাইতে দেখা গেল কাঁচের দেয়ালের ওপাশে। মুখের কাছে মাইক্রোফোন। তারমানে রেকর্ডিং হচ্ছে।

'কই, একটা শব্দও শুনতে পাচ্ছি না!' তাজ্জব হয়ে বলল মুসা।

'পুরোপুরি সাউন্ডপ্রুফ ঘর,' কিশোর বলল ওকে।

মাথা ঝাঁকাল ডোনার। অর্থাৎ ঠিকই বলেছে কিশোর।

দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'শুনলাম, ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলসদের একটা সাংঘাতিক অ্যালবাম আসছে।'

'হ্যাঁ। ওটা নিয়ে কাজ করছে এখন নরিস টোবারসন।'

ছোট আরেকটা ঘরে গোয়েন্দাদের নিয়ে এল ডোনার। এখান থেকে একটা রেকর্ডিং স্টুডিও দেখা যায়। ওরা ঢুকতেই আস্তে করে পেছনে লেগে গেল দরজার পাল্লা। ভয়ই করতে লাগল মুসার, মনে হচ্ছে কোন স্পেসশিপে ঢুকে পড়েছে। আধো-চাঁদের আকৃতির বিশাল এক টেবিলের পুরো পেছন দিকটা জুড়ে বসানো রয়েছে দুই ফুট উঁচু তাক, সেই তাক আর টেবিলে রাখা যন্ত্রপাতিতে ডায়াল, সুইচ, আলোকিত বোতামের সীমা-সংখ্যা নেই।

'এই যে ইনি নরিস টোবারসন,' টাকমাথা, হাসিখুশি একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ডোনার। 'আমাদের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারদের একজন।'

বড় বড় সাদা দাঁত বের করে হাসলেন নরিস। হাত মেলালেন গোয়েন্দাদের সঙ্গে। কোনটা কি যন্ত্র বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। দানবীয় একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র দেখিয়ে বললেন, 'এই স্টুডিওর সবচেয়ে দামী জিনিস। পাঁচ লাখ ডলার দাম। যে কোন ধরনের রেকর্ডিং করতে পারবে এটা দিয়ে, ফরটি-এইট-ট্র্যাক পর্যন্ত। বাজনার অলঙ্করণের জন্যে শব্দ মিশিয়ে দিতে পারবে এর সাহায্যে।'

দুই ইঞ্চি পুরু, দশ ইঞ্চি ব্যাসের চারটে রিল একটার ওপর আরেকটা রাখা। সেগুলোতে চাপড় দিয়ে বললেন, 'আমাদের নতুন হিট, গন টু হেভেনের মাস্টার প্রিন্ট। সব আছে এই চারটে রিলে।'

'সঅব!' প্রতিধ্বনি করল কিশোর।

'সব।' অনেকগুলো সাদা বাক্স দেখালেন নরিস। 'এগুলোতে কপি করছি আমরা এখন।' এই ধরনের বাক্সই সোয়াপ মিটে রবিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল।

চোখে চোখে তাকাল মুসা আর কিশোর।

'কোয়ার্টার ইঞ্চি রিল আছে এগুলোতে,' নরিস বলতে থাকলেন। 'একটা কোয়ার্টার ইঞ্চি মাস্টার করতে দুটো টোয়েন্টি-ফোর-ট্র্যাক রিল লাগে। প্রতিটি কোয়ার্টার ইঞ্চি মাস্টারে হয় এল-পি রেকর্ডের একটা পাশ। বুঝতে পেরেছ? দুটো রিলে পুরো একটা এল-পি হবে। ওরকম একটা রেকর্ডে একটা ক্যাসেট। কারণটা জানো? এল-পি আর রেকর্ডের স্পীড কম, মাস্টার রিলের স্পীড অনেক বেশি—ফিফটিন আই-পি-এস।'

'সাধারণ ক্যাসেটের স্পীড এর অর্ধেক,' বলল কিশোর, 'জানি। সাড়ে সাত। স্পীড যত কম হয়, শব্দ তত বেশি ঢোকানো যায় তাতে।'

'হ্যাঁ। জানো তাহলে।'

সাদা বাক্সগুলো দেখিয়ে জানতে চাইল কিশোর, 'এগুলোতে রেকর্ড করা

হয়েছে?'

'না বাড়তি রিল রেখে দিই আমরা। হলে একটা আলমারি বোঝাই এই জিনিস দেখতে পাবে। সব ব্ল্যাঙ্ক অ্যামপেক্স টেপ।'

'মাস্টারগুলোতে নিশ্চয় নম্বর দিয়ে রাখেন,' মুসা বলল। 'লিস্ট করে না রাখলে তো ভুলে যাওয়ার কথা।'

'সেটা তো রাখতেই হয়,' একটা ক্লিপবোর্ড দেখালেন নরিস। 'মাস্টারগুলো সব কোথায় আছে, তা-ও জানি। জানতে হয়।'

'চুরিটুরি হয় না?' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব নিরীহ করে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মানে, কিছুদিনের মধ্যে হয়েছে নাকি?'

'না।'

একটা ভুরু উঁচু করল মুসা। হয় চুরির ব্যাপারটা জানা নেই ইঞ্জিনিয়ারের, নয়তো মিথ্যে কথা বলছেন।

সারাটা সকাল কাজ করল মুসা আর কিশোর। ডাক নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে পা ব্যথা করে ফেলল মুসা। বসে থাকার উপায় নেই। সারাক্ষণই তার পেছনে লেগে আছে মেইলরুমের ইনচার্জ—এটা দিয়ে এসো, ওটা দিয়ে এসো—হুকুমের পর হুকুম। একটু নড়চড় হলেই ধমক।

কিশোরের কাজ ফোন ধরা, এটা-ওটা এগিয়ে দেয়া, কফি তৈরি করা। যে আশায় ছিল—সাউন্ড রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে দেয়া হবে, তাতে গুড়ে বালি, কাছেও ঘেঁষতে দেয়া হলো না তাকে। তার ইলেকট্রনিক জ্ঞান নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না কেউ।

লাঞ্চের আগ অবধি খেটেই মরল কেবল দুই গোয়েন্দা, ছোট্ট একটা সূত্রও বের করতে পারল না যেটা দিয়ে রহস্যের কিনারা করতে সামান্যতম সাহায্য হবে। খিদেয় মোচড় দিচ্ছে পেট। ইয়ার্ডে খাটার চেয়েও মিউজিক কোম্পানিতে খাটুনি অনেক বেশি মনে হলো ওদের।

স্টুডিওতে বসেই নরিসের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেল কিশোর।

অফিসে বসে খাওয়া সহ্য হবে না মুসার, বুঝতে পেরেই মাটির তলার জানালা-বিহীন ঘরটা থেকে পালাল। পার্কিং লটের কাছে পাতা পিকনিক টেবিলে গিয়ে বসল ডোনার আর অন্য কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে।

প্রায় আধ কে-জি ওজনের স্যান্ডউইচের অর্ধেকটা সাবাড় করে দিল চোখের পলকে। হাঁ করে আবার কামড় বসাতে যাবে, এই সময় চোখ পড়ল লাল গাড়িটার ওপর। পার্কিং লটে ধীরে ধীরে চলছে একটা ফোর্ড পিন্টো।

থমকে গেল তার হাত। তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে। এই গাড়িটাই দেখেছিল, রবিনদের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে এটাতেই চড়েছিল সোনালি চুল লোকটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। আরও অনেকে খেতে বসেছে তার আশেপাশে, তার এই আচরণ যে ওদের চোখে পড়বে, এ কথাটা ভুলেই গেল।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল ডোনার।

ড্রাইভিং সীটের জানালা দিয়ে মুখ বের করল একজন লোক। সেই সোনালি চুল চোরটাই! মুসার ওপর চোখ পড়তেই সে-ও চিনে ফেলল তাকে, চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর।

বেরোনোর জন্যে লটের মুখের দিকে ছুটল গাড়িটা। পালাতে চায়।

এগারো

গাড়িটার পেছনে দৌড় দিল মুসা।

'মুসা!' পেছনে শোনা গেল ডোনারের চিৎকার, 'কি হয়েছে!'

কিন্তু জবাব দেয়ার সময় নেই মুসার। হাতে অনেক উঁচু করে একগাদা রিলের ক্যান নিয়ে যে একজন টেকনিশিয়ান হেঁটে আসছে, তা-ও চোখে পড়ল না। চোখের সামনে ক্যানগুলো থাকায় লোকটাও দেখতে পেল না তাকে।

'আরে আরে, ফেলবে তো!' চিৎকার করে উঠল ডোনার।

দেরি করে ফেলেছে বলতে। দড়াম করে গিয়ে লোকটার গায়ে বাড়ি খেল মুসা, ঝনাৎ করে অ্যাসফল্ট বাঁধানো মেঝেতে পড়ল ক্যানগুলো, গড়াতে শুরু করল।

মুসাও পড়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল। মনে হলো, শরীরের একটা হাড্ডিও আর আস্ত নেই। এত লোকের সামনে এ ভাবে পড়ে যাওয়ায় লজ্জা লাগছে। হাসির ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু এত কিছু ঘটল যে গাড়িটার জন্যে, সেটা উধাও।

মুসার পাশে এসে বসল ডোনার, 'ব্যথা পেয়েছ?'

'নাহ্,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'গাধা বনেছি!'

হাসল ডোনার। 'সার্কাসে কাজ নাওগে। ভাল ভাঁড় সাজতে পারবে।'

মুখ বাঁকাল মুসা, নিজের ওপর বিরক্তিতে। উঠে দাঁড়াল। টেকনিশিয়ানের ক্যানগুলো কুড়িয়ে দিতে সাহায্য করল সে আর ডোনার। একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তাতে ক্যানগুলো তুলতে নিয়ে যাচ্ছিল টেকনিশিয়ান।

খাওয়া সারার জন্যে টেবিলে ফিরে এল দু-জনে।

'এ রকম করলে কেন?' জানতে চাইল ডোনার।

'আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল,' বানিয়ে বলে দিল মুসা। 'এখন দেখলেই পালায়।'

'তাই নাকি? বাপরে বাপ, দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে জিন্দেগীতে কখনও তোমার কাছে টাকা ধার চাইব না আমি, যে ভাবে আদায় করতে ছোটো।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল ডোনার।

মনে মনে নিজেকে এক কুড়ি একটা লাথি লাগাল মুসা। এই গাধামিটা

করে সোনালি চুল লোকটাকে কেউ চেনে কিনা এখন জিজ্ঞেস করার সেই সুযোগটাও হারাল। প্রশ্নটা খচখচ করতে লাগল তার মনে—লোকটা কি মিউজিশিয়ানেই কাজ করে?

ববিকে নিয়ে রকি বীচ জেনারেল হাসপাতালে যাওয়ার সময় রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল রবিনের। পেছনে পুরানো একটা ঝরঝরে সাদা ড টসান বি২১০কে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল বলে মনে হলো। কিন্তু এই এলাকায় কয়েকশো সাদা গাড়ি আছে ওরকম, কয়েক হাজারও হতে পারে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, মনকে বোঝাল সে। কিন্তু বুঝতে চাইল না মন। রাতে পিছু নিয়েছিল যে গাড়িটা, লোকেরা পিস্তল নিয়ে বসে ছিল, সেটা পিছু নিলে ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে।

'বার বার অমন পেছনে তাকাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করে বসল ববি।

'এগজস্ট,' দ্রুত ভাবনা চলেছে রবিনের মাথায়, মেয়েটাকে এ সব বলা যাবে না, 'খুব ট্রাবল দেয় গাড়িটার এগজস্ট। তাকাতে তাকাতে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, গোলমাল না করলেও তাকাই।' হাসপাতালের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল সে। 'এসে গেছি।'

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল ববি। প্রায় ছুটে চলল প্রবেশ মুখের দিকে।

রবিন তার চেয়ে ধীরে এগোল, পেছনে নজর রাখতে রাখতে। পার্কিং লটের পাশ দিয়ে চলে গেল একটা সাদা ডাটসান। ওইটাই? না, ওটা নয়—নিজেকে বলল সে। হাসাপাতালে ঢুকল।

রিসিপশনিস্টের কাছে পৌঁছে ববিকে বলতে শুনল, 'থ্যাংকস।'

ঘুরে তাকাতেই তাকে দেখে ফেলল ববি। 'চলো। রুম নম্বর ছয়শো তেইশ।' এলিভেটরের দিকে এগোল সে।

এলিভেটরে ঢুকে ছয়তলার বোতাম টিপে দিল। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'পাগলের ওয়ার্ডে পাঠাল কেন বুঝতে পারছি না!'

'মানসিক রোগী মনে হয় আপনার?'

'হয় না। তবে মাঝে মাঝে ওরকম আচরণ করে বটে। যারা তাকে চেনে না, পাগলই ভেবে বসবে। অথচ লোক সে খারাপ না।'

ওরা ছয়শো তেইশ নম্বরে ঢুকে দেখল, বিছানায় বসে আইসক্রীম খাচ্ছে জ্যাক। বাদামের কুচি আর ক্রীম দেয়া ভ্যানিলা আইসক্রীম।

ওদের ওপর চোখ পড়তেই বদলে গেল জ্যাকের চেহারা। ভাবল, রবিনরা তাকে দেখেনি। চট করে হাতের আইসক্রীমটা টেবিলের ট্রে-তে ফেলে দিয়ে বালিশের ওপর চিত হয়ে পড়ল। করুণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। যেন কত কষ্ট, আহা!

বিছানার কাছে এসে নাক কুঁচকে ফেলল ববি। জ্যাককে মোটেও অসুস্থ লাগল না তার কাছে।

'কি অবস্থা, জ্যাক?' জানতে চাইল রবিন।

'আমি কি করে বলব? ডাক্তাররা কিছু বলে নাকি? কে জানাবে আমাকে, কি হয়েছে আমার?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের। এ রকম করে কথা বলছে কেন?

আরেক দিকে মুখ ফেরাল ববি। সে ভেবেছিল খারাপ কিছু ঘটেছে। এখন সে-সব কিছু না দেখে স্বস্তি যেমন পেয়েছে, মেজাজও খারাপ লাগছে জ্যাকের ওপর।

'অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন নাকি?' আবার প্রশ্ন করল রবিন। 'ব্যাথা পেয়েছেন? খুব অসুস্থ?'

মাথা নাড়ল জ্যাক। তাকিয়ে রইল নিজের হাতের দিকে। ডান আঙুলের নখগুলো লম্বা লম্বা। গিটার বাজানোর সুবিধের জন্যে এ রকম করে রেখেছে।

'আসলে, দুর্ঘটনা নিয়ে একটা নতুন গান লেখার চেষ্টা করছি আমি। পৃথিবীতে সবই তো অ্যাক্সিডেন্ট; জন্মানোটাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমার কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

ববির দিকে তাকাল রবিন।

শ্রাগ করল ববি।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে রবিন। লোকটার মাথার স্থিরতা সম্পর্কে সন্দেহ হতে লাগল তার।

'ব্যথা পাননি, অসুস্থ নন, তাহলে হাসপাতালে কেন? অ্যাক্সিডেন্টের অভিজ্ঞতা এখানে কোথায় পাবেন? সেটা পেতে হলে আপনার নিজেকে অ্যাক্সিডেন্ট করে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে হবে।'

আপনমনে গুনগুন করে গান ধরল জ্যাক। হাসপাতালের সাদা বিছানায় আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে শুরু করল।

'এ সব বন্ধ করো, জ্যাক!' আর সহ্য করতে না পেরে ধমকে উঠল ববি। 'তোমার পাগলামি অনেক দেখা আছে! আসলে কেন এসেছ এখানে, সেই কথাটা বলো!'

'আমি ইচ্ছে করে এসেছি নাকি? বাড়িওলি দিল হাসপাতালে ফোন করে, আমি নাকি পাগলামি করছি, ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এল। ডাক্তার বলে গেল আমার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। সোজা কথা, গিনিপিগ বানাবে। কত হাতে-পায়ে ধরলাম, কত রকম অসুবিধের কথা বললাম—মাথাধরা, পেটব্যথা, আঙুলে খিঁচ···কোনটাই বিশ্বাস করে না। যতই বলি, কপাল আরও কুঁচকে যায় ডাক্তারের···' হাতের আঙুল আবার চোখের সামনে নিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল জ্যাক।

ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ববি। তারপর মাথা ঝাঁকাল ধীরে ধীরে। ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। এলেনার কোন খবর শুনে শক পেয়েছিল জ্যাক, উদভ্রান্ত আচরণ করছিল। বাড়িওলির দেখে সন্দেহ হয়, দিয়েছে হাসপাতালে ফোন করে। 'হুঁ, বুঝেছি, তোমার কানটা ধরে মুচড়ে দিয়ে গেছে ও।' রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বোঝোনি? এলেনা গিলবার্ট।'

জ্যাকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি করেছে ও? বুড়ো-হাবড়া কোটিপতি দেখে তার গলায় ঝুলে পড়েছে? সত্যি কথা বলো আমাকে।'

চুপ করে রইল জ্যাক।

ববি বলল, 'দেখো, জ্যাক, আমার দিকে তাকাও। শোনো। ওকে নিয়ে অত ভাবাভাবির কিছু নেই তোমার। ও তোমার পায়ের নখের যোগ্য নয়। তোমার ট্যালেন্টের ছিটেফোঁটাও নেই ওর মধ্যে। গেছে ভাল হয়েছে। জানে বাঁচলে।'

তবু চুপ করে আছে জ্যাক। তবে মুখের ভাব আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। উজ্জ্বল হচ্ছে।

তুফান চলছে যেন রবিনের মাথায়। গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারারসদের প্রধান গিটার বাদকই যদি হাসপাতালে পড়ে থাকে, তাহলে দলটা শেষ। প্রতিযোগিতায় জেতা দূরের কথা, হেরে ভূত হয়ে যাবে। লজের মনের অবস্থা কি হবে ভেবে মায়া লাগল তার।

'চুপ করে আছ কেন?' জিজ্ঞেস করল ববি, 'জবাব দাও। কার সঙ্গে পালিয়েছে এলেনা?'

ববির দিকে তাকিয়ে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল জ্যাক, 'রেড বিউগলের কীবোর্ডিস্টের সঙ্গে, মন্টিরেতে চলে গেছে।'

'আর ওরকম একটা মেয়েমানুষের জন্যে ছাগলামি-পাগলামি করছিলে তুমি ঘরের মধ্যে!' মুখ বাঁকাল ববি। 'ভাল করেছে। আগে জানলে আসতামই না এখানে। ডাক্তাররা তোমাকে পাগল ভেবে ধরে ধরে কারেন্টের শক দিত যদি, তখন গিয়ে শিক্ষা হত।...দাঁড়াও, আমিও একদিন কারও সঙ্গে পালাব। তোমার জ্বালাতন থেকে বাঁচতে হলে আর কোন উপায় নেই আমার।'

ভুরু কুঁচকে গেল জ্যাকের। উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল রবিন। আশার আলো দেখতে পেল। তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে মনে হচ্ছে গিটারিস্টকে, কারণ সে এখনও ববিকে ভালবাসে। তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বেলে দিতে হবে। তাতে একঢিলে দুই পাখি মারাও সম্ভব হতে পারে। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

ববির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে। বলল, 'আপনারও তো যাওয়া ঠিকই হয়ে আছে, বললেন না কাল? ওই যে, হুবার্ট না কি যেন বললেন নাম?'

বিস্ময় ফুটল ববির চোখের তারায়। রবিনের চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে বুঝে ফেলল হঠাৎ। হাসল।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল জ্যাক। 'কার সঙ্গে?'

'হুবার্ট। কোটিপতির একমাত্র ছেলে। ববিকে বিয়ে করার জন্যে পাগল।'

'দেখো ববি, এটা তোমার উচিত হচ্ছে না,' জ্যাক বলল। 'আমি এখনও...'

'তোমার কোন কথা আর শুনছি না আমি। তোমাকে বিশ্বাস করার আর প্রশ্নই ওঠে না। আমি চলে যাব।'

'আমি তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম!'

'করতে বলেছ, করেছি। আর করব না। তুমি গিয়ে ভিড়বে যত্তসব আজেবাজে মেয়ের সঙ্গে, যা ইচ্ছে করে বেড়াবে, আর আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকব, এ হতে পারে না।'

চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া দেখে ঘুরে তাকাল রবিন। বারডি আর টোগোরফ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। একজনের লম্বা চুল, আরেকজনের কামানো মাথা, সাদা করিডরের পটভূমিতে বিচিত্র লাগছে। হাসিমুখে জ্যাক আর ববির ঝগড়া দেখছে ওরা।

মাথা নাড়তে নাড়তে জ্যাক বলল, 'দেখো, আমার যদি কাউকে পছন্দ হয়, তাকে আমি বিয়ে করি, তোমার আপত্তি থাকার কথা নয়।'

'আমার চেয়ে ভাল হলে কে আপত্তি করত? বাছো তো গিয়ে এমন কতগুলো...' কথাটা শেষ করল না ববি। ঘৃণায় নাক বাঁকাল।

'ভালটাই বাছব এখন।'

ভুরু কুঁচকে জ্যাকের দিকে তাকাল ববি। 'গিয়েও সারতে পারল না একজন, এরমধ্যেই জোগাড় করে ফেলেছ নাকি আরেকটা?'

'জোগাড় হয়েই আছে,' হাসিমুখে বলল জ্যাক। 'সে এখন আবার এনগেজমেন্ট করতে রাজি হলেই হয়।'

'কার কথা বলছ...' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুঝে ফেলল ববি। লাল হয়ে যাচ্ছে গাল।

হাসল জ্যাক। 'তোমার মত আর কেউ নয় আমার কাছে। কাউকে এত ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে কথাটা ভুলে যাই। দেখো, কোটিপতির ছেলেরা ভাল হয় না। ভুলে যাও তার কথা। আমরা দু-জনে একসঙ্গে থাকলে সঙ্গীতের জগতে ঝড় তুলে দিতে পারব।'

মুচকি হাসল রবিন।

ববি বলল, 'তোমাকে আর বিশ্বাস করি না আমি।'

'আরেকবার করে দেখো, প্লীজ!'

দরজার কাছ থেকে গান গেয়ে উঠল টনি, 'হে! হে! হে! হে!' করে। পেছনে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তালে তালে তালি বাজিয়ে এগিলে এল টোগোরফ। উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে তার শেভ করা খুলি। দু-জনে মিলে একটানে বিছানা থেকে তুলে মাটিতে নামাল জ্যাককে। ববির পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গান গাইতে গাইতে দু-জনকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল।

হেসে বলল রবিন, 'খালিমুখে এ সব জমে না।'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল জ্যাক, 'কে থাকতে বলে খালিমুখে? চলো, বার্গার খাওয়াব। আরও যা যা খেতে চাও সব খাওয়াব।' ট্রে-তে রাখা আইসক্রীমটার ওপর চোখ পড়ল তার। অনেকটা গলে গেছে। ওটাই নিয়ে খেতে শুরু করল আবার।

নিজের ধূসর পোশাকের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল ববি, 'সর্বনাশ, এই মরা মানুষের পোশাক পরে যাব! বদলে নিতে হবে!'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' জ্যাক বলল। আর এক মুহূর্তের জন্যে একা ছাড়তে রাজি নয় ববিকে, অন্তত এ রাতে তো নয়ই। ভাল ভয় তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে রবিন।

দার্শনিক তত্ত্ব ঝাড়ল টোগোরফ, 'জীবনটাই পরিবর্তনশীল, ক্ষণে ক্ষণে বদলায়।'

হাসতে হাসতে রবিন বলল, 'আমাকে এখন যেতে হবে। অনেক কাজ আছে। আজ আপনাদের খাওয়ায় শরীক হতে পারলাম না, সরি। লজের কথাটা আমিই বলে দিই, কাল রাতে প্রতিযোগিতার কথাটা ভুলে যাবেন না। ববি, জ্যাকের খেয়াল রাখবেন।'

চোখ বড় বড় করে রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে টোগোরফ। গাল ফুলিয়ে বলল, 'বাপরে বাপ! বুড়ো দাদা! উপদেশগুলো ঝাড়ছে কি দেখো!'

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্কিং লটের দিকে চলল রবিন। মনের ভার নেমে গেছে। দুশ্চিন্তা নেই আর। লজ ফিরলে যা খুশি হবেন না এখন!

দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকেই মেঝেতে একটা চকচকে জিনিস পড়ে থাকতে দেখল সে। নিচু হয়ে তুলে নিল। একটা মেডেলের মত জিনিস, রূপার তৈরি, তাতে বুদ্ধের ছবি খোদাই করা। এটা এল কোত্থেকে? কারও পকেট থেকে পড়েছে। তার নয়। তাহলে? ববির?

না-কি অন্য কারও! গাড়ির ভেতরটায় ভাল করে তাকাতেই মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল তার। ম্যাগাজিন, দৌড়ানোর পোশাক, খালি একটা পিজার বাক্স, আর একজোড়া স্নীকার পড়ে আছে ছড়িয়ে। সে এ ভাবে ফেলে যায়নি। তারমানে খোঁজা হয়েছে গাড়ির ভেতর!

পার্কিং লটে নজর বোলাল। সাদা ডাটসান, হলুদ হোন্ডা, লাল পিন্টো, কিংবা কোন নীল ডজ ভ্যান চোখে পড়ল না। ইগনিশনে মোচড় দিল সে। পালানো দরকার এখান থেকে। লোকগুলোকে বিশ্বাস নেই, কখন কি করে বসবে কে জানে!

বারো

পথে যানবাহনের ওপর কড়া নজর রেখেছে রবিন। অফিসে ফিরে চলেছে। অফিসে ফিরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। বাড়ি ফেরার সময়, এবং তারপর কিশোরের কাছে যাওয়ার সময়ও একই রকম সতর্ক রইল।

মনে হচ্ছে, যেন হাজার জোড়া চোখ শুধু তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে নিজে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অস্বস্তিকর অনুভূতি।

'এটা গাড়ির মেঝেতে পড়ে ছিল,' সন্ধ্যায় ওঅর্কশপে বসে কিশোর আর মুসাকে জানাল সে। 'দেখো, ছিদ্রটা, যেখান দিয়ে চেন ঢোকানো হয়,' মেডেলটা কিশোরের হাতে দিল সে। 'গাড়িতে কে খোঁজাখুঁজি করেছে দেখিনি। পিছে আসতে দেখিনি।'

'দেখোনি বলেই যে আসেনি, এটা মনে করার কোন কারণ নেই,' মুসা বলল।

'কি জানি।'

চুপ করে কিশোর কি করছে দেখতে লাগল দু-জনে। মণিকারের মনোযোগ নিয়ে মেডেলটা পরীক্ষা করছে সে।

'বিপজ্জনক পরিস্থিতি,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর। বড় মুদ্রা আকারের জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। 'চেনটা দেখেছ, যেটাতে ঝোলানো ছিল?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না।'

'আচ্ছা, হাসপাতালে গিয়েছিলে ক-টার সময়?' জানতে চাইল মুসা।

'লাঞ্চের সময়। কেন?'

'সোনালি চুল লোকটাকে তাহলে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারো। তোমার গাড়িতে সে তল্লাশি চালায়নি। ওই সময় সে ছিল মিউজিশিয়ানের পার্কিং লটে।' লোকটাকে যে তাড়া করেছিল, রবিনকে বলল মুসা।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'বাকিটা বললে না? ক্যানওয়ালার সঙ্গে যে সংঘর্ষ বাধিয়েছিলে?'

চুপ করে রইল মুসা।

'জানো,' হাসতে হাসতে রবিনকে বলল কিশোর, 'এমন পড়া পড়ল, হেসে অস্থির সবাই। ভাঁড়ের মত নাকি লাগছিল তখন আমাদের বডি বিল্ডার সাহেবকে। আমি আর তুমি পড়লেও নাহয় এককথা ছিল...হাহ্, হাহ্!'

আরেক দিকে মুখ ফেরাল মুসা।

'তারপর?' জানতে চাইল রবিন।

'তারপর আর কি?' জবাবটা কিশোরই দিল, 'ছড়িয়ে গেল সমস্ত ক্যান। মুসা চিত। এই সুযোগে পালাল লোকটা।' মেডেলটা মুসার দিকে ছুঁড়ে দিল সে, 'দেখো, কিছু বুঝতে পারো কিনা?'

পারল না মুসা।

কিশোর বলল, 'লেখাটেখা নেই, প্রাচীন না আধুনিক বোঝা যাচ্ছে না। একপাশে বুদ্ধের ছবি খোদাই। এশিয়াতেই বুদ্ধের অনুসারী বেশি। তার মানে ধরেই নেয়া যায়, গাড়িটাতে যে তল্লাশি চালিয়েছে সে বুদ্ধধর্মে বিশ্বাসী।'

'তা হতে পারে,' একমত হলো রবিন। 'যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক, ঘাড় থেকে ওকে এখন নামাতে পারলে বাঁচি। কোন ভাবে বোঝানো দরকার, আমার কাছে টেপগুলো নেই।'

হঠাৎ তীব্র আলো পড়ল ইয়ার্ডের চত্বরে। চমকে উঠল তিন গোয়েন্দা।

হাঁ হয়ে খুলে গেছে গেট। কি করে খুলল? ইলেকট্রনিক সিসটেমে খোলে এখন গেট, আর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ভেতরে।

হেডলাইট জেলে এগিয়ে আসতে লাগল গাড়িটা। লম্বা, চকচকে একটা রোলস রয়েস।

'খাইছে, সিলভার শেডো! সাংঘাতিক দামী গাড়ি!' বিড়বিড় করল মুসা। অবাক হয়ে ভাবছে, গাড়িটা এখানে ঢুকল কেন?

আরও এগোল গাড়িটা। থামল। ইঞ্জিনের মৃদু, মোলায়েম গুঞ্জন বন্ধ হলো। খুলে গেল ড্রাইভারের পাশের দরজা। লাফিয়ে নামল নিকি পাঞ্চ।

আরও অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

'এই যে আছ সবাই,' হেসে বলল নিকি। 'এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন।'

সামনের দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে দিল নিকি। সেখানে আরেকটা চমক অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দার জন্যে। নেমে এল অসাধারণ সুন্দরী, লাল চুলওয়ালা এক তরুণী। চোখ ঝলসানো পোশাক পরনে, পায়ে সুপার-হাই হিল জুতো। দামী দামী ম্যাগাজিনে মডেল হয় যে সব রূপসীরা, এরও তেমনি চেহারা। তার পাশে দাঁড়ানো তেলকালি মাখা পুরানো জিনসের পোশাকে নিকিকে অসম্ভব নোংরা লাগছে।

'এর সঙ্গে খাতির করলে পস্তাতে হবে নিকিকে,' নিচু স্বরে বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন আর কিশোর।

নিকির দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা, চিকচিক করে উঠল তার লিপস্টিক, 'এরা তোমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ। ওর নাম ডায়না,' তিন গোয়েন্দাকে বলল নিকি। 'হাত মেলাও।'

হাত বাড়িয়ে দিল রবিন, 'রবিন মিলফোর্ড।'

সবার পরে হাত মেলাল কিশোর।

ডায়না বলল, 'নিশ্চয় ভাবছ, নিকির সঙ্গে পরিচয় হলো কি করে আমার? কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে পার্টিতে যাচ্ছিলাম, মাঝপথে গেল গাড়ি খারাপ হয়ে।'

এক এক করে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল মেয়েটা।

'আমার ভাগ্য ভাল ওখান দিয়ে যাচ্ছিল তখন নিকি। সাহায্য করতে এগিয়ে এল। গাড়িটা মেরামত করে দিল। পার্টিতে নিয়ে গেল। শুধু তাই না, পথে আবার যদি কোন গোলমাল করে, সে-জন্যে নিজের গাড়ি ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে এসেছে রকি বীচে, বাড়ি পৌছে দেয়ার জন্যে। নিজেকে আমি মোটেও দুর্বল ভাবি না, কিন্তু গাড়ির ব্যাপারে একেবারে মূর্খ। কিচ্ছু বুঝি না।'

'কিছুই হয়নি,' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল নিকি। 'একটা হোস ফেটে দিয়েছিল। আমার গাড়ি থেকে খুলে লাগিয়ে দিয়েছি।'

'আবারও এককোটি ধন্যবাদ তোমাকে,' ডায়না বলল। 'আজকাল কেউ কারও উপকার করতে চায় না। তুমি করেছ। হ্যাঁ, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে ি

কথা বলবে, বলো। আমি গাড়িতে বসছি। সিয়াও, ফ্রেন্ডস,' তিন গোয়েন্দাকে আবার একটা চকচকে হাসি উপহার দিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল সে।

নিকিকে ঘিরে প্রায় এসকর্ট করে তাকে ওঅর্কশপে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'দুর্দান্ত মডেল হবে,' রবিন বলল।

'দারুণ গাড়ি,' মুসা বলল।

'ব্যাপারটা কি, নিকিভাই?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি বলবে?'

'রবিন, তোমার জন্যে খবর আছে,' নিকি বলল। 'টেপ পাইরেটদের ব্যাপারে।'

'কি জেনেছ?'

'বেশি কিছু না। তবে হয়তো কাজে লাগতে পারে। অনেক বড় রাঘব বোয়ালদের একজন জড়িত হয়েছে এই টেপ ডাকাতির ব্যবসায়। তার নাম জানতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেছি। কেউ ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। তারমানে প্রভাব-প্রতিপত্তি ভালই আছে লোকটার।'

'হুঁ। আর?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে অপারেশন চালাচ্ছে সে। আরও বড় আরও ধনী হচ্ছে। এতটাই দুঃসাহস, কোন্ কোন্ টেপ পাইরেসি করছে তারও একটা তালিকা বের করে দিয়েছে। এক হাজারের বেশি ক্যাসেটের লিস্ট। ছোটখাট টেপ পাইরেট অনেকই আছে এই এলাকায়, কিন্তু সব চুনোপুঁটি, তার ধারেকাছে যাওয়ার ক্ষমতা নেই কারও। সাধারণ টেপের দিকে ফিরেও তাকায় না এই লোকটা, খুব চালু আর নতুনগুলোকেই বেছে নেয়। এমনও হয়েছে, রেকর্ড কোম্পানি বের করার আগেই সে বের করে দিয়ে বসে আছে।'

'তারমানে মাস্টার টেপ হাতিয়ে নিয়ে করছে এ কাজ,' আনমনে বলল কিশোর। 'কোম্পানিতে তার গুপ্তচর আছে। যারা তাকে জানিয়ে দিচ্ছে, এরপর কোনটা আসছে।'

'হ্যাঁ।'

'চুনোপুঁটিগুলোর ব্যাপারে কি কি জানো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ওরা একেবারেই ছেঁচড়া চোর। বাজার থেকে মোটামুটি ভাল ক্যাসেট কিনে নিয়ে সেগুলো থেকে কপি করে চুরি-চামারি করে বিক্রি করে ফুটপাথে, স্কুলের সামনে, সোয়াপ মিট, ফ্লী মার্কেট, এ সব জায়গায়।'

'কোনও এশিয়ান আছে ওদের মধ্যে?'

'আছে। বেশির ভাগই থাইল্যান্ডের লোক। এখন তো এশিয়ান অপরাধীদের জন্যে ব্যাংকক হলো একটা স্বর্গ। ওখান থেকে আমেরিকাতে আসে।'

'নকল ক্যাসেটগুলো ব্যাংকক থেকে আমদানী করে না তো?'

'করতে পারে। ওখানে এ সব জিনিসপত্রের দাম এতই কম, অবিশ্বাস্য।

আমেরিকায় সেই তুলনায় দাম অনেক বেশি। চোরাচালান হয়ে আসতেই পারে।'

'দাঁড়াও, আসছি,' বলেই সেখান থেকে সরে গেল কিশোর, হেডকোয়ার্টারে ঢুকল।

'বহু বছর ধরে চলছে এই টেপ পাইরেসি,' মুসা আর রবিনকে বলল নিকি। কিশোরের রহস্যময় অন্তর্ধানে একটুও অবাক হয়নি, এরকম করেই থাকে সে। 'আমার এক বন্ধু আছে, পুরানো বিট্‌ল্‌ ব্যান্ডের টেপ পাইরেসি করত সেই ষাটের দশকেই। মাস্টার টেপ থেকে করত। বিট্‌ল্‌রা শেষে বাধ্য হয়ে তাদের রেকর্ডিং করা টেপে খানিকটা পরিবর্তন করে দিত, হয়তো গিটার একটু অন্য রকম করে দিল, কিংবা বীট বাড়িয়ে দিল...তাতে পাইরেসি করা টেপ আর আসল টেপের তফাৎ ধরা পড়ত, তবে সবার কাছে নয়।'

'তাজ্জব ব্যাপার!' এই টেপ জালিয়াতির কাহিনী শুনতে বেশ ভাল লাগছে মুসার।

'এই যে, এনেছি,' ঘোষণা করল কিশোর, নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে ট্রেলার থেকে। হাতে একটা খোলা ওঅর্ল্ড অ্যালম্যানাক। 'এতে লেখা আছে থাইল্যান্ডের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লোক বুদ্ধ-ধর্মে বিশ্বাসী।'

ঘাবড়ে গেল নিকি, বুঝে ফেলল কিশোরের লেকচার শুরু হতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'তাই নাকি? সাংঘাতিক কাণ্ড!' কেউ বুদ্ধের অনুসারী হলে যে 'সাংঘাতিক কাণ্ডটা' কোথায়, বোঝেনি। 'আমি যাই। ডায়না বসে আছে। তাড়া আছে ওর।'

রোলস রয়েস নিয়ে পালাল নিকি।

'বুঝলাম না,' সেদিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর।

'কি বলছ আমিও বুঝলাম না,' মুসা বলল।

'বলছি, নিকিভাইয়ের মত মানুষ হয় না। কিন্তু ওরকম একটা মডেল কন্যার সঙ্গে জড়াল কি করে? আর মেয়েটাই বা তাকে পছন্দ করে কি ভাবে?'

'এই ধরনের বাউণ্ডুলে বুনো স্বভাবের পুরুষগুলোর দিকেই বেশি ঝোঁকে মেয়েরা,' জ্ঞান বিতরণ করল রবিন, 'সিনেমায় দেখোনি?'

'ও সব অবাস্তব গল্প,' মুসা বলল।

'ফালতু কথা বাদ দাও,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর।

ওঅর্কশপে আবার আগের জায়গায় বসল তিনজনে।

'এখন তো মনে হচ্ছে,' রবিন বলল, 'সোয়াপ মিটের ওই ঠকবাজ দোকানদার থাইল্যান্ডের লোক। গালকাটা লোকটাও।'

'আমারও তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'প্ল্যান করার সময় এসেছে।'

'চোরগুলোকে ধরার প্ল্যান?'

'হ্যাঁ। যে টেপগুলো পেয়েছ তার সঙ্গে ওই রাঘব পাইরেটের কোন সম্পর্ক আছে, নিকিভাই যার কথা বলে গেল। কারণ খুব ভাল জিনিস ছাড়া

নেয় না সে। তোমার টেপগুলো হাইকোয়ালিটি। কিন্তু এর সঙ্গে সোয়াপ মিটে ঝগড়া-বাঁধানো দলদুটোর কি যোগাযোগ বুঝতে পারছি না। ধরে নেয়া যাক, দোকানদার আর গালকাটা লোকটা থাইল্যান্ডের লোক। সোনালি চুলওয়ালা লোকটার সঙ্গে যে ছিল সে-ও থাই। থাইয়ের সঙ্গে থাইয়ের সম্পর্ক আছে, ধরে নিলাম একই দেশের লোক বলে। কিন্তু একজন আমেরিকানের সঙ্গে হাত মেলাল কেন আরেকজন থাই?'

'ভাগে বনেনি হয়তো,' সহজ জবাব দিয়ে দিল মুসা। 'দেখলেই লেগে যায় ঝগড়া। সেদিন রাতেও তো গাড়িতে করে এসে গুঁতোগুঁতি শুরু করল।'

তার কথাকে গুরুত্ব দিল না কিশোর। 'মনে হচ্ছে দুই দলই মাস্টার টেপগুলো চায়। কিন্তু রেষারেষি থাকলেও দুই দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ তো আছে, সেটা কি?'

'ওই যে কথায় বলে না *থাইজ আর টাইজ*,' ফোড়ন কাটল মুসা। 'থাইরা সব এক।'

ওর হাতে থাবা মারল রবিন, 'আহ্, থামো তো!'

'না না, আমি ঠাট্টা করছি না। ওরা একই দলের লোক ছিল হয়তো, এখন কোন কারণে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। যেতে পারে না?'

'পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর 'লস অ্যাঞ্জেলেসে অনেক থাই আছে। বিশাল কলোনি ওদের। ইমিগ্রেন্ট করে অন্যদেশ থেকে যত বিদেশী এসেছে, তাদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে পরিশ্রমী এই থাইরাই। কলোনিতে সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ থাকাটা স্বাভাবিক। কথাও গোপন থাকে না নিশ্চয়। কয়েক জন লোক টেপ পাইরেসি করছিল আরও কয়েকজন ভাবল, টাকা রোজগারের এত সহজ পথ থাকতে আমরাই বা বসে থাকি কেন?'

'কিংবা রাঘব বোয়ালের সঙ্গে গিয়ে হাত মিলিয়েছে সবাই,' রবিন বলল, 'নিরাপত্তার জন্যে। টাকা তো আছেই!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। কুঁচকে গেল কপাল। 'আমি কি ভাবছি শোনো। দুটো দলই হয়তো চাইছে গন টু হেভেন হাতিয়ে নিতে। চেষ্টা কম করছে না, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেনি এখনও। এখন আবার নজর দেবে মিউজিশিয়ানের দিকে। ভাববে, একবার যখন ওখান থেকে কপি চুরি করতে পেরেছে, আবারও পারবে। সুতরাং আবার আমি আর মুসা কাল মিউজিশিয়ানে যাচ্ছি।'

চিঠি বিলি করতে করতে পায়ের ঊরুতে যে ব্যথা হয়ে আছে, এতক্ষণে মনে পড়ল যেন মুসার। হাত দিয়ে টিপে ধরে চোখ গোল গোল করে তাকাল কিশোরের দিকে, 'আবার!'

'কেন, তুমি কি ভেবেছিলে একদিনেই চাকরি শেষ হয়ে গেছে?'

চুপ করে রইল মুসা।

রবিন বলল, 'কাল আমি যাব তোমাদের সঙ্গে। অফিসের ঝামেলা মোটামুটি মিটেছে, বাকি যা আছে ফেয়ারিই সামলাতে পারবে। গ্রেট

অ্যাডভেঞ্চারারসরা শান্ত হয়েছে। লজও কালকের ফ্লাইটে চলে আসছেন, প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়ার জন্যে।'

'গুড,' খুশি হলো কিশোর। 'তাহলে কাল আমরা তিনজনেই মিউজিশিয়ানে কাজ করতে যাচ্ছি। শনিবারে সকাল সকাল খোলে ওরা, আর স্টুডিও খোলা থাকে সারা সপ্তাহই। ছুটির দিনগুলোতে ঠিকে লোক দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়।'

'ওখানে গিয়ে আমাদের আসল কাজ হবে নজর রাখা,' রবিন বলল। 'তারপর যেই দেখব কেউ গন টু হেভেন চুরি করছে, অমনি তার কলার চেপে ধরব, এই তো?'

'অবশ্যই। দেখলে কি আর ছাড়ি। কাল তেমন বুঝলে অনেক বেশি সময় ওখানে থাকব আমরা। চোর পাহারা দেব।'

'আর ধরতে পারলে প্রথমেই যে শাস্তিটা দেব আমি,' নাক কুঁচকাল মুসা, 'তা হলো, দুই-দুটো চিঠির বস্তা ঘাড়ে চাপিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি দৌড়াতে বাধ্য করা। রানার হতে কেমন লাগে বুঝুক মজা। ওই শয়তানের জন্যেই আমার এই কষ্ট! আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, এক শর্তে কাল যেতে পারি—গোয়েন্দাগিরি করতে আপত্তি নেই; কিন্তু আমি বাপু আর রানারের কাজ করতে পারব না।'

হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন দু-জনেই। কিশোর বলল, 'দেখা যাক, কাল তোমার ভাগ্যে কি কাজ জোটে।'

'আমি ভয় পাচ্ছি যারা পিছু নেয় তাদেরকে!' অদৃশ্য থেকে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে, কথাটা মনে পড়তেই আবার সেই বিচিত্র অনুভূতিটা ফিরে এল রবিনের।

তেরো

শনিবারের এই সাত-সকালেও রাস্তায় যানবাহনের ভিড় প্রচুর। মনের আনন্দে চলার জো নেই কারও। কেবল একটা জিনিসই বাধা না পেয়ে চলতে পারছে, সেটা মুসার বেল এয়ারের কার রেডিওর বাজনা, মনের আনন্দে সারজিং মাঙকি প্রেপস বাজিয়ে চলেছে।

'খাইছে! দেখো!' দক্ষিণ লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার রাস্তায় বেরিয়ে এসে সামনের দিক দেখিয়ে বলে উঠল মুসা, 'মুক্তি!'

'এইবার গাড়িটাকে গাড়ির মত চালানো যাবে,' রবিনও খুশি হলো।

'তা-ও দেখো,' বিশেষ আশাবাদী হতে পারল না কিশোর, 'পঁয়তিরিশে তুলতে পারো কিনা।'

সামনের সীটে মুসার পাশে বসেছে সে, পেছনের সীটে রবিন। জানালা

দিয়ে খানিক পর পরই পেছনে তাকাচ্ছে। অনেকক্ষণ হলো গাড়িটাকে না দেখে দেখে যখন দুশ্চিন্তা কাটতে আরম্ভ করেছে, ঠিক তখনই উদয় হলো সাদা ডাটসান বি-২১০।

দেখেও কিছু বলল না। আশা করল, ওটা অন্য গাড়ি, সরে চলে যাবে। ওতে আছে সাধারণ মানুষ।

সুতরাং তাকিয়েই রইল। অনেক জায়গায় মরচে দেখা যাচ্ছে গাড়িটার। অস্বাভাবিক কিছু নয়, পুরানো গাড়িতে থাকবেই। ভেতরে দুজন লোক। চেহারা দেখতে পাচ্ছে না।

ডানের একটা লেনে গাড়ি নামাল মুসা। ঠিক পেছনে না থেকে কোণাকোণি অবস্থায় আছে এখন ডাটসানটা। হঠাৎ রবিনের ঘাড়ের রোম খাড়া করে দিল একটা দৃশ্য। গাড়িটার প্যাসেঞ্জার সাইডে বডিতে তিনটে গভীর আঁচড়ের দাগ। ট্রাফিক সার্কেলে গুঁতোগুঁতির কথা মনে পড়ল তার। দুমড়েও গেছে বডির দু-এক জায়গায়।

'এই শোনো,' গলা কাঁপছে রবিনের, 'পিছু নিয়েছে ব্যাটারা!' তার কথা শেষ হতে না হতে একই লেনে নেমে এল ডাটসানটাও। 'তিনটে গাড়ি পেছনে।'

খসানোর চেষ্টা করল না মুসা। মিউজিশিয়ানের পার্কিং লটের গেটে এনে গাড়িটা রাখল এমন করে যাতে আর কোন গাড়ি পাশ কেটে ভেতরে ঢুকতে না পারে। বলল, 'এইবার আসুক ব্যাটারা, দেখি কি করে?'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তিনজনে। গতি অনেক কমিয়ে দিয়েছে ডাটসান। যেন ওদের দেখতে দেখতে আগের লেন ধরে পাশ কাটাতে লাগল। দু-জন পাইরেটকে দেখতে পেল গোয়েন্দারা। রেগেছে যেমন, অবাকও হয়েছে। ওদের অস্তিত্ব যে আর গোপন নেই, ফাঁস হয়ে গেছে, বুঝে ফেলেছে

ঝগড়া করছে যেন দুই পাইরেট। একজন হাত তুলে দেখাল তিন গোয়েন্দার দিকে। অন্যজন মাথা নাড়ল।

'এসো সাহস থাকলে,' হাত নেড়ে ডাকল মুসা। 'কারাতের চটকানা কেমন লাগে খেয়ে যাও।'

তার দিকে তাকাল দু-জনে। রাগ দেখিয়ে মাথা নাড়ল গালকাটা। গাড়ি চালিয়ে এগোল।

তাকিয়ে আছে রবিন। পথের শেষ মাথায় গিয়ে মোড় নিয়ে এগিয়ে আসবে ভেবেছিল গাড়িটা, বলল, 'কই, এল না তো?'

'দেখে ফেলেছি দেখেছেই তো, আর কি আসে,' কিশোর বলল।

মুঠো নাচাল মুসা, 'ধরে একটা আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে দিতে পারতাম যদি, হত!'

'সুযোগ পাবে, অত দুঃখ কোরো না। চলো এখন।'

পার্কিং লটে গাড়িটা ঢুকিয়ে রাখল মুসা। তিনজনে মিলে ঢুকল বিশাল

সাততলা বিল্ডিঙটাতে।

মুসা চলে এল মেইলরুমে। একগাদা চিঠি নিয়ে ডেলিভারি দেয়ার জন্যে উঠে এল পাঁচতলায়। কড়া নজর রাখছে। সোনালি চুলো কিংবা দুই পাইরেটের সঙ্গে কার যোগাযোগ আছে এখানে, ভাবছে।

দোতলায় এসে ঘুরে ঘুরে রবিনকে স্টুডিওটা দেখাল কিশোর। তারপর গন টু হেভেনের যে কোয়ার্টার ইঞ্চি টেপের কপিগুলো করে রেখেছেন নরিস, সেগুলো শুনতে বসল। চোদ্দটা, তারমানে পুরো সাত সেট মাস্টার। টেকনিশিয়ান ইঞ্জিনিয়াররা কাজে ব্যস্ত। তাদের ওপর, একই সঙ্গে টেপগুলোর ওপরও নজর রাখল সে।

লাঞ্চের সময় আজও বাইরে পিকনিক টেবিলে এসে বসল মুসা। রবিন মাটির তলার ঘরে ভেনডিং মেশিনটায় কাজ করছিল, সেখানেই লাঞ্চ প্যাকেট খুলে বসল। কিশোর আগের দিনের মত নরিসের সঙ্গে বসল।

সারা সকালে আরও চারটে টেপে গন টু হেভেন রেকর্ড করেছেন নরিস। গুনে গুনে আঠারোটা টেপ দেয়ালের কাছের তাকে তুলে রেখেছেন।

লাঞ্চ প্যাকেট খুলল কিশোর। রুটি-মাখন আছে, আর গরুর মাংসের বড়া।

নরিসও তাঁর প্যাকেট খুললেন। বের করলেন পাস্টা সালাদ আর চকোলেট মুসি।

কিশোরের খাবারের দিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করে উঠল নরিসের। ঢোক গিলে বললেন, 'আহ্, খুব ভাল জিনিস এনেছ তো!'

অবাক হলো কিশোর, 'কেন, আপনারগুলো ভাল লাগছে না?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন নরিস। 'এই জিনিস খেতে খেতে জিবে চড়া পড়ে গেল। পাস্টা সালাড, দূর! তোমাদের বয়সে আমরা একে বলতাম ম্যাকারোনি, ছুঁয়েও দেখতাম না। আর এই চকোলেট মুসি! বমি আসে! কি করব? স্ত্রী আমার আজকাল ক্রিয়েটিভ কুকিঙে লেসন নিচ্ছেন। সৃষ্টিশীল রান্না! আহা! বড় বড় গালভরা নাম, খাওয়ার বেলায় মুখে তোলার জো নেই। এসব গেলার কষ্টের চেয়ে ভাল জিনিস খেয়ে কোলেস্টেরল আর চর্বি জমিয়ে মরে যাওয়াও ভাল। এই দেখো না, রুটি-মাখন আর মাংসের বড়া কি খারাপ? কত শত শত বছর ধরে চলে আসছে। আজও সমানে খেয়ে যাচ্ছে লোকে। যেটা মজা লাগে সেটাই তো খায় মানুষ।'

হেসে ফেলল কিশোর। 'বুঝতে পারছি, আপনার খেতে ইচ্ছে করছে। পাস্টা সালাদের চেহারাও কিন্তু খারাপ লাগছে না আমার কাছে। আসুন, ভাগাভাগি করে খাই।'

খুব খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেলেন নরিস। পাস্টা সালাদ পুরোটাই দিয়ে দিলেন কিশোরকে। রুটিতে মাখন লাগিয়ে কামড় বসিয়ে বললেন, 'আহ্!' চোখ বুজে আয়েশ করে চিবাতে লাগলেন।

ঘনঘন চামচে করে পাস্টা সালাদ মুখে পুরতে লাগল কিশোর, খাবারটা

খারাপ লাগল না তার কাছে।

খাওয়া শেষ হলে নরিস বললেন, 'এই কাজই করব তাহলে। রোজই খাবার আনব আমরা, ভাগাভাগি করে খাব। কি বলো?'

আবার হাসল কিশোর, 'আচ্ছা।'

'ভরপেট খাওয়া হয়ে গেছে, খালি ঘুম পাবে এখন। কাজ করা যাবে না। চলো, একটু হেঁটে আসি।'

কিশোরের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তাকে রাখা আঠারোটা টেপের দিকে তাকাল আরেকবার। লাঞ্চ প্যাকেট করে আনার কাগজগুলো টেবিল থেকে তুলে দলামোচড়া করে ওয়েস্টবাস্কেটে ফেলে উঠে দাঁড়াল। 'চলুন।'

'বেরোও।' পকেট থেকে চাবি বের করে বললেন নরিস, 'আমি তালা দিয়ে আসি।'

'স্টুডিও সব সময় তালা দিয়ে রাখেন নাকি?'

'ভেতরে কেউ না থাকলে।'

হাঁটতে হাঁটতে কিশোর ভাবছে, সে এখানে কেন কাজ করতে এসেছে সেটা নরিসকে না জানালে ছুটি পাবে না, স্টুডিওর বাইরে কোথাও গিয়ে তদন্ত করতে পারবে না, আটকে থাকতে হবে সারাক্ষণ। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছে না ইঞ্জিনিয়ারকে বিশ্বাস করা যায় কিনা।

আধঘণ্টা পর ফিরে এসে স্টুডিওতে ঢুকেই প্রথমে তাকের ওপর চোখ পড়ল তার। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখের আন্দাজেই বুঝতে পারল, টেপ কম।

গুনে ফেলল তাড়াতাড়ি। ষোলোটা!

'মিস্টার টোবারসন!' বলল সে, 'দুটো টেপ নেই!'

'কি বলছ! তা কি করে হয়?' নরিসও গুনে দেখলেন, 'তাই তো! কমই তো! কে নিল?'

'নেবে কি করে? চাবি তো আপনার কাছে ছিল।'

'ডিপার্টমেন্টের অনেকের কাছেই এ ঘরের চাবি আছে। এক স্টুডিও থেকে আরেক স্টুডিওতে মাঝে মাঝেই যাবার দরকার পড়ে আমাদের। কিন্তু নিল কে সেটা আগে বের করা দরকার। আমাকে জানিয়ে নেয়া উচিত ছিল।'

'চুরি করেছে হয়তো।'

'না, তা করেনি,' টাক চুলকালেন নরিস। 'এখানে কখনও চুরি হয় না, আমি আসার পর অন্তত দেখিনি। কেউ কোন কাজে নিয়েছে। দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে আসি।'

কিশোরকে রেখে পাশের স্টুডিওতে চলে গেলেন তিনি।

পকেট থেকে ওয়াকি-টকি বের করল কিশোর। মুখের কাছে এনে বলল, 'রবিন! মুসা!'

'বলো?' সাড়া দিল মুসা।

'কি হয়েছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'গন টু হেভেনের দুটো টেপ চুরি হয়ে গেছে। পার্কিং লটে দেখা করো। এখান থেকে টেপগুলো বের করে নিয়ে যাওয়ার আগেই চোরটাকে ধরার চেষ্টা করতে হবে।'

তিরিশ সেকেন্ড পরই পার্কিং লটে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা।

কোন গাড়ি নড়তে দেখল না ওরা। চোখে পড়ল না লাল পিন্টো, হলুদ হোন্ডা সিভিক, নীল ডজ ভ্যান, কিংবা সাদা ডাটসান।

'এসো তো দেখি,' বাড়িটার একপাশ ঘুরে সামনের দিকে এগোনোর জন্যে পা বাড়াল মুসা।

প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল তিনজনে।

'ওই যে!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

তিরিশ গজ দূরে সোনালিচুলো লোকটা চকচকে একটা সবুজ করভেটি গাড়িতে চড়ছে। মুখ তুলে তাকাতেই চোখ পড়ল তিন গোয়েন্দার ওপর। তাড়াতাড়ি সীটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

'জলদি এসো!' দৌড় দিল মুসা।

পেছনে ছুটল অন্য দু-জন। আবার বাড়ির পাশ ঘুরে এসে চড়ে বসল মুসার গাড়িতে।

রাস্তায় ওঠার জন্যে গাড়ি ছোটাল মুসা।

চোদ্দ

তীব্র গতিতে ছুটছে করভেটি। পিছে লেগে আছে মুসা।

'লাইসেন্স নম্বরটা নিয়ে নিয়েছি,' কিশোর জানাল।

'তা তো নেবেই, জানি,' মুসা বলল।

'হয়ে গেল কাজ,' তুড়ি বাজাল রবিন। 'আর কোন অসুবিধে নেই, এবার ওর নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সব বের করে ফেলতে পারব।'

বেল এয়ারের ভেতরে টানটান উত্তেজনা।

স্টিয়ারিঙে শক্ত হয়ে আছে মুসার আঙুল। কিছুতেই পিছ ছাড়বে না আগের গাড়িটার। বড় রাস্তা থেকে আরেকটা রাস্তায় নেমে গেল করভেটি, যেখানে শনিবারের ভিড় নেই। একটা গোলাবাড়ির পাশ কাটাল। গতি বাড়িয়ে দিল আরও।

ছাড়ল না মুসা। সে-ও বাড়াল।

সাঁৎ সাঁৎ করে দু-পাশে সরে যাচ্ছে শূন্য পার্কিং লট, বাড়িঘর, গাছপালা। কেয়ার করছে না করভেটিটা, বেল এয়ারও করছে না। একটা পালিয়ে যেতে চাইছে, আরেকটা চাইছে ধরে ফেলতে।

আরেক রাস্তায় ঢুকল করভেটি। দু-ধারে বাড়িঘর আছে, কিন্তু নির্জন।

ওগুলোও ছেড়েছুড়ে চলে গেছে লোকে। আচমকা ডানে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

বেল এয়ারও ডানে মোড় নিল। অনেক বড় একটা গ্যারেজের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। মস্ত এক বাড়ির মধ্যে যেন একটা গুহা। ম্লান আলো। এটাও পরিত্যক্ত। দেয়াল ধসে পড়া দেখেই বোঝা যায়।

'দুর!' হতাশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

তিনটে শাখা বেরিয়েছে বিল্ডিঙটার। ডানে, বাঁয়ে এবং নাক বরাবর সামনে।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কোনটা দিয়ে যাব?'

'দাঁড়াও, বুঝে নিই,' জবাব দিল কিশোর।

কিন্তু কিশোরের ভাবার অপেক্ষা করল না মুসা। বাঁয়েরটা দিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রচুর ভাঙা কাঁচ পড়ে আছে। চাকার নিচে পড়ে মুড়মুড় করছে। প্রায় অন্ধকার একটা চত্বরে ঢুকল। ওপাশে আবার বেরিয়ে রাস্তায় ওঠা যায়।

রবিনের মনে হলো, ভুল পথে এসেছে মুসা। করভেটিটা গেছে হয়তো সোজা পথটা দিয়েই।

'দিল খসিয়ে,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

'এতক্ষণে বহু মাইল দূরে চলে গেছ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা।

'ওকে যখন হারালামই,' রবিন বলল, 'এক কাজ করি চলো। মিউজিশিয়ানের পারসোনেল অফিসে গিয়ে গাড়িটার নম্বর দেখিয়ে খোঁজ-খবর করি। কর্মচারীরা যারা গাড়ি রাখে ওখানে, তাদের নিশ্চয় পার্কিং পারমিট আছে। করভেটির মালিক পারমিটওয়ালাদের কেউও হতে পারে।'

'ঠিক বলেছ,' কিশোরও একমত হলো। 'ইদানীং কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে কিনা, কিংবা কেউ চাকরি ছেড়েছে কিনা সেই খোঁজও নেব। জানতে হবে মিউজিশিয়ানের ওপর কার রাগ আছে।'

'আরও একটা ব্যাপার,' রবিনকে মনে করিয়ে দিল মুসা, 'পিন্টো গাড়িটারও লাইসেন্স নম্বরের প্রথম তিনটে অক্ষর জেনেছি আমরা। কোন নম্বরের সঙ্গে মেলে দেখতে হবে।'

দি মিউজিশিয়ানে ফিরে চলল ওরা। পেছনে তাকানোটা যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে রবিনের। একটু পর পরই তাকাতে লাগল। কিন্তু সাদা ডাটসানটাকে দেখতে পেল না।

দোতলায় পারসোনেল অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সামনের দিকটায় আলো আছে, পেছনের অংশ অন্ধকার। সকালে খোলাই ছিল, এখন বন্ধ। উইকএন্ডের ছুটি হয়ে গেছে।

লোকজন সবই চলে গেছে, কেবল সামনের ডেস্কে বসে কাজ করছে এক মহিলা। বোধহয় ওভারটাইম করছে। মাথার ধূসর-সাদা চুল পেছনে টেনে নিয়ে টানটান করে বেঁধেছে।

গোয়েন্দাদের দেখে মুখ তুলে তাকাল, 'কিছু বলবে?'

'পার্কিং পারমিট যাদের আছে এখানে, তাদের লিস্ট রাখেন?' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপার,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিল মহিলা। 'কাউকে জানানোর নিয়ম নেই।' আবার কাজে মনোযোগ দিল সে। বুঝিয়ে দিল, বেরিয়ে যাও।

হাল ছাড়ল না রবিন, 'কিন্তু ম্যা'ম, কোম্পানির ভালর জন্যেই...'

'ভাল? এখানকার স্টাফ মনে হচ্ছে? কতদিন হলো?'

'একদিন,' হাসিমুখে জবাব দিল রবিন।

'একদিন! আর আমাকে এসে কোম্পানির ভাল শেখাচ্ছ, চৌদ্দ বছর ধরে যে কাজ করছে এখানে?' আবার ফাইলের দিকে মুখ নামাল মহিলা।

মুখ কাঁচুমাচু করে ফেলল রবিন। দরজার দিকে রওনা হওয়ার কথা ভাবছে মুসা। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। তারপর হঠাৎ হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। পিছু নিল দুই সহকারী।

ওরা যতক্ষণ না বেরোল তাকিয়ে রইল মহিলা। তারপর কাজে মন দিল।

কিশোরের পাশে চলে এল রবিন, জানতে চাইল, 'কি করব?'

'মহিলার মুখ খোলাব। দুই মিনিট পরেই কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে যাবে।'

কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল মুসা ও রবিন।

একটা টেলিফোনের কাছে এসে পকেট থেকে কার্ড বের করে উল্টো পাশে লেখা নম্বরটা দেখে ডায়াল শুরু করল কিশোর। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই নিজের নাম জানিয়ে পরিস্থিতি বর্ণনা করল। পারসোনেল ফাইলগুলো দেখার অনুমতি চাইল। সবশেষে, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' বলে একটা বোতাম টিপে দিল সে—হোল্ড বাটন।

আবার মহিলার ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল তিনজনে।

মুখ তুলে তাকিয়ে চোখের পাতা সরু করে ফেলল মহিলা, 'আবার এসেছ!'

'মিস্টার স্মিথসন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান,' জানাল কিশোর। 'তিন নম্বর লাইনে আছেন।'

'সরো! আমার সময় নষ্ট কোরো না!'

ডেস্কে রাখা ফোনটা টেনে নিয়ে তিন নম্বর বোতাম টিপে রিসিভারটা মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'তিনি অপেক্ষা করছেন।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল মহিলা। 'মিসেস ট্রমা বলছি...মিস্টার স্মিথসন?' সাবধানে ওপাশের কথা শুনতে লাগল সে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি দায়িত্ব নিলে তো আর কথা নেই...' আছাড় দিয়ে রিসিভার রেখে দিল সে। কড়া চোখে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে।

'আমাদের তাড়া আছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে সুইচ টিপে হলের আলো জ্বেলে দিল মিসেস

ট্রমা। ঘরের পেছনের অংশটাও আর অন্ধকার থাকল না। সেখানে অনেকগুলো দরজা। ওগুলোর ওপাশেও নিশ্চয় অফিস।

তার পিছু নিল তিন গোয়েন্দা।

বড় একটা ফাইল রুমে ঢুকল মিসেস ট্রমা। একটা কম্পিউটার টার্মিনালে বসে কীবোর্ডে কমান্ড টাইপ করল। স্ক্রীনে বেরিয়ে এল একটা লিস্ট।

চেয়ার থেকে সরে জায়গা করে দিয়ে বলল, 'এই যে, নাও, গাড়ি। কর্মচারীর নাম, গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের নম্বর, সব আছে। আর কি চাও?'

টার্মিনালে বসে দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছে রবিন।

'এই হপ্তায় কারও চাকরি গেছে কিনা, চাকরি ছেড়েছে কিনা, তার নাম,' কিশোর বলল। 'অসুস্থতার জন্যে অফিসে হাজির হয়নি, এমন কেউ আছে কিনা তা-ও জানতে চাই।'

আরেকটা টার্মিনালে গিয়ে আবার কমান্ড টাইপ করল মিসেস ট্রমা। পর্দায় তথ্য বেরিয়ে আসতেই জায়গা ছেড়ে দিল। সেখানে বসল মুসা।

'আর কিছু?' ভুরু কোঁচকাল মিসেস ট্রমা। থমথমে হয়ে আছে মুখ।

'আপনাদের কর্মচারীদের ফাইল,' মহিলার থমথমে মুখের পরোয়াই করল না কিশোর।

হাত তুলে ছাই রঙের কতগুলো ফাইলিং কেবিনেট দেখিয়ে বলল মিসেস ট্রমা, 'প্রথম তিনটে এখনকার। বাকি পাঁচটা আগের। খোলার প্রয়োজন পড়ে না।'

'থ্যাংকস। এতেই চলবে।'

শীতল ভঙ্গিতে সামান্য একটু মাথা নুইয়ে নিজের কাজে চলে গেল মিসেস ট্রমা।

'ভালই দেখালে,' হেসে বলল মুসা।

তার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'জায়গামত টোকা দিতে পারলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।'

কীবোর্ডে টোকা দিয়ে চলেছে রবিন। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না সাদা ডাটসান। আরও কয়েকটা কী-তে টোকা দিল। বলে উঠল, 'পেয়েছি!'

'কে?' এগিয়ে গেল কিশোর।

'এক মিনিট।' ভাল করে ডাটাগুলো পড়ল রবিন। 'এই যে, হয়েছে। করভেটটা পেয়েছি। মালিকের নাম হোমার জোনস।'

বানানটা দেখল কিশোর। ফাইল কেবিনেটের দিকে এগোল ফাইলটা বের করার জন্যে।

'খাইছে!' স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মুসা, 'তিন দিন ধরে ছুটিতে আছে হোমার জোনস। বুধবার বিকেলে তার পক্ষে সোয়াপ মিটে যাওয়া অসম্ভব ছিল না!'

'এই যে, আরও পেয়েছি!' উত্তেজিত হয়ে বলল রবিন, 'লাল পিন্টোর মালিকের নাম বোনটির হাউকাউ। থাই নামই তো মনে হচ্ছে!'

'আহ্, নামের কি ছিরি!' ফোড়ন কাটল মুসা, 'সঙ্গের গালকাটা লম্বুটার নাম হওয়া উচিত তাহলে ভাইটির কাউকাউ··· আরি, হাউকাউ তো দেখি আরও একজন আছে!' অবাক হয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'ঝিলম হাউকাউ! এত হাউকাউ কেন থাইল্যান্ডে?'

অন্য সময় হলে হেসে ফেলত কিশোর আর রবিন। কিন্তু এখন অন্যমনস্ক।

ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা।

কেবিনেটের কাছ থেকে কিশোর বলে উঠল, 'এই, দেখে যাও!'

লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দৌড়ে এল মুসা আর রবিন।

ফাইলে গেঁথে রাখা হোমার জোনসের ছবি দেখল।

'এই তো, এই লোকই!' ছবিতে টোকা দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা।

'আমাদের রহস্যময় সোনালি চুল!' বলল রবিন।

'আরও দেখো, কি লেখা,' কিশোর বলল। 'মিউজিশিয়ানের ইঞ্জিনিয়ার। সুতরাং যে কোন স্টুডিওতে ঢোকার অনুমতি আছে তার। মাস্টার প্রিন্ট কি করে করতে হয়, তা-ও জানে।'

H লেখা ড্রয়ারটাতে নজর দিল রবিন। নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে বের করে ফেলল ফাইলটা। 'এই তো, বোনটির হাউকাউ!··· এহ্হে, এ তো মেয়েমানুষের নাম···'

'তাই তো হবে। পুরুষ হলে তো ভাইটিরই হত,' বলল মুসা।

এবারও তার কথায় কান দিল না কেউ।

বলতে থাকল রবিন, 'ব্যাংককে জন্ম। এখন আমেরিকার বাসিন্দা। ক্যাসেটের বাজার জরিপের কাজ করে। নাহ্, চিনলাম না।'

মুসা আর কিশোরও মাথা নাড়ল। ওদেরও অপরিচিত।

ঝিলম হাউকাউয়ের ফাইলও বের করল রবিন। পাতা উল্টে বলল, 'না, ইনি পুরুষ। ব্যাংককেই বাড়ি, এখন আমেরিকার নাগরিক। মিউজিশিয়ানের ঝাড়ুদার···এই, দেখো কাণ্ড!'

তাড়াতাড়ি তাকাল মুসা আর কিশোর। ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন ছবিটা। চিনতে পারল। সোয়াপ মিটে হোমার জোনসের সঙ্গে গিয়েছিল এই লোক, দুই পাইরেটের সঙ্গে মারামারি করতে।

'দু-জনের ঠিকানাই নেয়া দরকার,' কিশোর বলল।

পকেট থেকে কাগজ আর নোটবুক বের করে নাম-ঠিকানা লিখতে শুরু করল রবিন।

'বোঝা গেল, হোমারের সঙ্গে ঝিলমের যোগাযোগ আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'মনে হয়, বোনটিরও আছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তার পিন্টোটাই চালাতে দেখেছি, ঝিলমকে, দু-বার।'

'হোমারের বাড়িতে আগে খোঁজ নেব,' কিশোর বলল।
'পাব কিনা কে জানে!' মুসা বলল।
রবিন বলল, 'পেলে জিজ্ঞেস করতে হবে আজ দুপুরে রিল দুটো সে-ই চুরি করেছে কিনা।'
ফাইলগুলো আগের জায়গায় রেখে মিস ট্রমার ডেস্কের কাছে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। মুখ গোমড়া করে রেখেছে মহিলা। হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে যখন হাত নাড়ল কিশোর, তখনও একই রকম ভঙ্গি করে রইল সে। বাইরে বেরিয়ে করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, 'মহিলা তো না, ড্রাগন! বাপরে বাপ!'
মুখ গোমড়া করে রাখা মানুষের সঙ্গে ড্রাগনের মিলটা কোথায় জিজ্ঞেস করল রবিন। বলল, 'ড্রাগনরা মুখ ভয়ঙ্কর করে রাখে। মহিলার মুখ দিয়ে আগুন বেরোলেও নাহয় এককথা ছিল।'
'মুখ দিয়ে না বেরোক, চোখ দিয়ে তো বেরোয়। আর ভয়ঙ্কর নয় তো কি? মুখ গোমড়া করে রাখা মানুষের চেহারা ভয়ঙ্করই লাগে,' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি বলো, কিশোর?'
কিশোর বলল, 'সব মানুষের লাগে না। কাউকে কাউকে বরং ভালই লাগে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে হয়।'
পার্কিং লটে বেরিয়ে গাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল তিনজনে। হাঁ হয়ে গেছে।
চারটে চাকাই বাতিল হয়ে আছে বেল এয়ারের!

পনেরো

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা হলো মুসার। বলল, 'চারটে টায়ারই নতুন লাগিয়েছিলাম! বীমাও করাইনি!'
রবিন বলল, 'অচল করে দেয়ার চেষ্টা করেছে আমাদের! ওই যে তখন করভেটির পিছু নিয়েছিলাম, বোধহয় সে-জন্যে!'
'চোরগুলোকে চড় দেখিয়েছিলাম যে, সেই রাগেও হতে পারে।'
কেটে ফালাফালা করে ফেলা হয়েছে টায়ারগুলো। গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, 'শুধু যে অচল করেছে, তাই নয়, একটা হুমকিও দিয়ে গেল আমাদের; বলে গেল, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমাদেরও এই অবস্থা করবে।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার সে, 'কাটল কি দিয়ে? ইলেকট্রিক করাত জাতীয় কিছু হবে।'
'ওদের হুমকির পরোয়া করি না আমি!' রাগে জ্বলে উঠল মুসা। কাটা একটা রবারের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলল অ্যাসফল্টের ওপর। 'এত

সহজে ছেড়ে দেব মনে করেছ! মোটেও না! এর শোধ আমি না নিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়!'

দরজা থেকে ডাক দিল ডোনার, 'এই রবিন, তোমার ফোন!'

কে করল? ভাবতে ভাবতে দৌড়ে পার্কিং লট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন।

ফেয়ারি ফোন করেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারাররা মহাফ্যাসাদ বাধিয়েছে!'

'ওরা তো সব সময়ই বাধায়,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'এবার কি করল?'

'ঘুরতে যেতে চেয়েছিল, মিস্টার লজের গাড়িটা দিয়ে দিলাম। লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে খানিকটা মজা করতে চেয়েছিল। গেলি ব্যাটারা, টাকা-পয়সা নিয়ে যা, তা নিল না। একেকটা পাগলের কথা আর কি বলব! বাদ্যযন্ত্রগুলো সব নিতে পারল, অথচ পকেটে করে কয়টা টাকা নিতে পারল না যেন একজনও। গাড়িতে ছিল পেট্রল কম, গেছে ফুরিয়ে, রাস্তায় আটকা পড়েছে।'

ঘড়ি দেখল রবিন, 'এখন বাজে চারটে! প্রতিযোগিতা সাতটায়! সময়ও নেই। মিস্টার লজ কি বলছেন? কিছু ম্যানেজ করতে পারছেন না?'

নাক দিয়ে অসহায় একটা শব্দ করল ফেয়ারি, 'তিনি নেই তো। সকালের ফ্লাইট ক্যান্সেল করে বিকেলের করেছিলেন, মায়ের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকার জন্যে। বুকিঙের ওরা টিকেটের কি যেন গোলমাল করে ফেলল, ফলে বাদ গেল বিকেলের ফ্লাইটও। আসতে আসতে মাঝরাত। তিনি কিছুই করতে পারছেন না।'

এইবার ঘাবড়ে গেল রবিন। এরপর কি বলবে ফেয়ারি আন্দাজ করতে পারছে।

'তুমি ওদেরকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো!'

কিন্তু সে কি করে করবে? ওরাও তো আটকা পড়েছে। ওদের গাড়ি আছে চাকা নেই, আর অ্যাডভেঞ্চারারদের চাকা আছে টাকা নেই। ভাল পরিস্থিতি!

'কোন জায়গায় আটকা পড়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

ঠিকানা দিল ফেয়ারি।

'যাক, খুব বেশি দূরে নয়। দেখি, কি করতে পারি।' ফোন বুক ঘেঁটে একটা ট্যাক্সি সার্ভিসের নম্বর বের করল রবিন।

পার্কিং লটে তখন চাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে কিশোর আর মুসা। কিশোর বলল, ইয়ার্ড থেকে গোটা দুয়েক পুরানো টায়ার জোগাড় করে দিতে পারবে। মুসা বলল, বাবার কাছ থেকে নিতে পারবে আরও দুটো। কিন্তু পুরানো টায়ার দিয়ে তো বেশিদিন চলবে না। কি আর করা?—ভাবল সে। প্রতিবেশীদের গাড়ি মেরামতের কাজ করতে হবে কিছুদিন, নতুন টায়ার

কেনার পয়সা জোগাড়ের জন্যে।

বেরিয়ে এল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কাছে টাকা-পয়সা আছে কিছু?'

গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'বাহ, বেশ কথা! টাকার সমস্যায় হিমশিম খাচ্ছি...'

'দেখো, জরুরী! আছে কিনা বলো!'

পকেটে হাত দিল মুসা।

কিশোরও দিল।

রবিনের কাছেও কিছু আছে। তিনজনের মিলে হলো বাইশ ডলার তেরো সেন্ট।

'হয়ে যাবে,' বলল রবিন। 'এখুনি যেতে হবে আমাদের।'

পার্কিং লটে এসে ঢুকল একটা ট্যাক্সি। তাতে চড়ে বসল তিন গোয়েন্দা। এতক্ষণে খুলে বলল রবিন, ফেয়ারি কি বলেছে। লজের ক্যাডিলাকটা একটা পেট্রল স্টেশনের কাছে আছে। সেখান থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে অ্যাডভেঞ্চারারদের।

ওদেরকে ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নামতে দেখেই 'হে! হে! হে!' করতে করতে এগিয়ে এল বারডি। বাতাসে উড়ছে তার লম্বা ফুরফুরে চুল। 'ভাল বেকায়দায় পড়েছি।' প্যান্টে পকেটের অভাব নেই তার—কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত পকেট আর পকেট; সব কটাতে চাপড় দিয়ে দেখাল, একটা কানাকড়িও নেই।

ধীরে ধীরে ঘুরে গেল টোগোরফের কামানো চকচকে মাথা, গম্ভীর স্বরে বলল, 'মরুভূমিতে আটকা পড়া উট মরুদ্যানে পৌঁছে দেখল ইস্পাতের তার দিয়ে তার মুখ বাঁধা, সামনে জল থাকলেও জল খাবে কি করে?'

'আই যে রবিন,' প্রায় উড়ে এল ববি, আনন্দের আতিশয্যে টুক করে চুমুই খেয়ে ফেলল রবিনের গালে। মুসার গালেও খেল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে তো চিনতে পারলাম না?'

লাল হয়ে যাচ্ছে কিশোরের গাল। ববির চুমুর ভয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

হেসে ফেলল রবিন, 'আরে ও আমাদের কিশোর, চিনতে পারছেন না? বিখ্যাত কিশোর পাশা!'

'কিশোর!' আনন্দে নেচে উঠল ববি। জ্যাকের সঙ্গে মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর বদলে গেছে ও—ভাবল রবিন। 'তোমার কথা রবিন আমাকে সব বলেছে। তুমি নাকি অনেক বড় গোয়েন্দা। আরে, দাঁড়াও না, সরো কেন?'

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। কিন্তু ববির চুমু থেকে মুক্তি পেল না।

এগিয়ে এল জ্যাক। তিনজনের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় কয়েকবার করে ঝাঁকি দিল একেকজনকে। তার পাগলামি কেটে গেছে, স্বাভাবিক মানুষ মনে হচ্ছে রবিনের।

'আমাদেরকে উদ্ধার করতে আসার জন্যে ধন্যবাদ,' জ্যাক বলল।

পেট্রল ঢালার নলটা খুলে নিয়ে পেট্রল ট্যাংকে নজল ঢুকিয়ে দিল মুসা। জানা গেল, পাম্পটার কাছ থেকে কয়েকশো গজ দূরে পেট্রল ফুরিয়ে গিয়েছিল গাড়ির। ঠেলতে ঠেলতে ওটাকে পাম্পে নিয়ে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারাররা। রবিন জানাল, লজ আসতে পারেননি, ওদেরকে প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন তার।

'খুব ভাল!' বলে চটাস করে রবিনের হাতে একটা চাঁটি মারল বারডি।

জ্বালা করে উঠল চামড়া। একঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিয়ে রবিন বলল, 'কিন্তু আমাদেরকে যে একটা জায়গায় যেতে হবে। একটা কেসে...'

'ও, এই জন্যেই সেদিন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বার বার পেছনে তাকাচ্ছিলে,' বুঝে ফেলল ববি। 'তাই তো বলি, ড্রাইভিং সীটে বসে কি আর এগজস্ট দেখা যায়! মাথায়ই ঢুকছিল না আমার।'

হাসল রবিন।

সে আর কিশোর মিলে অ্যাডভেঞ্চারারদের সংক্ষেপে জানাল টেপ চুরির কথা।

'মিউজিশিয়ান থেকে!' বারডি বলল, 'দারুণ খবর শোনালে তো!'

'অনেক বড় প্রতিষ্ঠান,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল জ্যাক।

'যাই করো, শুনে যখন ফেলেছি, আর আমাদের ফেলে যেতে পারবে না!' জেদ ধরল ববি।

'আপনাদের যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না,' কিশোর বলল।

কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা, 'বদমাশ লোক! আমার টায়ারগুলোর কি অবস্থা করেছে দেখলেই বুঝতেন!' তেল ভরা শেষ, পাইপের নজল আবার হুকে ঝুলিয়ে রাখল সে। 'ওদের কাছে পিস্তল আছে।'

'অত কথা শুনতে চাই না,' জ্যাক বলল, 'তোমরা আমাদের সাহায্য করেছ, এখন আমরা তোমাদের করব।'

ববি বলল, 'তোমরা যখন ভেতরে যাবে, আমরা বাইরে অপেক্ষা করব। নজরও রাখতে পারব, আমাদের তুলে নেয়ার জন্যে এখানেও আর আসা লাগবে না তোমাদের। কতটা সুবিধা করে দিচ্ছি?'

'ঝামেলাও হবে,' বলে তেলের টাকা দেয়ার জন্যে অফিসের দিকে চলল মুসা।

'রবিন,' অনুরোধ করল ববি, 'আমাদের ফেলে যেয়ো না! আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে। গোয়েন্দাগিরি করতে কেমন লাগে দেখতাম!'

হাসিমুখে ঘোষণা করল টোগোরফ, 'স্পেস থেকে আসছে আদিম নির্দেশ, আর অমান্য করতে পারবে না।'

আর কেউ না বুঝলেও তার কথা বুঝে ফেলল কিশোর, নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

'গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল ববি, 'পারব না মানে! অবশ্যই পারব!'
চট করে একে অন্যের দিকে তাকাল টোগোরফ আর কিশোর। হাসল। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু-জনের।
কিশোররে দিকে তাকাল রবিন, 'এলে অসুবিধে আছে?'
ববিও তাকাল তার দিকে, বলল, 'প্লীজ!'
এগিয়ে আসছে ববি। আবার না চুমু খেয়ে ফেলে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'ঠিক আছে, গাড়িতে উঠে বসুন।'
সমস্বরে কলরব করে উঠল অ্যাডভেঞ্চারাররা। গাড়িতে উঠে বসল।
ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। ফিরে তাকাল একবার। পেছনের সীটে ঠাসাঠাসি করে বসেছে অ্যাডভেঞ্চারাররা। হাতে, পায়ের কাছে, কোলের ওপর গাদাগাদি করে রেখেছে বাদ্যযন্ত্রগুলো।
'দল ভারী করা হয়েছে, না?' তাদের সঙ্গে গায়কদের যাওয়াটা মোটেও পছন্দ করতে পারছে না মুসা। কিশোরকে বলল, 'বিপদে পড়লে উদ্ধার করবে ভাবছ?'
হাসল কিশোর, টোগোরফের কণ্ঠ নকল করে বলল, 'মহাব্রহ্মাণ্ড থেকে এল মহাবাণী, কি করে করি অমান্য—আমি যে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী!'
হাঁ করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। পাগলগুলোর সঙ্গে কয়েক মিনিট থেকেই কিশোরও পাগল হয়ে গেল নাকি, যে ওদেরকে নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেল!
তার মনের কথা বুঝতে পেরে হেসে উঠল রবিন। 'ভয় নেই। কিছু হয়নি। গাড়ি চালাও।'
হোমার জোনসের ঠিকানা বলল কিশোর।
স্টার্ট দিল মুসা।
হোমার যে রাস্তার ধারে থাকে সেটাতে পৌছতে সাড়ে পাঁচটা বাজল। হলিউড হিলসের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। লম্বা সাইপ্রেস, হোঁতকা জুনিপার, আর আইভির সারি চলে গেছে রাস্তার দু-পাশ ধরে। কোন ফুটপাথ কিংবা হাঁটাপথ নেই।
'ওই যে বাড়িটা,' রাস্তার ঠিক নিচেই পাহাড়ের ঢালের একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল মুসা। 'মনে হয় ওটাই।'
'দাঁড়াও এখানেই,' কিশোর বলল।
বাড়িটার দু-শো গজ দূরে গাড়ি থামাল মুসা।
গাড়িতে বসে থাকবে, কোন গোলমাল করবে না কথা দিয়েছে—অ্যাডভেঞ্চারারদের এ কথা মনে করিয়ে দিল রবিন।
'বেরোব না,' ডারবি বলল।
ববি বলল, 'সাবধানে থেকো!'
রবিন বলল, 'আধঘণ্টার মধ্যে যদি না ফিরি পুলিশে খবর দেবেন।'
রাস্তাব এ-মাথা ও-মাথা দেখে নিল তিন গোয়েন্দা। কেউ নেই। ভয়ে

নাড়ির গতি বেড়ে গেছে রবিনের। ভয়ের জায়গায় এসেও যে বলে ভয় পায় না, সে হয় একটা গাধা নয়তো মিথ্যুক—ভাবল সে। এ রকম জায়গায় এলে ভয় তাকে পেতেই হবে। তবে তাই বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল না ওরা। পৌঁছল এসে বাড়িটার কাছে।

সাবধানে পাহাড় বেয়ে হোমারের বাড়িটার দিকে নামতে লাগল ওরা। উঁচু কাঠের বেড়ায় ঘেরা। বাড়ির ভেতর থেকে মিউজিক শোনা যাচ্ছে হালকা ভাবে।

রবিনের দিকে তাকাল মুসা, 'গন টু হেভেন?'

'সে-রকমই তো লাগছে।'

'তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছি,' গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর।

আস্তে করে গেট খুলল মুসা। আঙিনায় ঢুকে পড়ল তিনজনে। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে চারটে গাড়ি। একটা করভেটি, একটা লাল পিন্টো, একটা হলুদ হোন্ডা সিভিক, আর একটা লিংকন কন্টিনেন্টাল।

বাড়ির পাশের ঘাসে ঢাকা জমি ধরে ছায়ার মত নিঃশব্দে এগোল ওরা। মাথার ওপরে জানালা খোলা। শোনা যাচ্ছে গন টু হেভেন।

হোমার জোনসই আজ টেপগুলো চুরি করেছে—ভাবল রবিন। তাহলে কি সে-ই পাইরেটদের নেতা, নিকি যার কথা বলেছে?

মিউজিক বন্ধ করে দেয়া হলো হঠাৎ।

'বোনটির সঙ্গে কথা বলেছ?' জানালা দিয়ে ভেসে এল একটা খসখসে, কর্কশ কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, জোনস।'

তারমানে খসখসে কণ্ঠস্বরের মালিক হোমার জোনস, শিওর হলো গোয়েন্দারা। ভাগ্য মনে হচ্ছে ভালই, এবার আরও কিছু জানতে পারবে।

'বোনটির খুব দুঃখিত,' বলল দ্বিতীয় লোকটা, কথায় কড়া বিদেশী টান। ইংরেজিও ভাল বলতে পারে না। 'আমার বোন বোনটির খুব ছোট। বড় ভুল করে ফেলে।'

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'বোনটিরের ভাই!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল অন্য দু-জন।

'আমার বোন বুঝতে পারেনি কি গোলমাল করেছে। হাবিজ তার বয়ফ্রেন্ড। হাবিজকে ভালবাসে সে। হাবিজ যা বলে করে।'

'হাবিজ উমরাওয়া,' বিড়বিড় করল রবিন। গালকাটা লম্বা লোকটা। যোগাযোগ তাহলে পাওয়া যাচ্ছে।

'তোমার বোন বেশি কথা বলে, ঝিলম!' ধমকে উঠল হোমার। 'ভজঘট করে দিয়েছে! আরেকটু হলে সব ভেস্তে যাচ্ছিল!'

'আমরা দুঃখিত। আর এ রকম হবে না।'

'তা তো হবেই না। হতে দেয়া হবে না। তোমার মাথায় যে সব বুদ্ধি ঢুকিয়েছে তোমার বোন, সেটাও ভুলে যেতে হবে। দম বন্ধ হওয়ার আগে

আমার কাজ তুমি ছাড়তে পারবে না। কি বুঝলে?'

'না না, স্যার, কে বলে আমি কাজ করব না? কাজ করব। ঠিকমত করব, স্যার।'

থেমে গেল কথা।

মুসা বলল ফিসফিস করে, 'দরজা বন্ধ হতে শুনলাম। বোধহয় আরেকটা ঘরে চলে গেছে।'

হাতের তালুতে তালু ঘষল কিশোর। 'এতদিনে জানা গেল অনেক কিছু।'

'চুপ! কে জানি আসছে!' কুঁজো হয়ে বাড়ির পেছন দিকে কয়েক কদম এগোল মুসা।

প্রথমে কিছু শুনতে পেল না রবিন। তারপর দূর থেকে কানে এল মৃদু খসখস শব্দ। মট করে ভাঙল একটা শুকনো ডাল।

ফিরে তাকিয়ে হাতের ইশারায় দু-জনকে এগোতে বলল মুসা। চিতাবাঘের মত সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল নিজে। তার পেছনে রইল রবিন আর কিশোর। ঘরের কোণায় পৌঁছে একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল।

দেখতে পেল সোয়াপ মিটের দুই পাইরেটকে।

'খাইছে!' দম বন্ধ করে ফেলল মুসা। ঝোপটা না থাকলেই ওদেরকে দেখে ফেলত চোরেরা।

ওরাও তাদেরই মত জানালার নিচে ঘাপটি মেরে থেকে কান পেতে শুনছে। মুখটাকে কুঁচকে বিকৃত করে রেখেছে গালকাটা হাবিজ। এই ভঙ্গিতে কাটা দাগটা আরও গভীর লাগছে। বেঁটে লোকটা, যে রবিনের কাছে নকল ক্যাসেট বিক্রি করেছিল, সে লম্বুর গা ঘেঁষে আছে।

'ওই দেখো!' হাত তুলল রবিন।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে রাস্তার নিচের দিকের খানিকটা চোখে পড়ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সাদা ডাটসান বি-২১০। গুঁতো খেয়ে দুমড়ে বসে গেছে গাড়িটার ট্রাংক।

'চমৎকার!' হেসে বলল কিশোর, 'সব্বাই হাজির!'

'চমকে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়!' মুসা বলল।

ষোলো

দুই পাইরেটকে কি করে ধরা যায় দ্রুত আলোচনা করে নিল তিন গোয়েন্দা।

মৃদু স্বরে মুসা বলল, 'চলো, এগোই।'

ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঘুরে বাড়ির পেছনের আঙিনায় চলে এল

তিনজনে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সারতে হবে, এবং নিঃশব্দে।

হঠাৎ ফিরে তাকাল দুই পাইরেট। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। এ রকম কিছুই ঘটবে আশা করেছিল গোয়েন্দারা। আর ওদের চমকে যাওয়ার সুযোগটাই নেবে ওরা, ঠিক করে এসেছে।

হাবিজ উমরাওয়ার পেট সই করে লাথি মারল মুসা, কারাতের ছোট আকারের কিন্তু শক্তিশালী একটা মার। মুহূর্ত সময় না দিয়ে মারল আরেকটা বড় লাথি-নিদান-গেরি, লোকটার বুকে।

হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল গালকাটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে তৈরিই হয়ে আছে কিশোর। মুখ বেঁধে দিল যাতে চিৎকার করতে না পারে।

রবিন লড়ছে বেঁটে পাইরেটের সঙ্গে। লোকটার তীব্র ঘুসি ঠেকিয়ে দিল কব্জি দিয়ে, এই বিশেষ কায়দাটার নাম কাকুটু-ইউকি। তারপরেই কেনটুসি-ইউচি হাঁকাল লোকটার চোয়ালে, সাংঘাতিক এক ঘুসি, লাগলে মনে হয় হাতুড়ির বাড়ি পড়েছে।

বাড়ির দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল বেঁটে পাইরেট, সেঁটে রইল যেন একটা সেকেন্ড, তারপর গড়িয়ে পড়ল চোখ বন্ধ করে। এবারেও তৈরি আছে কিশোর। আরেকটা রুমাল দিয়ে এরও মুখ আটকে দিল।

'দারুণ মার মেরেছ,' ওদের পেছন থেকে প্রশংসা করল একটা শীতল কণ্ঠ।

এইবার তিন গোয়েন্দার চমকানোর পালা। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল তিনজনে। ঢোক গিলল রবিন। এই বোকামিটা কি করে করল ওরা? পেছনে নজর রাখা উচিত ছিল অবশ্যই।

'এবার হাতগুলো তুলে ফেলো মাথার ওপর!' আদেশ দিল হোমার জোনস। খুশি খুশি লাগছে তাকে।

হাত তুলতে দেরি করল না তিন গোয়েন্দা। কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ভয়ঙ্কর দুটো অস্ত্র, নল কেটে ফেলা সেমিঅটোমেটিক উজি সাবমেশিনগান।

কৈফিয়ত দিতে গেল কিশোর, 'এই চোরগুলোকে দেখলাম...'

'চুপ!' সাবমেশিনগানের নল নেড়ে ধমক দিল হোমার।

তার সঙ্গে আছে একজন থাই, তার হাতে আরেকটা সাবমেশিনগান, সোয়াপ মিটে হোমারের সঙ্গে সে-ই ছিল। আরও দু-জন লোক রয়েছে সঙ্গে। ছয় ফুট চার ইঞ্চির কম হবে না একেকজন, ওজন দুশো পাউন্ড করে। দাঁত বের করে হাসল একজন। মজা পাচ্ছে। সাধারণ গুণ্ডা শ্রেণীর লোক ওরা, আচরণেই অনুমান করা যায়।

'আপনাকে বলেছি না, জোনস,' থাই লোকটা বলল, 'অনেক সাহায্য করতে পারব আমি। দেখলেন তো? যে ভাবে বলেছেন ঠিক সে-ভাবেই টায়ার কেটে দিয়ে এসেছি। এখন ঘরের বাইরে শব্দ শুনে আপনাকে বললাম। তাতেই তো ধরতে পারলেন।'

'তা তো বটেই,' ব্যঙ্গ করল কিনা হোমার, বোঝা গেল না। 'এখন তোমার বোনের কথাটা বলে ফেলো তো, তাকে কি করে সরানো যায়?'

'না না, জোনস!' গুঙিয়ে উঠল ঝিলম।

দুই গুণ্ডাকে ইশারা করল হোমার। নিচু হয়ে পাইরেটদেরকে তুলে ময়দার বস্তার মত কাঁধে ফেলল ওরা, বাড়ির আরেক পাশের দিকে রওনা হলো।

'হাঁটো!' তিন গোয়েন্দাকে আদেশ দিল হোমার।

মাথার ওপর হাত তুলে রেখে দুই গুণ্ডাকে অনুসরণ করে বাড়ির পাশের একটা দরজার কাছে চলে এল তিন গোয়েন্দা। পেছনে সাবমেশিনগান হাতে আসছে হোমার আর ঝিলম।

বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে রবিনের। এই লোকগুলোকে হালকা করে দেখার কিছু নেই। মনে পড়ল নিকির কথা—এত টাকার জন্যে খুন করতে দ্বিধা করবে না!

মুসা আর কিশোরও চুপ করে আছে তার মত।

বড়, সাজানো-গোছানো একটা লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে একটা হলঘরে এসে ঢুকল। ঘরটার কয়েকটা দরজা, সব বন্ধ।

'এইবার ভাল হয়েছে,' আনন্দে রয়েছে বোঝানোর চেষ্টা করছে ঝিলম, কিন্তু রবিন আর কিশোর ভালমতই বুঝতে পারছে, আসলে আতঙ্কিত হয়ে আছে সে। 'রিল পেয়েছি। ছেলেগুলোকে ধরেছি। রিল চুরি করেছিল যারা, তাদেরকে ধরেছি। খুব মজা, তাই না জোনস?'

'তুমিও কথা কম বলো না!' ধমকে উঠল হোমার। 'খবরদার, গন টু হেভেনের ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখবে! আবার সব ভজঘট করে দেবে না তোমরা কি করে বুঝব?'

ইতিমধ্যে একটা বড় আলমারি খুলে ফেলেছে দুই গুণ্ডা। দুই পাইরেটকে ফেলল তার মধ্যে। ব্যথা পেয়েই বোধহয় গুঙিয়ে উঠল একজন। হেসে উঠল এক গুণ্ডা। আরেকজন দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল হোমার আর ঝিলম, সঙ্গে এল দুই গুণ্ডা। লম্বা করিডর ধরে এগোল। শেষ মাথা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে।

'ভুল করে হাবিজকে বলে ফেলেছে বোনটির,' বোনকে বাঁচানোর চেষ্টা করেই যাচ্ছে ঝিলম। 'বুঝতে পারেনি আমি ওগুলো মিউজিশিয়ান থেকে বের করে আনার সময় হামলা আসবে। হাবিজ চুরি করতে গেল কেন সেটাই বুঝতে পারছি না। জালিয়াতি করার জন্যে টেপের অভাব হয় না তার। ব্যাংককের বড় বড় বসদের কাছ থেকেই আনতে পারে। গন টু হেভেনের কি দরকার?'

'সে-ও বস্ হতে চেয়েছিল আরকি,' হোমার বলল। 'বসদের দেখিয়ে দিতে চেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে-ও ওদের মত হতে পারে, ওদের মত টাকা

কামাতে পারে।'

'যাই হোক, ওদেরও হাতছাড়া হয়ে গেল। আপনিও আবার নতুন কপি নিয়ে এলেন। আপনি ভীষণ চালাক। আমাদের বিগ বসও আপনাকে ভক্তি করবে।'

'এ সব তেল মেরে আমাকে ভজাতে পারবে না!' কর্কশ গলায় বলল হোমার। 'তোমার বোন তো বিপদে পড়েছেই। তুমিও রেহাই পাবে না।'

কাঠের মেঝে দেয়া একটা বদ্ধ ঘরে নিয়ে আসা হলো গোয়েন্দাদের। একটা জানালাও নেই। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কিছু ভারী ভারী যন্ত্রপাতি।

'বাঁধো ওদেরকে,' আদেশ দিল হোমার।

পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করে তিন গোয়েন্দার দিকে এগোল দুই গুণ্ডা।

'প্রথমে এটাকে,' সাবমেশিনগানের নল মুসার পেটের দিকে সই করে ধরল হোমার।

মুসার দুই হাত পেছনে নিয়ে শক্ত করে কব্জিতে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো দড়ি। লোকটার কালো চুল খামচে ধরে মাথা টেনে নুইয়ে ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে দিতে ইচ্ছে করল মুসার, আঙুল দিয়ে খোঁচা মারতে ইচ্ছে হলো বাদামী চোখে।

কিশোরকে বাঁধল যে গুণ্ডাটা তার বিশাল বাঁকা নাক, কোঁকড়া এলোমেলো লম্বা চুল।

'হ্যা, এইবার বলো,' মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল হোমার, 'আমাকে খুঁজে পেলে কি করে?' বিশাল শরীর দেখে মুসাকেই দলপতি ভেবেছে।

'না কামপ্রেনদো!' জবাব দিয়ে দিল মুসা। স্প্যানিশ এই কথাটার মানে—বুঝতে পারছি না। ইংরেজি না বোঝার ভান করল সে

সাবমেশিনগানের নল নেড়ে কঠিন কণ্ঠে বলল হোমার, 'দেখো, আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা কোরো না! কি করে ঠিকানা পেয়েছ?'

চুপ করে রইল মুসা।

ইশারা করল হোমার। আড়চোখে তাকিয়ে সব দেখছে রবিন। একটা গুণ্ডা মুসার কব্জির বাঁধন মোচড়াতে লাগল, কেটে বসতে লাগল দড়ি।

গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'থামুন, থামুন!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'আমি বলছি!'

নির্দেশের জন্যে হোমারের দিকে তাকাল দুই গুণ্ডা।

মাথা নেড়ে সায় দিল হোমার। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলো?'

'আপনার গাড়ির লাইসেন্স নম্বর নিয়ে গিয়ে পার্কিং পারমিটে আপনার নাম বের করলাম। ঠিকানা বের করতে অসুবিধে হলো না। দড়ি ঢিল করে দিন ওর।'

মাথা ঝাঁকাল হোমার।
মুসার হাত ছেড়ে দিল গুণ্ডা লোকটা।
কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে মুসার হাত থেকে। কপালে ঘাম।
'মিউজিশিয়ানে তাহলে এই কাজই করছিলে,' হোমার বলল। 'রিলগুলো পেয়ে বুঝে গিয়েছিলে ওগুলো ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলসদের। অফিসে নিয়ে গিয়েছিলে পুরস্কারের লোভে।'
'হ্যাঁ,' মিথ্যে কথা বলল কিশোর। 'নগদ টাকা নয়, চাকরির জন্যে।'
'এখন এখানে এসেছ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে!'
'চেষ্টা করে লাভ হবে না বুঝতে পারছি।'
রবিন বুঝতে পারছে, কথা বলে বলে দেরি করাতে চাইছে কিশোর, যাতে আধঘণ্টা পার হয়ে যায়, পুলিশকে খবর দেয় অ্যাডভেঞ্চারাররা। ওদেরকে সঙ্গে আনায় মনে মনে এখন ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।
ধাক্কা দিয়ে মুসাকে মাটিতে ফেলে দিল লোকটা। তার গোড়ালি বাঁধল। তারপর এগোল রবিনের দিকে।
কিশোরকে বাঁধা শেষ করে বসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল অন্য লোকটা।
'বোকা ছেলে!' নাক কুঁচকাল হোমার। 'মরার জন্যে নাক গলাতে এসেছ এখানে!' জ্বলন্ত চোখে তাকাল কিশোরের দিকে, 'তোমরা যে এসেছ আর কে কে জানে?'
'অনেকেই জানে। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'
কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল হোমার। বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না।
রবিনের হাত বাঁধা শেষ হয়েছে। মুসার মতই তাকেও ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে পা বাঁধতে বসল গুণ্ডাটা। বাঁধা শেষ করে তিনজনকেই একসারিতে বসিয়ে দিল।
'মিথ্যে কথা বলছ,' কিশোরকে বলল হোমার। 'কেউ জানে না। জানালেই ভাগ দিতে হবে, সে-জন্যে জানাবে না। সুতরাং না ফিরলেও বাড়িতে জানতেই পারবে না তোমরা কোথায় আছ।'
'ঠিক বলেছেন,' তোয়াজের ভঙ্গিতে বলল ঝিলম। 'বুদ্ধি আছে আপনার।
তাকে পাত্তা দিল না হোমার। গুণ্ডাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছেলেগুলো অনেক জেনে ফেলেছে। মুখ বন্ধ করে দেয়া দরকার।'
টানটান হয়ে গেল রবিনের স্নায়ু। অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর। এভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেয়া হবে ওদের, কল্পনাও করতে পারেনি।
'বিগ বসের অনুমতি নিয়ে নিলে ভাল হত না?' ঝিলম বলল, 'তিনি না বললে আমরা কিছুই করতে পারি না। চলে আসবেন, সময় হয়েছে।'
রবিন ভেবেছিল চটে উঠবে হোমার। কিন্তু চটল না। বলল, 'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। তবে মরতে ওদের হবেই। তিনিও মুখ বন্ধ করতেই বলবেন।

ব্যবসা নষ্ট করতে চায় না কেউ। অনেক টাকার কারবার।' দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল সে, 'তোমার বোনকেও বাঁচাতে পারবে না।'

গুঙিয়ে উঠল ঝিলম।

বেরিয়ে গেল চারজনে। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো দরজায়। পদশব্দ চলে গেল হলঘরের দিকে, সেই সঙ্গে ঝিলমের অনুনয় ভরা কণ্ঠ।

'ভালই লাগছে, কি বলো, মুসা?' হাসিমুখে বলল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকাল মুসা, ব্যঙ্গ করছে কিনা বোঝার জন্যে। না, করছে বলে মনে হচ্ছে না।

'তার মানে বলতে চাচ্ছ, নো পেইন, নো গেইন?'

'স্পাই হওয়ার কথা ভেবেছ কখনও?' রবিন বলল, 'জেমস বন্ডের মত। যত খুশি মারপিট করবে, চোখের পলকে ধরাশায়ী করবে বাঘা বাঘা খুনীকে, গাড়ি নিয়ে তোলপাড় করবে...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর, 'অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। চুরি করে গন টু হেভেনের মাস্টার প্রিন্ট করে নিয়েছিল হোমার, সেগুলো দিয়েছিল ঝিলমের হাতে, পার করে দেয়ার জন্যে। ঝিলম ঝাড়ুদার, টেপগুলো বের করে নেয়ার যথেষ্ট সুযোগ তার। ময়লার ঝুড়িতে ভরে ময়লা ফেলার ছুতো করে বের করে নিয়ে যেতে পারে।'

'তারপর,' কথার খেই ধরল রবিন, 'উত্তেজনা চাপতে না পেরে তার বোনকে বলে দিয়েছিল কথাটা। সে বলেছে তার বয়ফ্রেন্ডকে। পাইরেটিং ব্যবসা করে হাবিজ আর তার দোস্ত—ভাবল সুবর্ণ সুযোগ, কাজে লাগানো দরকার। হোমার আর ঝিলম ওগুলো বিগ বসের কাছে পৌঁছে দেয়ার আগেই হাতিয়ে নিল।'

'এবং আমরা পড়ে গেলাম দুটো দলের লড়াইয়ের মাঝখানে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা।

উপসংহার টানল কিশোর, 'হোমার আর ঝিলম সোয়াপ মিটে ছুটে গিয়েছিল রিলগুলো উদ্ধারের জন্যে। বেঁটে লোকটা রবিনের ব্যাগে ওগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে পালাল। হোমাররাও পরে জেনে গেল ওগুলো রবিনের কাছে আছে। দুটো দলই ওর পেছনে লাগল তখন। আমরা নামলাম তদন্তে।'

'এবং তার ফলাফল—আমরা এখানে হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে আছি,' আরও তিক্ত শোনাল মুসার কণ্ঠ।

'রিলগুলো ফেরত নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল হোমার,' কিশোর বলল। 'পরে যখন আর কোনমতেই পারল না, আবার কপি চুরি করল।'

'ঝিলমের বোনও কি পাইরেট নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'মনে হয় না,' রবিন জবাব দিল। 'আমাদেরই মত অবস্থা হয়েছে হয়তো। ওর ভাই আর বয়ফ্রেন্ডের দলের মাঝখানে পড়েছে।'

চুপ করে ভাবতে লাগল তিনজনে। কাত হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। বসে

থাকার চেয়ে এ ভাবে আরাম। রবিনও একই কাজ করল।

হঠাৎ বলে উঠল, 'জিনিসটা দেখে আসি তো!'

যন্ত্রপাতিগুলোর পেছনে একটা পোস্টার দেখতে পেয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে দাঁত কামড়ে তুলে নিল ওটা, আবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে ফিরে এল। ফেলে দিল দুই বন্ধুর সামনে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

প্রায় হাজারখানেকের বেশি হিট ক্যাসেটের বিজ্ঞাপন করা হয়েছে এতে। দাম ধরা হয়েছে অনেক কম। বড় করে ঘোষণা করা হয়েছে ওয়াইল্ড অ্যাঞ্জেলসদের নতুন অ্যালবাম গন টু হেভেনের কথা। নিচে পোস্ট অফিস বক্স নম্বর দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে আগ্রহীদেরকে ক্যাটালগের জন্যে লিখতে।

'পুকুর চুরি করছে এরা! বাপরে বাপ!' কিশোর বলল।

'কিন্তু যে হারে করছে কাজটা,' রবিন বলল, 'হোমারের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। অনেক বড় ব্যাপার-স্যাপার।'

'ওদের কথা থেকেই তো বোঝা গেল, আসল বস্ সে নয়, অন্য কেউ,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

ব্যাপারটা নিয়ে নিচু স্বরে আলোচনা করছে ওরা, এই সময় কথা কানে এল। পরিচিত কণ্ঠ বরি! হলওয়েতে চিৎক... করছে সে, 'হাত সরাও, গণ্ডজিল্লা কোথাকার!'

গর্জে উঠল জ্যাক, 'খবরদার, হাত ভেঙে দেব কিন্তু! সরাও!'

'হে! হে! হে!' করে উঠল বারডি। 'এমন কি করছ তোমরা এখানে মিয়ারা, যে মেশিনগান রাখা লাগে সঙ্গে?'

'গ্যালাক্সি বলছে,' ভারী গলায় বলল দার্শনিক টোগোরফ, 'এইটা গণ্ডগোলের আখড়া! আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া উপায় কি?'

হাঁ করে তাকিয়ে দেখল গোয়েন্দারা, অ্যাডভেঞ্চারারদেরও ঠেলে ঢোকানো হলো বন্ধ ঘরটাতে। ওরাও ধরা পড়েছে

সতেরো

অ্যাডভেঞ্চারারদের ওপর সাবমেশিনগান ধরে রেখেছে হোমার। ওদেরকে বাঁধছে তার দুই গুণ্ডা।

উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। প্রতিযোগিতার আশা তো খতমই, এখন বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

'এরাই টেপ চুরি করেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল বরি।

'আহ্, চুপ থাকুন,' হুঁশিয়ার করল রবিন।

শীতল কণ্ঠে বলল হোমার, 'চুপ থাকলেই কি, আর না থাকলেই বা কি,

গা হবার হয়ে গেছে। এখান থেকে বেরোনোর সুযোগ হবে না কারও।'

'তাই নাকি, টারজান,' হাসিমুখে বলল ববি, 'অতটা খারাপ লোক তো মনে হচ্ছে না তোমাকে। মেয়েদের মেকাপ রুমটা কোথায়?'

বোকা হয়ে গেল মুসা কথা বলে কি ভাবে! পুরো পাগল হয়ে গেল নাকি?

'কি?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল হোমার।

'মেকাপ রুম বোঝো না? ভেঙে বলতে হবে? পায়খানা। এইবার বুঝেছ?'

ভ্রূকুটি করল হোমার। 'ঝিলম, নিয়ে যাও তো।'

হাত বাঁধতে উদ্যত হয়েছিল বড়-নাক গুণ্ডা, সরে গেল। তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ববি, 'খুব হতাশ হয়েছ, না? আহা, একেবারে খোকা। থাক, নাকের জল চোখের জল এক করার দরকার নেই, আমি এখুনি আসছি।'

বেরিয়ে গেল ববি। চোখে সন্দেহ নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল বড়-নাক। ববির পেছনে গেল ঝিলম।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল জ্যাকের, 'হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম! সাতটায় আমাদের শো-এর কি হবে! না গেলেই নয়!'

'শো-টো আর কোনদিন করা লাগবে না,' জানিয়ে দিল হোমার। 'এখানেই ইতি।'

'দূর, এটা একটা কথা হলো নাকি?' ফুরফুরে চুল নেড়ে বলল বারডি, 'শহরটাকে মাত্র গরম করতে শুরু করেছি, এখন এ সব শুনতে ভাল্লাগে না।'

'শীতল করে দেব একেবারে। বরফের মত শীতল।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। চোখ আধবোজা, যেন ধ্যানে মগ্ন। ভাবছে সে, অনুমান করল রবিন। মুসাও বড় বেশি চুপচাপ। তার কাঁধ আর বাহুর মাংসপেশী কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। কি ঘটছে আঁচ করে ফেলল রবিন।

'সরাসরি জবাব চাই আমি,' রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বারডি, 'এই লোকগুলোই রিল চুরি করেছে?'

তার আর টোগোরফের হাত-পা বাঁধা শেষ। জ্যাককে বাঁধতে ব্যস্ত হলো বাদামী চোখো। ববির জন্যে অপেক্ষা করছে বড়-নাক।

'হ্যাঁ,' শত্রুদের অন্যমনস্ক করে রাখার জন্যে বলল রবিন, 'এরা করেছে। জোনস, স্টুডিওতে রেকর্ড করার জন্যে ঢুকলেন কি করে, বলবেন? আমরা তো আর এখান থেকে জ্যান্ত বেরোতে পারছি না, বললে বোধহয় অসুবিধে হবে না আপনার।'

শ্রাগ করল হোমার। অস্থির ভঙ্গিতে সাবমেশিনগানে নড়ল কয়েকটা আঙুল। 'লোক আছে আমাদের। বাড়তি রোজগার করতে চায়, এমন মানুষের অভাব নেই। টেকনিশিয়ানরাও মানুষ।'

'কোনটা করাতে হবে ওদের দিয়ে, জানলেন কি করে?'

'বস্ বলে দিয়েছে। কোনটা হিট হবে বুঝতে পারে সে। কিন্তু গন টু হেভেনের কথা বসের আগে আমি জেনেছি। ওটার জন্যে বড় অঙ্কের টাকা দেবেন বলেছে বস্।'

'এনেছিলেন ঠিকই, ঘাপলাটা করল ঝিলমের বোন বোনটির, তাই না?'

'ওই হদ্দ বোকা মেয়েটার কথা আর বোলো না! কি ঝামেলাটাই না করল! মিশনারিতে ছিল, ফলে নিজেকে নান ভাবতে আরম্ভ করেছে। ভেবেছে ঝিলমকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে। যাবে ঠিকই, তবে অন্য জগতে।'

'ঝিলমকেও খুন করবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হঠাৎ নীরব হয়ে গেল ঘরটা। 'খুন' শব্দটা উচ্চারণ করতে চায়নি এতক্ষণ কেউ।

'আমি করব না,' বরফের মত শীতল হোমারের হাসি। 'আইগার আর টোপাজের ওপর দায়িত্ব দিয়ে দেব।'

নাম শুনে রোমশ পেশীবহুল বাহু বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে হাসল দুই গুণ্ডা। হাসিটা কেমন নিষ্প্রাণ, যেন মানুষ নয়, রোবট। জাত খুনী ওরা। মানুষ খুন করে আনন্দ পায়।

মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত বয়ে গেল মুসার।

'আমি এসেছি,' নেচে নেচে ঘরে ঢুকল ববি।

মেয়েটার মাথা খারাপ, সন্দেহ নেই আর মুসার। নইলে এমন একটা জায়গায় আনন্দ পায় কি করে? বড়-নাক টোপাজ যখন তার হাত বাঁধছে তখনও অনর্গল কথা বলছে আর হাসছে ববি।

'এক ঘন্টা সময় পাবে আর,' হোমার বলল। 'ততক্ষণে বস্ এসে যাবেন। বসে বসে খোদাকে ডাকতে থাকো,' বলে লোকজন নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

'বলদের দল!' বলল ববি।

'পুলিশ কোথায়, জ্যাক?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ওদেরকে খবর দেয়ার কথা ছিল আপনাদের।'

'ইয়ে…মানে,' লজ্জায় পড়ে গেছে যেন জ্যাক। 'অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেলাম…তা ছাড়া ফোন করার টাকাও নেই আমাদের কারও কাছে…'

'ভাল!' বিড়বিড় করল রবিন। ফোন করার টাকাটা দিয়ে আসতে মনে ছিল না বলে বকা দিল নিজেকেই।

'তখন ভাবলাম একবার ঢুকে দেখেই যাই,' ববি বলল। 'কটা বাজে?' কাত হয়ে পড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে জ্যাকের ঘড়িটা দেখল সে। 'সাতটা বেজে গেছে। এখনই যেতে না পারলে প্রতিযোগিতার আশা ছাড়তে হবে।'

'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?' বারডি বলল, 'আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।'

এ কথার জবাব না দিয়ে ববি বলল, 'বাথরুমে একটা জানালা আছে,

বেরোনো যাবে। হলের ভেতর দিয়ে যাওয়া যায়। এসো, তাগাতাগি ক
যাই।'

'মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে!' বিড়বিড় করল জ্যাক। তার সুন্দর মুখটা বিধ্বস্ত লাগছে।

'আমরা নেই আর এই পৃথিবীতে, এটা ধরে নিতে পারো,' বলল বার্কড়ি।

গলা পরিষ্কার করে টোগোরফ বলল, 'অ্যান্ড দা গ্রেভ ইজ নট ইটস গোল।'

'কি বললে? এই সময় অন্তত বুঝিয়ে বলতে অসুবিধে কি?'

টোগোরফের হয়ে কিশোর বুঝিয়ে দিল, 'লঙফেলোর লেখা আ সাম অভ লাইফ থেকে কোট করেছে। এর মানে হলো, আমাদের হাল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বাঁচার জন্যে শেষ চেষ্টা করতেই হবে। মুসা, তোমার দড়ি ছেঁড়া কদ্দূর?'

ঘামে চকচক করছে মুসার মুখ। তার কাঁধ আর বাহুর পেশীর নড়াচড়া বেড়ে গেছে। 'সুবিধে হচ্ছে না। কব্জি বাঁধার সময় তালু বাঁকা করে রেখেছিলাম। বাঁধার পর সোজা করলাম ভেবেছিলাম ঢিল হয়ে যাবে, খুলে ফেলতে পারব।'

'দাঁড়াও, দেখি।' ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরে এসে মুসার বাঁধনটা দেখল রবিন। রক্তে মাখামাখি। 'বাদ দাও, মুসা। পারবে না। শুধু শুধু ছাল উঠছে।'

'আরেকটু দেখি চেষ্টা করে।'

'লাভ হবে না। এ ভাবে টানাটানি করে কিছুই করতে পারবে না।'

হাত মোড়ামুড়ি করে খোলার চেষ্টা বাদ দিল মুসা। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে কাত হয়ে পড়ে রইল।

'খুলে ফেলার মত ঢিল আছে কারও বাঁধন?' জানতে চাইল কিশোর।

সমস্বরে 'না না' করে উঠল সবাই।

'ববি, বাঁধা থাকতে কেমন লাগছে আপনার?'

'ভালই তো। কেন?'

'আপনার হাত সবার চেয়ে ছোট।' শরীর মোচড়াতে লাগল কিশোর। ববির পিঠের কয়েক ইঞ্চি পেছনে চলে এল নাক। 'নড়াতে থাকুন।'

'পারব খুলতে?' টানাটানি শুরু করল ববি।

'দুই তালু একটা আরেকটার ওপর রাখুন,' মুসা বলল। 'তাতে খানিকটা সুবিধে পাবেন।'

কয়েকবার টেনেটুনে হাল ছেড়ে দিয়ে ববি বলল, 'দাঁত দিয়ে কামড়ে কাটলে হয় না?'

জ্যাক বলল, 'দাঁড়াও, আমি কেটে দিচ্ছি।'

'অত সহজ না,' বাধা দিল কিশোর। 'কাটতে হলে ধারাল কিছু দরকার।'

'পকেটনাইফ?' জানতে চাইল বার্কড়ি।

'আছে আপনার কাছে?'
'হাঁটুর কাছের পকেটে।'
জারি গান গাওয়ার মত করে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল অন্য তিন অ্যাডভেঞ্চারার, তাদের সঙ্গে যোগ দিল মুসা ও রবিন।
এই সময় খুলে গেল দরজা। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে টোপাজ। হাতে সাবমেশিনগান।
নিথর হয়ে গেল সবাই। ববি পর্যন্ত।
গটমট করে ঘরে ঢুকল টোপাজ। মাটিতে শুয়ে বন্দিদের মনে হলো অনেক ওপর থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ। ভাল করে সব কজনের বাঁধন দেখল সে। মুসার কব্জিতে রক্ত দেখে রোবটের হাসি হাসল। তারপর সাবমেশিনগানের নল নেড়ে ইঙ্গিতে একবার হুমকি দিয়ে বেরিয়ে গেল।
'হাঁটুর পকেটে, না?' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। এগোতে শুরু করল বারডির দিকে। মুসা আর রবিন তাকে সাহায্য করছে।
এ ভাবে বাঁধা অবস্থায় চেন লাগানো পকেট থেকে ছুরি বের করাটাও সহজ কাজ নয়। তবু অনেক চেষ্টায়, তিনজনে মিলে বের করে আনল ওটা। দাঁতে কামড়ে নিয়ে বারডির আঙুলে ধরিয়ে দিল রবিন। দেখতে লাগল।
ফলাটা খুলে ফেলল বারডি।
জানতে পেরে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ববি, পরক্ষণেই জিভ কামড়ে ধরে চুপ হয়ে গেল। শব্দ শুনে যদি টোপাজ চলে আসে, এই ভয়ে।
খোলা ছুরিটা আবার দাঁতে কামড়ে নিয়ে কিশোরের পেছনে চলে এল রবিন। তার বাঁধনটা আগে খোলার চেষ্টা করবে।
'দেখো, সাবধান,' কিশোর বলল, 'আমার হাত কেটে ফেলো না।'
'হাত, দড়ি, কোনটাই কাটতে পারি কিনা দেখো আগে।'
অবশেষে মুক্ত হয়ে গেল কিশোরের হাত। এরপর অন্যদের মুক্ত করতে তেমন সময় লাগল না। যার যার পায়ের বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াতে লাগল ওরা। হাঁটাহাঁটি করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল।
কিশোর বলল, 'দড়িগুলো রাখতে হবে। টোপাজের জন্যে দরকার।'
'কেন?' জানতে চাইল রবিন।
'ববি ওকে এখানে ডেকে আনবে। আমরা অনেক মানুষ, টোপাজের যত শক্তিই থাকুক, এতজনের সঙ্গে পারবে না। তাকে কাবু করে চলে যাব বাথরুমের জানালার কাছে।'
'তাহলে আর দেরি কিসের?' ববির দিকে তাকাল রবিন।
'টোপাজের কাছে অস্ত্র আছে।'
'ঠিক,' সুর মেলাল বারডি, 'সাবমেশিনগান।'
'অসার চিন্তা-ভাবনা হৃদয়-মন দুটোকেই অচল করে দেয়,' টোগোরফ বলল।

'তা তো বটেই,' ফোড়ন কাটল বারডি। 'পরামর্শ, উপদেশ, অন্যকে সবই দেয়া যায়। নিজে করার মুরোদ আছে ক-জনার? তুমি তো জ্ঞান দান করেই খালাস। নিজে কিছু করছ?'

'সবাই তো আর সব কিছু করে না। পরামর্শটাও একটা বিরাট ব্যাপার,' ঝগড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল মুসা। কব্জিতে রক্ত জমাট বেঁধেছে। অবচেতন ভাবে আঙুল দিয়ে সরাতেই ভীষণ জ্বালা করে উঠল। চুপচাপ সেটা সহ্য করল সে। ভাবল, ঠিক হয়ে যাবে সবই, এখান থেকে বেরোনোর চিন্তাটা আগে করা দরকার। 'আসলেই, অসার চিন্তা না করে সার কিছু করা উচিত।'

নেতৃত্ব নিয়ে নিল মুসা। কাকে কোথায় থাকতে হবে ভাগ করে দিল। সে নিজে রইল দরজার পাশে, যাতে প্রথম আঘাতটা সে-ই হানতে পারে। অন্যপাশে রবিন। ববি রইল এমন জায়গায়, যাতে পাল্লা খুললে ওটার আড়ালে চলে যায় সে। টোপাজ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেবে, বাইরের কেউ যেন ভেতরে কি ঘটছে শুনতে না পারে।

মুসার পেছনে দাঁড়াল জ্যাক, রবিনের পেছনে বারডি। গান গাওয়ার সময় প্রচুর দাপাদাপি করতে হয়, ভীষণ পরিশ্রম, শরীরটা ঠিক আছে বলেই ওদের বিশ্বাস। প্রথম চোটে রবিন আর মুসা টোপাজকে সামলাতে না পারলে হাত লাগাবে ওরা।

কিশোর দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। মারামারিতে সে রবিন আর মুসার চেয়ে কাঁচা। তবু জুডোর কায়দা মোটামুটি শিখেছে কয়েকটা। দরকার পড়লে প্রয়োগ করবে টোপাজের ওপর।

ঘরের পেছনের দেয়ালের কাছে একটা নটিলাস টরসো-আর্ম মেশিনের ওপর চড়ে বসেছে টোগোরফ। দুই হাত ভাঁজ করে রেখেছে কোলের ওপর। বিমল হাসি হেসে সবার দিকে তাকিয়ে ঝাঁকাল কামানো মাথাটা।

'শুরু হোক!' জ্যাক বলল।

হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন করল সবাই।

দরজার কাছে মুখ নিয়ে গেল ববি। চিৎকার করে ডাকল, 'টোপাজ! টোপাজ! জলদি এসো! মরে গেলাম!'

ঘুরে গেল দরজার নব। খুলতে শুরু করল পাল্লা। পুরোটা ফাঁক হলো না। ঘরে ঢুকল টোপাজ।

ঠেলা দিয়ে পাল্লা লাগিয়ে দিল ববি। লোকটার বুক সই করে হাত চালাল মুসা, উরাকেন-উচি মার।

আঘাতটা সহজেই হজম করে ফেলল টোপাজ। সরে গিয়ে ববিকে খুঁজতে লাগল।

চোয়াল সই করে লাথি হাঁকাল রবিন, উশিরো-কেকোমি।

সাবমেশিনগানের বাড়ি মেরে রবিনকে মুসার গায়ের ওপর ফেলে দিল টোপাজ।

জ্যাক আর ডারবির পালা এল। টোপাজের বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে

পড়ল জ্যাক, ডারবি জড়িয়ে ধরল দুই উরু। কিন্তু ঝেড়ে ফেলে দিল ওদেরকে দানবটা।

'এই যে, খোকা,' মেশিনের ওপর বসে থেকে হাসিমুখে বলল টোগোরফ, এত নোংরা হয়ে জন্মালে কেন বলো তো? জন্মের দিনই নিশ্চয় তোমার মা তোমাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিল?'

রেগে গিয়ে শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল টোপাজ। টোগোরফকে ধরতে ছুটল।

সুযোগ পেল কিশোর। আচমকা একটা পা বাড়িয়ে দিল সামনে।

হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে টোপাজ, টোগোরফের পায়ের কাছে। মাথাটা নিচু হয়ে গেছে। একেবারে সময়মত টরসো-আর্ম মেশিনটার হ্যান্ডেলবারটা টেনে নামিয়ে বাড়ি মারল টোগোরফ। ভয়াবহ আঘাত লাগল টোপাজের চোয়ালে। ঘর কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ল সে।

'দৈত্য!' হালকা স্বরে বলল বারডি।

'এক্কেবারে!' একমত হলো মুসা।

'যত বড় হবে তুমি,' ছড়া কাটল টোগোরফ, 'পড়বে তত জোরে।'

দ্রুত হাত চালাল তিন গোয়েন্দা। টোপাজের হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিল। সাবমেশিনগানটা লুকিয়ে ফেলল যন্ত্রপাতির মধ্যে। তারপর রওনা হলো দরজার দিকে।

বেরিয়ে এল ওরা। কেউ নেই। বাথরুমটা কোথায়, ববিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নিয়ে চলল ববি।

ছোট সিঁড়িটা বেয়ে উঠছে ওরা, এই সময় একটা বড় দরজার ওপাশ থেকে কথা শোনা গেল।

হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল কিশোর।

'দাঁড়ালে কেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'চলো, সময় থাকতে বেরিয়ে যাই!'

কিন্তু তার কথা শুনছে না কিশোর। কান পাতল গিয়ে দরজায়। কয়েক সেকেন্ড শুনে ফিরে এসে বলল, 'মনে হলো বিগ বসের গলা...গলাটা চিনি আমি!'

আঠারো

কিশোরের সঙ্গে রবিনও দরজায় কান পাতল। একে একে এগিয়ে এল অন্যেরাও।

সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাতজন, কান ঠেকানো কাঠের দরজায়।

উঁচু, নাকি স্বরে ধমক মারছে, মহাবিরক্ত লোকটা।

'আমারও চেনা লাগছে!' রবিন বলল, কোথায় শুনেছে মনে করার চেষ্টা চালাল।

'তোমাদের মত গাধাদের কথায় বিশ্বাস করার এটাই পরিণতি,' বলল কণ্ঠটা। 'হোমার, তোমার নির্বুদ্ধিতা এবার সীমা ছাড়াল!'

'আইজাক ডেভিড কিউরান!' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর রবিন।

'খাইছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা, 'সাংবাদিক!'

'ওদের বিগ বস্,' কিশোর বলল। 'বড় ব্যাঙ!'

রবিন বলল, 'তার অনেক সুবিধে। মিউজিক ব্যবসায়ে সবার সঙ্গে কথা বলতে পারে সে, পত্রিকায় ছাপার ছুতোয় তথ্য আদায় করে নিতে পারে। জেনে যায় নতুন কি আসছে।'

হঠাৎ হলের আলমারির ভেতরে শব্দ হলো।

'পাইরেট!' বলে উঠল মুসা, 'ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম!'

আবার শব্দ হলো। আলমারির দরজা ভেঙে ফেলবে যেন। লাথি মারছে নিশ্চয় দুই চোর। শব্দ শুনলে দেখতে চলে আসবে হোমার।

'চলো ভাগি!' বলেই দৌড় দিল মুসা।

করিডর ধরে বাথরুমের দিকে দৌড় দিল ওরা।

পেছনে খুলে গেল বড় দরজাটা। ফিরে তাকিয়ে রবিন দেখল, হোমার, আইগার আর ঝিলম ছুটে বেরিয়ে এসেছে। সাবমেশিনগানগুলো নেই ওদের হাতে দরজার ওপাশে একটা বড় ঘর। একটা ল্যাম্পের কাছে বসেছে কিউরান, ব্যাঙের পেটের মত ফোলা পেট ঘেঁষে কোলের ওপর ফেলে রেখেছে হাত দুটো। বেশ অস্থির লাগছে তাকে।

পালানো যাবে না বুঝতে পেরে গোড়ালির ওপর ভর রেখে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল মুসা। দৌড় দিল তিনজনকে লক্ষ্য করে। তার উদ্দেশ্য, সাবমেশিনগানগুলো নিয়ে আসার আগেই লোকগুলোকে কাবু করে ফেলতে হবে। পেছনে ছুটল বাকি ছয়জন।

'আমি আর মুসা আইগারকে ধরব!' রবিন বলল। 'আপনারা বাকি দুটোকে সামলান!'

তেমন কোন ভাবান্তর নেই আইগার রোবটের মুখে। হাত তুলল মারার জন্যে।

তার গায়ের ওপর পড়ল মুসা আর রবিন। প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পড়ে না গেলেও টলে উঠল দানব।

হোমারের ওপর জুডো প্রয়োগ করল কিশোর। শার্টের বুক খামচে ধরে চালাল ও-সোটো-গেরি। টান খেয়ে কাত হয়ে গেল হোমারের শরীর, মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল ডান পা। এই সুযোগে লাথি মেরে তার বাঁ পা-টা মাটি থেকে সরিয়ে দিল কিশোর। পড়ে গেল হোমার। এত দ্রুত আর এত নিখুঁত ভাবে ঘটে গেল পুরো ব্যাপারটা, দেখে কিশোর নিজেই অবাক হয়ে গেল। সে

এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বিশ্বাস করতে পারছে না। জুডো আর কারাত যে কি জিনিস, উপলব্ধি করল আরেকবার।

জ্যাক আর বারডি ধরার চেষ্টা করল ঝিলমকে। কিন্তু ওদের চেয়ে সে বেশি ক্ষিপ্র। চট করে পিছিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে পড়ল অফিসে।

আইগার টলে উঠতেই তার বুকে ইয়োকো-গেরি, অর্থাৎ পাশ থেকে লাথি চালিয়েছে মুসা। পরক্ষণেই মাই-গেরি হাঁকল রবিন, লাথিটা ঠিকমতই লাগল লোকটার চিবুকে। আরও জোরে টলে উঠল দানব।

'আমার পালা!' লাফ দিয়ে এসে পড়ল ববি। দুম দুম করে কিল মারতে লাগল আইগারের পিঠে। তাতে কিছু হলো না দানবটার, তবে তিনদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে হকচকিয়ে গেল। টালমাটাল অবস্থা থেকে সুস্থির হওয়ার সুযোগ দিল না তাকে মুসা আর রবিন। পিটিয়েই চলল। অজ্ঞান করে মাটিতে ফেলে তারপর ক্ষান্ত হলো।

টলমল পায়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে হোমার। কিশোরের সাহায্যে ছুটে এল তার দুই সহকারী। তিনজনে মিলে সহজেই কাবু করে ফেলল লোকটাকে।

এই সময় জ্যাক বলল, 'একটা সমস্যা হয়ে গেল!' অফিসের দিকে হাত তুলল সে।

ঘুরে তাকাল সবাই। টেবিল থেকে সাবমেশিনগানটা তুলে নিচ্ছে ঝিলম। ওটার ট্রিগারে আঙুলের সামান্যতম চাপ মহাসর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে পারে।

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

আলমারির দরজায় দুই চোরের লাথি মারার শব্দ ছাড়া এখন আর কোন শব্দ নেই। অকস্মাৎ মৃত্যুর নীরবতা নেমে এসেছে যেন। টানটান উত্তেজনা। দৌড় দেয়ার চেষ্টা করলেই—ভাবল রবিন—গুলি করবে ঝিলম। হামলা চালাতে এগোলেও একই কাজ করবে। কি করবে ভাবতে ভাবতে চোখ পড়ল কিশোরের ওপর।

শান্তকণ্ঠে ডেকে বলল কিশোর, 'ঝিলম, গুলি করে মানুষ মারলে বোনটির তোমাকে ক্ষমা করবে না।'

'কিন্তু আমি জেলে যেতে চাই না!' কাঁপা গলায় জবাব দিল ঝিলম।

'মানুষ মারলে জেল এড়াতে পারবে না, আরও বেশি শাস্তি হবে। যাদের হয়ে কাজ করছ, তাদেরকেও বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। ওরা তোমার বোন আর তোমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান নিয়েছে। তার চেয়ে আমাদের সাহায্য করো, আমরা আদালতে বলব সে-কথা। আরও বলব, হোমার আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তুমি তাকে ঠেকিয়েছ।'

চুপ করে আছে ঝিলম।

'এই নরক থেকে মুক্তি চাও তুমি। চাও না?' এক পা আগে বাড়ল কিশোর। গুলি করল না ঝিলম। আরও এগোল কিশোর। রবিন দেখতে পাচ্ছে, ভয়ে পিঠ শক্ত হয়ে উঠেছে তার, তবু কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল,

'তোমার বোনও তাই চায়।' এগোতেই থাকল কিশোর। ঝিলমের চার ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল। 'মানুষ খুন করাটা অন্যায়, এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে তোমার বোন।'

'অবশ্যই করবে,' আর চুপ থাকতে পারল না ঝিলম, 'সে খুব ভাল মেয়ে।'

আরও এক পা এগোল কিশোর 'তাহলে বেআইনী কাজ কেন করবে তুমি? মানুষ খুন করে সারা জীবনের জন্যে জেলে যেতে চাও?'

মাথা নাড়ল ঝিলম। চায় না। 'আমি তোমাদের সাহায্য করেছি পুলিশকে সত্যি বলবে?'

'বলব। কথা দিলে কথা রাখি আমরা।' সাবমেশিনগানটার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর। হাত কাঁপছে তার।

দম বন্ধ করে ফেলল রবিন।

কিশোরের চোখে চোখে তাকাল ঝিলম। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল একভাবে। তারপর আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে নল নামাল অস্ত্রের।

সাবমেশিনগানটা চেপে ধরল কিশোর।

হাঁফ ছাড়ল সকলে।

'ভুল করছ তোমরা,' বলে উঠল একটা নাকি কণ্ঠ।

আবার চমকে গেল সবাই। কিউরানের কথা ভুলে গিয়েছিল। টেবিলের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে সে।

'আমাকে যেতে দিলে তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হবে,' ধীরে ধীরে উঠে আবার চেয়ারে বসল কিউরান। তার কুতকুতে চোখজোড়া এক এক করে সবার মুখের ওপর ঘুরে বেড়াল। তিন গোয়েন্দাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমাদের গাড়িটার করুণ অবস্থা হয়েছে, চাকাগুলো সব বাতিল। ওগুলো কেনার টাকা নিতে পারো আমার কাছ থেকে।' অ্যাডভেঞ্চারারদের বলল, 'জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠতে চাও? ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের স্টার বানিয়ে দিতে পারি। সেই ক্ষমতা আছে আমার।'

দুই সহকারীর দিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়ল না, চট করে অ্যাডভেঞ্চারারদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল কিশোর। দেখল, লোভনীয় এই প্রস্তাবে ওদের কোন ভাবান্তর হলো কিনা।

চারজনের জবাবটা দিয়ে দিল রবি, 'স্টার হওয়ার দরকার নেই আমাদের।'

কিউরানের দিকে ফিরল কিশোর, 'টাকার লোভে আপনার মত জঘন্য অপরাধীকে ছেড়ে দেব, ভাবলেন কি করে?'

রাগে লাল হয়ে গেল কিউরানের কুৎসিত মুখটা। হীরার আঙটি পরা আঙুল খামচে ধরল চেয়ারের হাতল। উঠে দাঁড়াচ্ছে।

পালানোর চেষ্টা করতে পারে ব্যাঙটা—ভাবল কিশোর। ঝিলমের হাত থেকে টেনে নিল সাবমেশিনগান।

টোগোরফ ভয় পেয়ে গেল, সত্যি গুলি করে বসবে না তো কিশোর! দৌড়ে এল সে। ধাক্কা দিয়ে কিউরানকে আবার চেয়ারে ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'হিংসাত্মক কার্যকলাপের চেয়ে ঘরের কোণই বেশি শোভা পায় কুনোব্যাঙের।'

'এখন তো চেয়ারে বেশ আছ, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঘরের কোণেই নিয়ে বাঁধব,' হুমকি দিল বারডি।

রাগে তোতলাতে শুরু করল কিউরান।

হেসে উঠল সবাই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল জ্যাক, 'হায় হায়, সাড়ে আটটা বাজে! আমাদের প্রতিযোগিতা!'

'তাই তো!' ঘড়ি দেখে রবিনেরও চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'খুব ভাল হয়েছে! যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তোমার! শেষ পর্যন্ত তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হলো!'

কপালে চাপড় মারল রবিন, 'লজ আমাকে খুন করে ফেলবে!'

নড়ে উঠল আইগার।

একটানে কিশোরের হাত থেকে সাবমেশিনগানটা কেড়ে নিয়ে এক বাড়িতে আবার তাকে আধঘণ্টার জন্যে বেহুঁশ করে দিল টোগোরফ। উদাস ভঙ্গিতে বলল, 'প্রাচীন গুহামানব নিশ্চয় বাড়ি মারার অস্ত্রই আবিষ্কার করেছিল সবার আগে। অব্যর্থ জিনিস!'

মুচকি হেসে টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর। পুলিশকে ফোন করতে হবে।

'এই হলো ঘটনা,' কাহিনী শেষ করে দম নেয়ার জন্যে চুপ করল রবিন। পরদিন, লজের বিশাল ক্যাডিলাকে বসে কথা বলছে সে। সামনের সীটে বসেছে কিশোর। মুসা চালাচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলসে চলেছে ওরা।

নীরব হয়ে আছেন লজ। তাঁর মুখ আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা আকাশের মত থমথমে। কোথায় নিয়ে চলেছে তাঁকে ছেলেগুলো, সেটাও জানেন না। জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করছে না

কিশোর জানতে চাইল, 'আপনার আম্মার অবস্থা কেমন?'

'ভাল,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন লজ। চটে উঠলেন হঠাৎ, 'কিউরানটার নাক ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে! কত্তবড় শয়তান! সব সময়ই সন্দেহ হয় আমার, খবরের কাগজে কাজ করে যা আয় করে, তা দিয়ে এত দামী মার্সিডিজ চালায় কি করে? হীরার আঙটি, দামী দামী পোশাক, এত টাকা কোথায় পায়? এই তাহলে ব্যাপার!'

'মিস্টার লজ, প্রতিযোগিতাটা মিস হলো বলে আমি সত্যি দুঃখিত,' রবিন বলল।

'আমি জানি সেটা। ভুলে যাও। কিছু করার ছিল না তোমার।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। জানালা দিয়ে নীরবে বাইরে তাকিয়ে রইলেন লজ।

দি মিউজিশিয়ানের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল মুসা।

'এখানে কেন?' জানতে চাইলেন লজ।

'মিউজিশিয়ানের প্রেসিডেন্ট বার্নার্ড স্মিথসনের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমাদের,' রবিন জানাল। 'রোববারে তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, জানেনই তো। আপনি আসবেন?'

দ্বিধা করলেন লজ। তারপর বললেন, 'অবশ্যই আসব। স্মিথসনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ কি আর ছাড়ি?'

বিশাল অফিসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন স্মিথসন। স্বাগত জানালেন তিন গোয়েন্দাকে। হাত মেলালেন। লজের সঙ্গে মেলানোর সময় বললেন, 'আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি, মিস্টার লজ। বসুন। আপনার সঙ্গে একটা ব্যবসা করব ঠিক করেছি।' দুর্গন্ধে ভরা সিগার খাওয়ার অনুরোধ করলেন লজকে। রবিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডেমো টেপ এনেছ?'

'ব্যবসা করবেন?' প্রতিধ্বনি করলেন যেন লজ। 'ডেমো টেপ?'

স্মিথসনকে ক্যাসেট দিল রবিন। লজকে বলল, 'টেপটায় অ্যাডভেঞ্চারারদের গান রেকর্ড করেছি।'

সিগারটা নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন লজ। বুঝতে পারছেন না কিছু।

দানবীয় মেশিনটায় ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে প্লে-র বোতাম টিপে দিলেন স্মিথসন। শোনার জন্যে আরাম করে হেলান দিলেন চেয়ারে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে দাঁতে কামড়ে ধরা সিগারটা, দুর্গন্ধে ভরা বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়াচ্ছেন বাতাসে। লজ সহ চারজনে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

প্রথম গানটা শেষ হতেই হাসি ফুটল প্রেসিডেন্টের মুখে। বললেন, 'ভাল।' দ্বিতীয় গানটা শুরু হতে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগলেন টেবিলে। শেষ হলে বললেন, 'একসেলেন্ট!' তৃতীয়টা শেষ হলে বললেন, 'এই গানটা হিট করতে পারে।' সবগুলো গান শোনার পর বললেন, 'চমৎকার!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন লজ, 'ব্যবসাটা কি রেকর্ড বের করার?'

স্মিথসনও উঠে দাঁড়ালেন। 'মিস্টার লজ, চুক্তিটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারলেই আমি খুশি হব। অবশ্যই যদি আপনি আর আপনার গায়কের দল রাজি থাকেন।'

বসে পড়লেন আবার লজ। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাই তাহলে এই ভাবনাটা মিস্টার স্মিথসনের মাথায় ঢুকিয়েছ!'

হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'তাহলে ধরে নিলাম, আপনি রাজি।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন, 'তোমাদের জন্যেও আমার কিছু করা দরকার। কাটা টায়ারগুলো লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? না না, এটাকে পারিশ্রমিক মনে

কোরো না, আমার উপহার।'

'উপহার পেলে মন্দ হয় না,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'না, পেলেও অসুবিধে হত না। সামনে লম্বা ছুটি। কাজ-টাজ করে টায়ারের টাকা ইনকাম করে নিতে পারব।'

ঘড়ি দেখলেন স্মিথসন, 'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। চলো, সেরে আসি কোথাও থেকে।'

এইবার বত্রিশ-দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এইটা হলোগে কথা! চলুন, আমি আপনার শোফার হব।'

পকেট থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করে রবিনের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন লজ, 'টাকাটা রাখো। তোমার ঋণ শোধ করে দিলাম।'

'কিসের?' অবাক হয়ে গেল রবিন।

'মনে নেই, পাঁচ ডলার দিয়ে তিনটে পচা ক্যাসেট কিনেই তো শুরু করলে গণ্ডগোল। তুমি না কিনলে কি আর আমার রেকর্ডিঙের ব্যবসা শুরু হত? সুতরাং, টাকাটা আমার কাছে পাওনা আছ তুমি।'

'থ্যাংকিউ, স্যার,' নোটটা পকেটে রেখে দিল রবিন।

দারুণ রসিকতা। প্রথম হেসে উঠল কিশোর। তারপর প্রেসিডেন্ট স্মিথসন। তারপর লজ, এবং সব শেষে রবিন।

মুসা হাসল না। তাগাদা দিয়ে বলল, 'খালি পেটে হাসি জমে না। ভরপেটে ভাল করে হেসে নেব, তাতে হজমের সুবিধে হবে। উঠুন সবাই।'

হাসি আরও বেড়ে গেল সকলের। হা-হা করে হাসতে লাগল। চমৎকার কাটবে আজ রোববারের দিনটা—ভাবল রবিন।

***
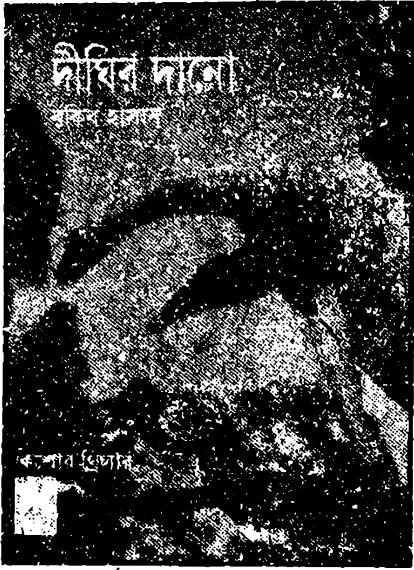
দীঘির দানো

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

ডেইজির তীক্ষ্ণ চিৎকারে ছুটে বেরোল তিন গোয়েন্দা।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসাদের রাঁধুনি।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল মুসা।

হাত তুলে দেখিয়ে দিল মেয়েটা। গোধূলির সবুজ আলোয় অদ্ভুত জিনিসটা পড়ে থাকতে দেখা গেল।

দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল কিশোর।

পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। 'খাইছে! এ তো মানুষের মুণ্ড!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'প্লাস্টিকের।'

মুণ্ডটায় টেপ দিয়ে আটকানো একটুকরো কাগজ, সেটা খুলে নিল। তাতে টাইপ করে লেখা:

ভাল চাইলে ক্রাউন লেক
থেকে দূরে থাকো

ডেইজির দিকে তাকাল কিশোর। 'কি হয়েছিল?'

এখনও ভয় যায়নি মেয়েটার। 'কালো একটা গাড়ি গেটের কাছে এসে থামল। ওটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।'

'লোকটাকে দেখেছ?' জানতে চাইল রবিন।

'না। তবে নাম্বার প্লেটের ওপর চোখ পড়েছে। এখানকার নম্বর নয়।'

নিখুঁত করে তৈরি হয়েছে মুণ্ডটা। কালো কালো ঝাঁটার মত চুল খাড়া হয়ে আছে। দুই বন্ধুর দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বুঝছ?'

'ক্রাউন লেকে যেতে আমাদের বাধা দিতে চায় কে?' রবিনের প্রশ্ন। 'এবং কেন?'

'জানলই বা কি করে আমার মামা আমাদের দাওয়াত করেছে?' মুসাও বুঝতে পারছে না।

আবার ঘরে ফিরে এল ওরা। আলোচনায় বসল ব্যাপারটা নিয়ে।

ঘণ্টাখানেক আগে মুসার ফোন পেয়ে ওদের বাড়িতে এসেছে রবিন আর কিশোর। গেটে দাঁড়িয়েছিল মুসা, হাসিমুখে।

রবিনের গাড়ি থেকে নেমে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? এত জরুরী তলব?'

নাটকীয় ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা, 'চমৎকার একটা রহস্য পেলে কি করবে?'

'চমৎকার রহস্য?'
'বেড়ানো এবং সেই সঙ্গে একটা ভূতুড়ে দুর্গ।'
'আরে বাবা এত ঢাকাঢাকি কেন! খুলেই বলো না!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর।
'চলো, ঘরে চলো। ওখানেই বলব।'
ডাইনিং রুমে এসে বসল ওরা। মুসার বাবা-মা বাড়িতে নেই। বাবা গেছেন কাজে, মা বাজারে। রান্নাঘরে খুটখাট করছিল রাঁধুনি ডেইজি।
চেয়ার টেনে বসে কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো তোমার রহস্যটা কি?'
'আমার রাবুমামার কথা তো তোমাদের বলেছি,' এক এক করে দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল মুসা।
মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'মিস্টার ফায়সাল রাবাত? নিউ ইংল্যান্ডের ক্রাউন লেকে থাকেন যিনি? ওখানকার একটা সামার আর্ট স্কুলে ছাত্রদের ছবি আঁকা শেখান।'
'হ্যাঁ।'
কিশোর বলল, 'রহস্যটা ছবি নিয়ে নাকি?'
অবাক হলো মুসা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। 'তুমি জানলে কি করে?'
'জানতাম না। এমনিতেই বলেছি। তারমানে ব্যাপারটা ছবি?'
'হ্যাঁ। ছবি চুরি যাচ্ছে।'
'ছাত্রদের আঁকা ছবি?' জানতে চাইল রবিন।
'না। অনেক দামী ছবি। ফোনে খোলাখুলি কিছু বলতে পারেনি মামা। দুটো ছবি চুরি গেছে। আর্টিস্টকে নাকি প্রিজনার-পেইন্টার নামে চেনে লোকে।'
'বন্দি-শিল্পী,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল, 'পুলিশ কি বলে?'
'অনেক চেষ্টা করেছে। কোন হদিসই পায়নি। সেই জন্যেই আমাদের খবর দিয়েছে মামা। কিছুদিন গিয়ে তার কাছে থেকে রহস্যটার সমাধান করে দিতে।'
'তারমানে দাম দেন আমাদের,' হেসে বলল রবিন।
'দেবে না মানে?' বুকে টোকা দিয়ে বলল মুসা, 'যা-তা গোয়েন্দা নাকি আমরা? আমাদের কেসের সব খবরই রাখে মামা।'
'নিশ্চয় তুমি জানাও?' ভুরু নাচাল কিশোর।
প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে মুসা বলল, 'কাছেই নাকি একটা পুরানো দুর্গও আছে। ফরাসীরা বানিয়েছিল। তবে এর সঙ্গে ছবি চুরির কোন সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না। বরং ভূতের আছে। পুরানো দুর্গ মানেই তো ভূতের আড্ডা।'

'হলে অসুবিধে কি?' হেসে বলল কিশোর, 'ক্রাউন লেকের ফরাসী ভূতের সঙ্গে পরিচিত হতে খারাপ লাগবে না আমার।'

জবাবে মুসাও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় শোনা গেল ডেইজির চিৎকার—রান্নাঘর থেকে কখন বেরিয়ে গেছে সে, খেয়াল করেনি গোয়েন্দারা।

টেবিলে রাখা মুণ্ডটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'ক্রাউন লেক থেকে দূরে থাকতে বলছে, তারমানে মিলউড আর্ট স্কুলে যেতে বাধা দিতে চাইছে কেউ। রাবুমামা যে দাওয়াত করেছেন আমাদের জানল কি করে লোকটা?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

'তাহলে কখন রওনা হচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কালকেই,' মুসা বলল। 'গরম কাপড় নিয়ে নিয়ো। ওখানে খুব শীত।'

ক্রাউন লেক নিয়ে আলোচনা চলল। মুসাদের বাড়ির লাইব্রেরি ঘেঁটে ম্যাপ আর রেফারেন্স বই বের করল রবিন। মোটামুটি জেনে নিল ক্রাউন লেকের ইতিহাস। এক সময় ফরাসীদের সঙ্গে স্থানীয় ইনডিয়ানদের ভয়ানক লড়াই বেধেছিল ওখানে।

স্কুলের কাছাকাছি একটা জায়গার নাম সেনানডাগা। রেফারেন্স বইতে জানা গেল ওখানে একটা দুর্গ আছে। ছবিও দেয়া হয়েছে বইতে।

'এই দুর্গটাই হতে পারে,' অনুমান করল রবিন। 'চেনা চেনা লাগছে কেন?'

'এর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে নাকি দেখো তো…' বলতে গেল কিশোর।

'দাঁড়াও, মনে পড়েছে!' ঝট করে মুখ তুলল রবিন। 'রকি বীচ মিউজিয়ামে দুর্গটার একটা ছোট পেইন্টিং দেখেছি!'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। আজ তো আর সময় নেই। কাল সকালে গিয়ে ছবিটা দেখে আসব একবার। কি বলো?'

'ঠিক আছে।'

পরদিন সকালে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে বেরোতে পারল না মুসা। যাত্রার জোগাড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত। দশটার মধ্যে মিউজিয়াম থেকে ফিরে আসবে তাকে জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু-জনে।

মিউজিয়ামের মার্বেলের সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে ওপরে সদর দরজার কাছে সবে পৌঁছেছে, এই সময় শেয়ালমুখো এক লোক বেরিয়ে এল। হাতে একটা বড় স্কেচ প্যাড। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কিশোরের গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে দিল। তার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হওয়ার ভঙ্গিতে একবার মাথা নুইয়ে দ্রুত সিঁড়ির ধাপ টপকে নেমে গেল নিচে।

'এক্কেবারে বেখেয়াল,' সেদিকে তাকিয়ে বলল রবিন।

মিউজিয়ামে ঢুকল ওরা। শীতল লবি পেরিয়ে আমেরিকান কালেকশন রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল। সেই সঙ্গে চিৎকার।

ফিরে তাকাল ওরা। চিৎকার করছেন একজন উদভ্রান্ত ভদ্রলোক, নাকের চশমাটা খুলে গিয়ে বুকের ওপর চেনে ঝুলছে। হাত তুলে দরজার দিক দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'ধরো লোকটাকে, থামাও! ছবিটা নিয়ে যাচ্ছে!'

দুই

ঘুরে দৌড় মারল রবিন। পেছনে ছুটল কিশোর।

বাইরে কোথাও দেখতে পেল না শেয়ালমুখো লোকটাকে।

আশেপাশের কয়েকটা গলি দেখে ফেরত এল দু-জনে।

'নিশ্চয় গাড়ি ছিল,' আবার মিউজিয়ামের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল রবিন।

'বোধ হয়,' বলল কিশোর। 'ছবিটা দেখলাম না কেন? স্কেচ প্যাডের মধ্যে লুকিয়েছিল।'

লবিতে দু-জন পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন সেই ভদ্রলোক, তিনি মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। ছেলেদের সঙ্গেও কথা বললেন। ওরাও যা যা দেখেছে বলল।

ভোঁতা স্বরে ডিরেক্টর বললেন, 'সেনানডাগা দুর্গের ছবি কেন চুরি করল বুঝলাম না। আরও অনেক দামী ছবি আছে। তবে আমাদের মিউজিয়ামে প্রিজনার-পেইন্টারের ওই একটা ছবিই ছিল।'

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। এই ছবিটা দেখতেই এসেছে ওরা। মিলউড আর্ট স্কুল থেকে যে চিত্রকরের ছবি চুরি হয়েছে, এটাও সেই একই শিল্পীর আঁকা।

আর কিছু দেখার নেই এখানে। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দু-জনে একটা কথাই ভাবছে: আর্ট স্কুলের ছবি চুরির সঙ্গে কি এই চুরির কোন সম্পর্ক আছে?

ইয়ার্ডে ফিরে দেখল, তৈরি হয়ে এসে ওদের জন্যে বসে আছে মুসা। সব শুনে বলল, 'হুঁ, এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল তাহলে!'

টিকেট নিয়ে এসেছে সে। প্লেন ছাড়তে দেরি নেই। বাড়ি থেকে সুটকেস নিয়েই এসেছে রবিন।

ট্যাক্সিতে করে এয়ারপোর্ট রওনা হলো ওরা। মিউজিয়ামের ছবি চুরির ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা চলল।

পেছনের গাড়িটা সবার আগে মুসার নজরে পড়ল। বলল, 'মনে হচ্ছে অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদের।'

ড্রাইভারকে গতি কমাতে বলল কিশোর।

পেছনের গাড়িটার গতি কমল না। একটা কালো স্যালুন। ওদের গাড়ির

পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে তাকাল একটা লোক।

'আরি!' চিৎকার করে উঠল রবিন, 'সেই লোকটা! শেয়ালমুখো!'

কিশোরও দেখল। স্যালুনটাকে অনুসরণ করার কথা বলল ড্রাইভারকে।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরই স্যালুনটাকে হারাতে হলো। সামনের একটা ট্র্যাফিক পোস্টে ওটা পার হয়ে যাওয়ার পর পরই লাল আলো জ্বলে উঠল। থামতে বাধ্য হলো কিশোরদের ড্রাইভার। আবার সবুজ আলো জ্বলার পর অন্য পাশে এসে আর কোথাও দেখতে পেল না কালো স্যালুনটাকে।

পথে আর কিছু ঘটল না। সন্ধ্যাবেলা ক্রাউন লেকে পৌঁছল ওরা। গাছপালায় ঘেরা চমৎকার একটা হ্রদ। নীল পানি। মিলউড আর্ট স্কুলটা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের কোলে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে সবুজ ঘাসের লন।

খোয়া বিছানো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, 'রাবুমামা ক্লাস নিচ্ছে।'

সব জায়গায় ঢালু নয় লনটা। কোথাও কোথাও সমতল জায়গাও আছে। সে-রকম একটা জায়গায় কয়েকজন তরুণ-তরুণী দাঁড়িয়ে আছে ইজেলের সামনে। তাদের কাছে দাঁড়ানো একজন লম্বা নিগ্রো। গায়ে সাদা শেমিজের মত পোশাক। গোয়েন্দাদের দেখে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এলেন। মুসার মতই ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'এসে গেছিস। আয়।'

এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতটা ধরল মুসা। 'কেমন আছ, মামা?'

'ভাল। পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

মাথা নাড়ল মুসা।

কিশোরের বাড়ানো হাতটা ধরে মিস্টার রাবাত বললেন, 'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা।' রবিনের দিকে তাকালেন, 'তুমি রবিন।'

রবিনও হাত বাড়াল।

রাবুমামা বললেন, 'আমার ক্লাস আজকের মত শেষ। চলো, তোমাদের বাসায় নিয়ে যাই।'

লনের মাঝখান দিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে পথ। সেই পথ ধরে গোয়েন্দাদের নিয়ে চললেন মিস্টার রাবাত।

একপাশের একটা দরজা দিয়ে বড় একটা ঘরে ঢুকল ওরা। তাতে ছড়িয়ে পড়ে আছে ধুলোমাখা ইজেল, ক্যানভাসের রোল, রঙের টিউব বোঝাই বাক্স, আর আরও নানা টুকিটাকি জিনিস—বেশির ভাগই ছবি আঁকার সরঞ্জাম।

'এটা আমাদের স্টোররুম,' রাবাত বললেন।

সরু সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলার ছোট একটা স্টুডিওতে নামল ওরা। পাথরের দেয়াল। বাতাসে রঙের গন্ধ। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কয়েকটা ছবি। ছাতের কাছাকাছি ঘরের একমাত্র জানালাটা। হাতে নাগাল পাওয়া যায় না। একটা লাঠি দিয়ে সেটা খুলে দিলেন রাবাত।

'এইই আমার গুহা,' হেসে বললেন তিনি। 'আরাম করে বসো।

আপাতত এখানেই থাকতে হবে তোমাদের। আমি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে নেব। চুরি হওয়ার আগে অবশ্য এখানে থাকতাম না, ওপরে থাকতাম। ওখান থেকে জানালা দিয়ে আমাদের আর্ট গ্যালারিটা দেখা যায়।'

সুটকেস নামিয়ে রেখে তিনটে বাংকে বসল ছেলেরা।

'অসুবিধে হবে জানি…' রাবাত বলতে গেলেন।

বাধা দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হেসে বলল রবিন, 'না হবে না। নিজেকে বরং আর্টিস্ট-আর্টিস্ট মনে হচ্ছে।'

'আমারও খারাপ লাগছে না,' কিশোর বলল।

'খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোমাদের।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার মুখে, 'হ্যাঁ, এইটা হলোগে কথা। দিলে এখন ইজেলও খেয়ে ফেলতে পারি।'

'এক মিনিট। কাপড়টা পাল্টে নিই।'

মুণ্ডটার কথা মামাকে জানাল মুসা। হুমকি দিয়ে লেখা নোট থেকে শুরু করে রকি বীচ লাইব্রেরিতে চুরি, পথে গাড়িতে শেয়ালমুখোকে দেখার কথা, কিছু বাদ দিল না।

মিলউডের ছবি চুরির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, এ ব্যাপারে ছেলেদের সঙ্গে একমত হলেন রাবাত।

'কিন্তু লোকটা কে বুঝতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'ও রকম চেহারার কাউকে দেখিনি। ভালই চলছিল আমাদের সামার সেশন। পাঁচদিন আগে হঠাৎ খেয়াল করলাম আমাদের গ্যালারির একটা ছবি নেই। পরশু রাতে আরও একটা চুরি হলো। দুটোই প্রিজনার-পেইন্টারের আঁকা।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাড়িটায় এখন তালা দিয়ে রাখতে হয়। আবার কখন চুরি হয়ে যায় এই ভয়ে।'

'কাল থেকে তদন্ত শুরু করব,' কিশোর বলল।

'ঠিক আছে। ছাত্রদের সঙ্গে মিশে যাবে। সূত্র বের করার চেষ্টা করবে। ওদেরকে সন্দেহ করতে খারাপই লাগছে আমার।'

'এই প্রিজনার-পেইন্টারের ব্যাপারে কিছু বলবেন?'

'বলতে পারি,' হাসলেন রাবাত। 'তবে আমার চেয়ে অনেক ভাল বলতে পারবেন মিস্টার হেনরি মেলভিল। প্রিজনার-পেইন্টারের বংশধর তিনি। তার কাছেই বরং শুনো।'

'যিনি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। তোমাদের কথা আমি তাঁকে বলেছি। আজকে দেখা করতে পারবেন না। ব্যাটল বার্ষিকী পালন করবেন।'

'কি বার্ষিকী!' মুসা অবাক।

'ব্যাটল মানে জানিসনে? লড়াই, লড়াই,' হেসে বললেন রাবাত। 'ছবিতে মিস্টার মেলভিলের যেমন আগ্রহ, মিলিটারি সাইন্সের ব্যাপারেও তেমন। কাল কথা বললেই বুঝবি।'

'বেশ, প্রিজনার-পেইন্টারের কথা নাহয় তাঁর মুখ থেকেই শুনব।' অনুরোধ করল রবিন, 'ভূতুড়ে দুর্গটার কথা বলতে তো নিশ্চয় অসুবিধে নেই?'

'সেনানডাগা?' রাবুমামার চোখেও ছড়িয়ে পড়ল মিটিমিটি হাসি। 'অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে ওখানে। ওটার ব্যাপারেও মিস্টার মেলভিলের কাছেই শুনো।'

খাওয়ার পর ওদেরকে ডেভেনপোর্ট ম্যানসনে নিয়ে গেলেন রাবাত। হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরানো বাড়িটা। দু-জন মাত্র কাজের লোক বাড়িটায়—একজন রাঁধুনি আর একজন পার্ট-টাইম শোফার। মালীর কাজও সে-ই করে।

'তোরা যদ্দিন থাকবি,' মামা বললেন, 'আমাকেও এখানে খেতে অনুরোধ করেছেন মিস্টার মেলভিল।'

খিদে পেয়েছে। তার ওপর চমৎকার রান্না। গলা পর্যন্ত গিলল ছেলেরা। তারপর ওদেরকে নিয়ে বেরোলেন রাবাত। স্কুল এলাকাটা ঘুরে দেখানোর জন্যে। জানালেন, স্কুলের যত্ন-আত্তি ছাত্ররাই করে। কাছেই সিডারটাউন গ্রামে ঘর ভাড়া করে থাকে ওরা। ছবি আঁকার সরঞ্জাম, শিক্ষকদের খরচ, এমন কি দরিদ্র ছাত্রদের ঘর ভাড়ার খরচও বহন করেন কোটিপতি মেলভিল। শহরের কয়েকজন সৌখিন চিত্রকরও এসে ছুটির দিনে স্কুলে ছবি আঁকার চর্চা করে।

স্টুডিওটা দেখালেন রাবাত। গ্যালারির ভেতরে ঢোকা গেল না, বাইরে থেকে দেখালেন। তারপর নিয়ে এলেন ম্যানশনের লাগোয়া একটা বোটহাউসে। জেটিতে কয়েকটা ক্যানু জাতীয় নৌকা বাঁধা। ছাত্রদের ব্যবহারের জন্যে রাখা হয়েছে।

দেখা শেষ করে আবার মাটির নিচের ঘরটায় ওদেরকে নিয়ে এলেন তিনি।

তিন

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলতেই ওপরের জানালাটায় একটা অপরিচিত মুখ নজরে পড়ল রবিনের। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই সরে গেল মুখটা।

কিশোরও চোখ মেলল।

রবিনকে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'কে জানি তাকিয়েছিল। সুবিধের লোক মনে হলো না।'

হেসে উঠল কিশোর, 'হবে হয়তো কোন ছাত্রটাত্র। উঁকি দিয়ে দেখতে এসেছিল স্যার আছে নাকি। ওঠো। মুসাকে ডাকো। আমি বাথরুমে যাচ্ছি।'

ম্যানশনে গিয়ে নাস্তা সেরে এল ওরা। ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইজেল দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে অনেক ছাত্র। ইজেল হাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এক তরুণ।

ওর দিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'সকালে একেই দেখেছি।'

এগিয়ে এল তরুণ। গায়ে ধূসর শেমিজ। মুখটা লম্বাটে, মোটা ঠোঁট, উদ্ধত ভাবভঙ্গি। কাছে এসে চোখ সরু সরু করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা এখানে নতুন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'মিস্টার রাবাতের মেহমান। ছবি আঁকার ব্যাপারে তাঁর কাছে কিছু পরামর্শ নিতে এসেছি।'

নিজেদের পরিচয় দিল সে, অবশ্যই গোয়েন্দা কথাটা বাদ দিয়ে।

সন্দিহান চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে তরুণ বলল, 'আমার নাম রিক ডগলাস।' বিরক্ত স্বরে বলল, 'কিছু গবেষণা করার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু মিস্টার রাবাত যা শুরু করেছেন তাতে আর কিছুই করতে পারব না। দুটো সাধারণ ছবি নাহয় চুরি হলোই, তার জন্যে সমস্ত বাড়িতে তালা লাগিয়ে রাখতে হবে! তোমাদের বিরক্ত করছি মনে হয়। চলি।'

ওরা কিছু বলার আগেই তাড়াহুড়ো করে চলে গেল রিক।

'সাহস আছে বলতে হবে,' মুসা বলল। 'রাবুমামা সম্পর্কে এ ভাবে কথা বলে! আমাদের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল কেন?'

'জানি না,' কিশোর বলল। 'তবে আমাদের ব্যাপারে কৌতূহল আছে তার, এটা বোঝা গেছে।'

এই সময় সাদা শেমিজ পরা রাবাত এসে দাঁড়ালেন ওদের কাছে। রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, 'জরুরী ক্লাস আছে আমার। মিস্টার মেলভিলের সঙ্গে তোমাদের দেখা করাটাও জরুরী। চলো, আগে দিয়েই আসি তোমাদের।'

গোয়েন্দাদের নিয়ে রওনা হলেন মেলভিলের ম্যানশনের দিকে।

সেখানে পৌঁছে বারান্দা ধরে কিছুদূর এগিয়ে একটা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলেন। কাঠের প্যানেল দেয়া হলঘরের শেষ মাথায় বড় একটা দরজা দেখিয়ে বললেন, 'ওটা তাঁর স্টাডি। চলে যাও। তিনি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি যাই। পরে কথা বলব।'

ওদের রেখে তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন তিনি।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। টোকা দিল।

কয়েক সেকেন্ড পর ভেতর থেকে ভারী গলায় সাড়া এল, 'এসো।'

ভেতরে ঢুকল ওরা। পেছনে দরজাটা লাগিয়ে দিল মুসা। বড় একটা ঘরে ঢুকেছে। ছাত অনেক উঁচুতে। জানালায় ভারী পর্দা লাগানো। সেগুন কাঠের ডেস্কের ওপাশে দেয়াল জুড়ে বইয়ের তাক। পাশের দেয়ালে একটা ব্ল্যাকবোর্ড।

ঘরে আলো খুব কম। চোখে সয়ে এলে কিশোরের গায়ে কনুই ঠেকাল

রবিন, ফিসফিস করে বলল, 'দেখো!'

একটা গদিতে হাঁটু গেড়ে আছেন চিত্রকরের সাদা শেমিজ পরা, ধূসর-চুল ছোটখাট একজন মানুষ। হাতে একটা লম্বা বেত। টয় লগ দিয়ে মেঝেতে দুর্গের একটা মডেল তৈরি করেছেন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে।

'দূর! কিচ্ছু হয়নি!' বলে হঠাৎ বেত দিয়ে এক খোঁচা মেরে মডেলটা কাত করে ফেলে দিলেন।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

ফিরে তাকালেন তিনি। 'এসেছ।'

মুসা বলল, 'আপনি মিস্টার মেলভিল।'

'হ্যাঁ। তুমি ফায়সাল রাবাতের ভাগ্নে। এরা দু-জন তোমার বন্ধু। তোমরা এসেছ, খুশি হয়েছি।' বেত তাক করে রবিন আর কিশোরকে দেখালেন মিস্টার মেলভিল। নেমে এলেন গদি থেকে। কাছে এলে দেখা গেল তাঁর চোখ নীল। বসতে বললেন ছেলেদের।

চেয়ারে বসল তিন গোয়েন্দা।

একটা জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে এসে তিনিও বসলেন। ছেলেদের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বলো তোমাদের কথা।'

মুণ্ড ফেলে এসে তাদেরকে যে হুমকি দেয়া হয়েছে সে-কথা বলল কিশোর। রকি বীচ মিউজিয়ামে ছবি চুরির কথা জানাল।

ছবিটা সেনাসডাগা দুর্গের, এ কথা জেনে উঠে দাঁড়ালেন মেলভিল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করলেন।

'প্রিজনার-পেইন্টারের কথা আমাদের কিছু বলবেন, মিস্টার মেলভিল?' অনুরোধ করল রবিন। 'ভূতুড়ে দুর্গটার ব্যাপারেও জানতে চাই।'

এই সময় দরজার কাছে একটা খসখস শব্দ কানে এল মুসার। সন্দেহ হলো, আড়ি পেতে কেউ কথা শুনছে। লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল সে। নব ধরে মোচড় দিয়ে একটানে খুলে ফেলল পাল্লা।

কেউ নেই। তবে ছুটন্ত পদশব্দ কানে এল, বারান্দা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে।

বেরিয়ে গেল মুসা। লোকটাকে চোখে পড়ল না।

হতাশ হয়ে স্টাডিতে ফিরে এল সে।

প্রশংসা করলেন মেলভিল, 'তোমার কান খুব খাড়া। ভাল গোয়েন্দা তোমরা। তোমার মামা ঠিকই বলেছে।'

চার

আড়ি পেতেছিল যে লোকটা, সে কোন সূত্র ফেলে গেছে কিনা দরজার কাছে

গিয়ে দেখে এল কিশোর। কিছু পেল না।

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল রবিন। ভূতুড়ে দুর্গটার কথা জানতে চাইল।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মেলভিল বললেন, 'একজন পাহারাদার রেখেছিলাম দুর্গে, সে পালিয়েছে।'

'আপনি রেখেছিলেন?' অবাক হয়ে বলল রবিন।

'হ্যাঁ। কারণ দুর্গটার মালিক আমি। আমাকেই তো রাখতে হবে।'

'পালাল কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ভয়ে। ভূতের অত্যাচারে। তার ধারণা দুর্গটায় ভূতের আড্ডা, পুরো এক সেনাবাহিনী ওদের। রাতের বেলা অদ্ভুত শব্দ করে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মেলভিল। 'কয়েকবার নাকি মরতে মরতে বেঁচেছে।'

'মানে?'

'দুই বার পাথর খসে পড়েছে তার ওপর। সময় মত শব্দ শুনে সরে যেতে পেরেছে বলে রক্ষা। আমি অবশ্য এ সব কিচ্ছা বিশ্বাস করি না।'

'এখন আর কেউ নেই পাহারায়?' জানতে চাইল রবিন।

'না। তবে একটা ব্যাপার ভাল হয়েছে,' কথাটা বলার সময় খুশি মনে হলো মেলভিলকে, 'ভূতের কথা ছড়িয়ে পড়ায় কেউ আর দুর্গের কাছে যায় না। ট্যুরিস্টের হাত থেকে বেঁচেছি। যাকগে, ওটার কথা থাক। আগে ছবি চুরির কিনারা করা দরকার।'

মেলভিলের পূর্বপুরুষ প্রিজনার-পেইন্টারের ব্যাপারে জানতে চাইল গোয়েন্দাবা।

মেলভিল বললেন, 'অনেক বড় যোদ্ধা ছিলেন মেডিল মেলভিল। দক্ষিণ আর উত্তরের মধ্যে যখন গণ্ডগোল শুরু হলো, তখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হয়েছিলেন। দুর্দান্ত সাহস ছিল। লড়াই করতে করতে একদিন শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়লেন। অনেক ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর ধরা পড়লেন। তাঁকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখা হলো ওই দুর্গে।'

'দুর্গটা কোন দিকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দক্ষিণে। লেকের পাড়ে।' বিশাল জানালাটা দিয়ে বাইরের দিক দেখালেন মেলভিল। 'ওই টিলাটা না থাকলে এখান থেকেই দেখতে পেতে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। যুদ্ধও শেষ হলো, মেডিল মেলভিল মারা গেলেন। বন্দি হওয়াতে একটা লাভই হলো, সেনানডাগা দুর্গের অসামান্য সতেরোটা ছবি উপহার পেয়েছি আমরা। দুর্গে বসে বসে এঁকেছিলেন ছবিগুলো।'

মেলভিল জানালেন, মেডিলকে সবাই খুব পছন্দ করত, এমন কি তাঁর শত্রুরাও করত যারা তাঁকে বন্দি করেছিল। সুতরাং তাদেরকে দিয়ে রঙ-তুলি-ক্যানভাস জোগাড় করতে অসুবিধে হয়নি তাঁর।

'দুর্গের চারপাশের এলাকা খুব স্পষ্ট করে এঁকেছেন তিনি,' মেলভিল বললেন।

'সে-জন্যেই কি আকৃষ্ট হয়েছে চোর?' রবিন জানতে চাইল।

'মনে হয় না। অন্য কারণ আছে। গুজব রয়েছে দুর্গের মধ্যে ফরাসীদের রেখে যাওয়া গুপ্তধন আবিষ্কার করেছেন মেডিল। সেগুলোর সূত্র রেখে গেছেন ছবিগুলোতে। আমার বাবা আর চাচা এ কথা বিশ্বাস করত না। কিন্তু আমি করি। তাই দু-বছর আগে দুর্গটা কিনে নিয়েছি।'

'ছবির মধ্যে সূত্র রেখে গেছেন!' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। হয় ছবিগুলোতে, নয়তো ফ্রেমের মধ্যে। ফ্রেমগুলো অদ্ভুত দেখতে। ওগুলোও অনেক দামী। বেশ কিছু ফ্রেম নষ্ট হয়ে গেছে—পড়ে গিয়েছিল কিংবা খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি কেনার পর মেরামত করে নিয়েছি।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'স্কুলের গ্যালারিতে ক'টা ছবি আছে এখন?'

'পনেরোটা। দুটো চুরি হয়ে গেছে।'

'রকি বীচ মিউজিয়ামে ছিল একটা, চুরি হয়েছে। আপনার জানামতে আর কারও কাছে আছে মেডিলের ছবি?'

রাগ ফুটল মেলভিলের চেহারায়। 'একটা ছবি এমন একজনের কাছে আছে যার কাছে থাকাটা মোটেও উচিত নয়। তবে ওটা আমি ফেরত আনব।'

তাঁর কথাটা রহস্যময় লাগল গোয়েন্দাদের কাছে। কিছু জিজ্ঞেস করল না।

মেলভিল বলতে থাকলেন, 'আরেকটা আছে একজন ইংরেজ সাধুর কাছে। নিলামে কিনেছেন বহু বছর আগে। টার্টল আইল্যান্ডে থাকেন।'

'গুপ্তধনের কোন সূত্র কেউ বের করতে পারেনি, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। আমিও এখানে আসার পর থেকে চেষ্টা করছি। কিছুই বের করতে পারিনি।'

'কি আছে? জানেন? রত্ন, না সোনার মোহর?'

'একটা শেকল—বুম চেন। ওই শেকলে গাছের কাণ্ড বেঁধে ফরাসী আর ইনডিয়ানদের যুদ্ধের সময় জাহাজ আটকে দেয়া হত। আইডিয়াটা দারুণ!'

'একটা যুদ্ধের শেকলের এতই দাম নাকি?' রবিন বলল, 'অ্যানটিক ভ্যালু নিশ্চয়।'

'সে-তো বটেই। আরও ব্যাপার আছে। ওই শেকলটাকে বলে চেইনি ডি'অর। খাঁটি সোনার তৈরি।'

'সোনা!' একসঙ্গে বলে উঠল তিন গোয়েন্দা।

খুলে বললেন মেলভিল। যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে প্রথম যে শেকলটা তৈরি করা হয়েছিল, ওটা লোহারই ছিল। ১৭৬২ সালে সেনানডাগা দুর্গের নির্মাতা এবং কমান্ডার মারকুইস লুইস ডা শ্যাম্বর ওটার একটা নকল বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, দুর্গের বাইরে ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে। তবে এ নিয়ে

মতভেদ আছে। কারও কারও ধারণা, ও রকম কোন চেইনি ডি'অর তৈরিই হয়নি।

'তবে আমার বিশ্বাস,' জোর দিয়ে বললেন মেলভিল, 'বানানো হয়েছে। সে-জন্যেই ছবি চুরির তদন্ত করতে আনার জন্যে যখন তোমাদের কথা বলল রাবাত, উৎসাহিত হলাম। আমি চাই ছবি-চোরকে ধরো তোমরা, তারপর শেকলটা খুঁজে বের করো।'

'স্কুলের কোন ছাত্রকে সন্দেহ হয় আপনার?'

মাথা নাড়লেন মেলভিল। 'না, হয় না। সবারই বয়েস খুব কম। এ ধরনের ছবি চুরিটুরির ব্যাপারে সাধারণত কম বয়েসীদের আগ্রহ থাকে না।' এই প্রথম হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'তবে কম বয়েসীদের খিদে খুব বেশি থাকে। তোমাদের কি অবস্থা?'

মুসার মুখেও হাসি দেখা গেল। 'আপনি বলাতে মনে হলো, স্যার।'

লেকের দিকের বারান্দায় ওদেরকে নিয়ে এসে বসলেন মেলভিল। স্যান্ডউইচ আর চা দেয়া হলো।

রাঁধুনি আর শোফারকে সন্দেহ হয় কিনা, মেলভিলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হয় না। আগে খুব ভাল ভাল জায়গায় কাজ করেছে। স্বভাব খারাপ হলে করতে পারত না।'

প্রতিবাদ করল না কিশোর। তবে পুরোপুরি নিশ্চিতও হলো না। কার যে কখন কি কারণে স্বভাব খারাপ হবে বলা যায় না।

খাওয়ার পর মেলভিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ম্যানশন থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন—তদন্তের খাতিরে তাঁর এলাকার যেখানে খুশি যেতে পারে ওরা, কোন বাধা নেই।

স্কুল কম্পাউন্ডে ফিরে এল ওরা।

অনেকগুলো বার্চ গাছের ঘেরের মধ্যে লম্বা একটা বাড়ি দেখাল কিশোর। 'ওখানে গেলে কেমন হয়? যেখান থেকে ছবি চুরি হয়েছে সেখান থেকেই তদন্ত শুরু করি।'

'মন্দ হয় না,' রবিন বলল। 'কিন্তু চাবি?'

'রাবুমামার কাছ থেকে নিয়ে নেব। মিস্টার মেলভিল তো অনুমতি দিয়েই দিয়েছেন, অসুবিধে হবে না।'

সুতরাং মুসা গিয়ে চাবি নিয়ে এল।

লম্বা লন পার হয়ে পাথরে তৈরি পুরানো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরটায় হালকা আলো, আর বেশ শীতল। তিন দিকের দেয়ালে জানালা নেই। মাথার ওপরের স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে। তাতে বেশ ভালমতই দেখা যায় ছবিগুলো। গোটা পঞ্চাশেক হবে। একধারে রয়েছে মেডিল মেলভিলেরগুলো। একেকটা ছবিতে একেক ভাবে দেখা যাচ্ছে

দুর্গটাকে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আঁকা হয়েছে।

ফ্রেমগুলো আসলেও অদ্ভুত। কোণগুলো অনেক বেশি ঠেলে বেরিয়ে আছে, তাসের হরতনের মত দেখতে। কিছু বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে নাকি ওগুলো দিয়ে?

'দেখো,' হলুদ রঙের একটা নকশা দেখাল রবিন।

অর্ধেকটা খসে পড়েছে ওটার। দুর্গের ছবিগুলোর কাছে ঝোলানো।

কাছে গিয়ে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। পুরানো পার্চমেন্টে আঁকা হয়েছে দুর্গের একটা নকল নীল নকশা। আসলটা দেখে দেখে নিশ্চয় আঁকা হয়েছিল এটা। ছেঁড়া অংশটা না থাকলেও অনুমান করা যায়, দেখতে কেমন ছিল।

মাথা নাড়ল রবিন, 'এই নকশার মত করেই ছবির ফ্রেমগুলো তৈরি। দেখো।'

কিশোরও মাথা নাড়ল। 'পুলিশ নিশ্চয় খুঁজে গেছে এখানে। তা-ও আমরা আরেকবার দেখি, কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

'চোরের সূত্র?' মুসার প্রশ্ন।

'হতে পারে।'

তিন দিকে ছড়িয়ে গেল ওরা। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে পাথরের মেঝেতে খুঁজল, দেয়ালগুলো দেখল।

ঘণ্টাখানেক পর ক্ষান্ত দিল।

হাত ঝাড়তে ঝাড়তে রবিন বলল, 'নাহ্, কিচ্ছু নেই।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'ছবিগুলোর পেছনে দেখব নাকি?'

'কি আর থাকবে,' মুসা বলল।

রবিন বলল, 'তবু দেখা দরকার। কিছু বাদ দেয়া উচিত না।'

দুর্গের ছবিগুলো দেয়াল থেকে নামিয়ে ফ্রেমের ধারগুলো আর পেছনটা পরীক্ষা করতে লাগল ওরা।

খানিক পরে ডাক দিয়ে বলল মুসা, 'দেখো তো কিশোর, এটা কি?'

এগিয়ে এল রবিন আর কিশোর।

ছবির পেছনে আলগা কাগজ সেঁটে দেয়া হয়েছে ক্যানভাসটা যাতে দেয়ালে লেগে থেকে নষ্ট না হয় সে-জন্যে। সেই কাগজের ওপর রঙ লেগে আছে।

শুঁকে দেখল কিশোর। 'ইদানীং লেগেছে এটা। আঙুলের ছাপ নেই।'

একটা কাগজে ঘষে ওই রঙ লাগিয়ে নিল সে। পকেটে রেখে দিল।

মুসা বলল, 'চোরটা মনে হচ্ছে আর্টিস্ট?'

'হতেও পারে,' কিশোর বলল।

আর কিছু দেখার নেই। গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। তালা লাগিয়ে দিল।

'কোথায় যাব?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রাবুমামার কাছে,' জবাব দিল কিশোর। 'এই রঙ কে ব্যবহার করে জানতে হবে।'

ক্লাসের বিরতি হয়েছে। বিশ্রাম নিচ্ছে ছাত্ররা।

গোয়েন্দাদের দেখে ছাত্রদের জটলা থেকে বেরিয়ে এল রিক ডগলাস। কোন রকম ভূমিকা না করে বলল, 'গ্যালারিতে ঢুকলে দেখলাম?'

'বেড়াতে এসেছি তো। ছবি দেখতে ঢুকেছিলাম,' কিশোর বলল। 'তো, কি ছবি আঁকছেন?'

'তৈলচিত্র। দেখতে চাও?'

'না, এখন সময় নেই। পরে। থ্যাংকস।'

কিছুটা হতাশই মনে হলো যেন রিককে। মুখ গোমড়া করে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইল।

দুই সহকারীকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে রিক।

স্টোরেজ রুমে পাওয়া গেল রাবুমামাকে। রঙের বাক্স খুলছেন।

পকেট থেকে রঙ মাখা কাগজটা বের করে দিল কিশোর। বলল কোথায় পেয়েছে।

এক নজর দেখেই মাথা নাড়লেন তিনি, 'এটা দিয়ে চোর ধরতে পারবে না। অনেকেই ব্যবহার করে। একে বলে অ্যালিজারিন ক্রিমসন।'

রঙ ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে হাতে রঙ লেগে গেছে তাঁর। তারপিন আর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ছেলেদের নিয়ে খেতে চললেন মেলভিলের রান্নাঘরে।

খাওয়া শেষ করে লেকের পাড়ে চলল গোয়েন্দারা, বোটহাউসটা দেখার জন্যে।

টিলাটা পড়ল সামনে—ম্যানশনের জানালা দিয়ে যেটা দেখা যায়, যার জন্যে দুর্গটা চোখে পড়ে না। টিলার কাছে উঠে এসে পাশ দিয়ে উঁকি দিল।

দেখতে পেল সেনানডাগা দুর্গ।

কিশোর বলল, 'কাল দেখতে যাব ওটা।'

বোটহাউসে নতুন কিছু দেখা গেল না।

মাটির নিচের ঘরে ফিরে এল ওরা। রাবুমামার কাছ থেকে ছবি আঁকার ওপর লেখা কয়েকটা বই চেয়ে নিয়ে পড়তে বসল রবিন আর কিশোর। ছবি-রহস্যের সমাধান করতে হলে ছবি সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানা দরকার।

মুসার কিছু করার নেই। চুপচাপ শুয়ে রইল সে।

কিছুক্ষণ পর তিনজনেই ওপরতলায় উঠে এল রাবুমামার সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে।

হঠাৎ বিকট শব্দ হলো।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'নিচে থেকে এসেছে!'

দুরদার করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল চারজনে। বাতাসে

বারুদ পোড়া গন্ধ।

সবার আগে নামল মুসা। সিঁড়ির গোড়ায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। 'খাইছে!'

ওদের মালপত্রগুলো যেখানে রেখেছে সেখানকার দেয়ালে লেপটে রয়েছে লাল রঙের তরল পদার্থ।

জানালার নিচ থেকে একটা গুলির খোসা কুড়িয়ে নিল রবিন। 'কিশোর, দেখো, শটগানের গুলি! লাল কি লেগে আছে!'

'র-র-রক্ত!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।

খোসাটা নিয়ে লাল জিনিসটা কি দেখে বললেন রাবুমামা, 'না, রঙ! অ্যালিজারিন ক্রিমসন!'

মাটিতে পড়ে আছে একটা ছোট তুলি। তাতে প্যাঁচানো একটুকরো কাগজ।

সেটা খুলে নিল কিশোর। টাইপ করে লেখা রয়েছে:

আপাতত দেয়ালে রঙ ছড়ালাম।
এরপর ছড়াব রক্ত।
এবং সেটা তোমাদের।
মিলউড ত্যাগ করো তিন গোয়েন্দা।

পাঁচ

ভয়ে ভয়ে জানালাটার দিকে তাকাল মুসা। যেন শটগান নিয়ে ওত পেতে থাকা লোকটাকে দেখতে পাবে। বলল, 'আবার হুমকি! মনে হয় সেই একই লোক, মুণ্ড ফেলে গেছিল যে।'

'তোমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, এটা ঠিক,' রাবুমামা বললেন। 'শটগানের কার্তুজের গুলিগুলো ফেলে দিয়ে তার জায়গায় রঙ ভরে নিয়ে দেয়াল সই করে মেরেছে।'

মুণ্ডতে জড়ানো নোটটা বের করে মিলিয়ে দেখল কিশোর, 'একই টাইপরাইটারে টাইপ করা।'

ঢোক গিলল মুসা। 'তার মানে রকি বীচের লোকটাই আমাদের পেছন পেছন এখানে এসে হাজির হয়েছে?'

'হতে পারে।'

টর্চের সাহায্যে জানালার নিচেটা ভালমত খুঁজে দেখল ওরা। ভাঙা কাঁচ পড়ে আছে শুধু। আর কিছু নেই।

'কাজটা কার?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

রাবুমামার দিকে তাকাল রবিন। 'রিক ডগলাস নয় তো? সকাল থেকেই

আমাদের পেছনে লেগেছে সে। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল।'

'আমার মনে হয় না। মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে যায় বটে, সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তবে তাকে ক্রিমিন্যাল মনে হয় না।'

রাবুমামার সঙ্গে আবার ওপরতলায় উঠে এল তিন গোয়েন্দা।

তিনি জানালেন, 'আসছে রোববার, সেনানডাগা ডে-তে একটা মেলা হবে। তার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে। খুব ব্যস্ত থাকব। তদন্তের কাজে তোমাদের খুব একটা সাহায্য করতে পারব না।'

তিনি বললেন, প্রতিবছরই পালিত হয় সেনানডাগা ডে। এই সময় জনসাধারণের জন্যে খুলে দেয়া হয় দুর্গটা।

'এই মেলা করার উদ্দেশ্য, ট্যুরিস্ট আকৃষ্ট করা,' রাবুমামা বললেন।

কথাও শুনছে, মাথায় ভাবনাও চলেছে কিশোরের। গুলির খোসাটা কার, জানা দরকার। এই এলাকায় বন্দুকের দোকান কোথায় আছে জিজ্ঞেস করল মামাকে। তিনি জানালেন, একটাই আছে, এবং সেটা সিডারটাউনে।

ঠিকানা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মামা বললেন, 'দোকানদারের নাম এড ভিনজার। শৌখিন চিত্রকর। ছুটির দিনে আমাদের স্কুলে ছবি আঁকা শিখতে আসে।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে নিচে নেমে এল গোয়েন্দারা।

কাঁচ ভাঙা জানালায় কয়েকটা পাতলা কাঠ আটকে দিয়ে ঘুমাতে গেল।

নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়ল। সিডারটাউন গাঁয়ে এসে গির্জাটা পেরোতেই দেখতে পেল এড ভিনজারের বন্দুকের দোকান। কিন্তু বন্ধ : আগামীকালের আগে খুলবে না।

কাল আবার আসবে, ঠিক করে, বন্ধুদের নিয়ে ফিরে চলল কিশোর।

স্কুলে ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। দুপুরের খাওয়া শেষ করে ছাত্রদের ছবি আঁকা দেখতে এল ওরা। আসলে রঙের ব্যাপারে তদন্ত করার ইচ্ছে।

নিচু স্বরে কিশোর বলল, 'কে কে অ্যালিজারিন পেইন্ট ব্যবহার করে দেখো।'

ভাগাভাগি হয়ে গেল তিনজনে।

লাল চুল, হালকা-পাতলা একটা ছেলের পেছনে এসে দাঁড়াল মুসা। চমৎকার ছবি এঁকেছে ছেলেটা।

মুসা বলল, 'বাহ্, সুন্দর। কি আঁকলে? সব্জি বোঝাই ঠেলাগাড়িতে বাজ পড়েছে বুঝি?'

ফিরে তাকাল ছেলেটা। এক মুহূর্ত মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসল। 'ভাল লাগছে? গাড়িটাড়ি কিছু নয়। একটা তৃণভূমি এঁকেছি। শীতকালের দৃশ্য।'

'ও,' ছবি সম্পর্কে কি পরিমাণ জ্ঞান নিজের আঁচ করে লজ্জা পেল মুসা।

তাড়াতাড়ি সরে চলে এল ছেলেটার কাছ থেকে। মনে মনে নিজেকে 'বোকা-গাধা' বলে দশটা গালি দিয়ে স্থির করল, এরপর কোন ছবির ব্যাপারে কিছু বলতে হলে বুঝেশুনে বলবে।

আরও কিছু ইজেলের সামনে দাঁড়াল সে। একঘেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা মিলউড স্কুলের সামনের চেহারা আঁকা হচ্ছে।

গোলগাল চেহারার একটা হাসিখুশি মেয়ের পেছনে দাঁড়াল সে।

ফিরে তাকাল মেয়েটা। 'নতুন ছাত্র নাকি?'

হাতের রঙ মুছল একটা ছেঁড়া কম্বলে।

মুসা জানাল, বেড়াতে এসেছে এখানে। ছবির ব্যাপারে আগ্রহ আছে।

'তাহলে আমাদের মেলা দেখতে এসো। এই ছবিটা দেব আমি। শেষ হয়ে গেছে, কিছু কিছু জায়গায় টাচ করা বাকি। একজন বয়স্ক ছাত্র এটার মডেল করে দিয়েছে।'

'রঙটা মনে হচ্ছে অ্যালিজারিন ক্রিমসন।'

'বাহ্, জ্ঞান আছে দেখি। পুরানো পাপী।'

ঢোক গিলল মুসা। মেয়েটা বেশি সরল। এই মেয়ে চোর হতে পারে না। ছবিটা ভাল করে দেখতে লাগল সে। সবুজ আর হলুদ রঙের অদ্ভুত সব ত্রিভুজ, আঁকাবাঁকা কালো রেখা, ফোঁটা, ঘন লাল ছায়া আর একটা মানুষের চোখ—এইই মনে হলো তার। এসবের কি মানে, কিছু বুঝল না।

'তুমি বলছ আরেকজন ছাত্র মডেল করে দিয়েছে। মাথাটাতা ঠিক আছে তো তার?'

হাসল মেয়েটা। 'বোকা সাজার ভান করে লাভ নেই। ভাল করেই জানো তুমি এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট।'

'তা বটে,' নিজেকে ছাগল প্রমাণ করার ইচ্ছে হলো না আর মুসার। সরে চলে এল মেয়েটার কাছ থেকে। ইজেলের সামনে ঘুরতে ঘুরতে এল গ্যালারির কাছে। কিশোর আর রবিনের সঙ্গে দেখা হলো ওখানে।

'পেলে কিছু?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'নাহ্। প্রায় সবাই অ্যালিজারিন ক্রিমসন ব্যবহার করছে। কে যে অপরাধী খুঁজে বের করা মুশকিল।'

পরদিন সকালে লেকের ধারের ছায়াঢাকা পথ ধরে আবার সিডারটাউন গাঁয়ে এল ওরা। ছবির মত সাজানো দোকানপাট, ছোট্ট গির্জা, আর গোলাবাড়ির মত দেখতে প্লেহাউস রয়েছে সরু মেইনরোডের পাশে। বন্দুকের দোকানটা রাস্তার অন্য পাশে।

রাস্তা পার হয়ে দোকানে ঢুকল ওরা।

ভেতরে আলো খুব কম। লম্বা একটা কাউন্টারের ওপাশে ধুলোমাখা দেয়ালে ঝোলানো মাছ ধরার আর শিকারের সরঞ্জাম।

কাউন্টারে রাখা বেল বাজাল কিশোর।

বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা নাকওয়ালা একজন রোগাটে মানুষ বেরিয়ে

এল পেছনের ঘর থেকে। মুখে কালো চাপদাড়ি।

'মিস্টার ভিনজার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' হেসে দুই হাত কাউন্টারে ছড়িয়ে দিল ভিনজার। আগ্রহী চোখে তাকাল ছেলেদের দিকে। 'কি করতে পারি?'

রঙ লেগে থাকা কার্তুজের খোসাটা বের করে দিয়ে রবিন জানতে চাইল, 'এটা কি এখান থেকে কেনা হয়েছে, বলতে পারেন?'

শার্টের পকেট থেকে চশমা বের করে পরল ভিনজার। খোসাটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখে, ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বোঝার উপায় নেই। এখানে শয়ে শয়ে বিক্রি করি আমি এই ব্র্যান্ডের কার্তুজ। শিকারীর অভাব নেই। কে নিয়েছে কে জানে।'

'বোঝা কোনমতেই সম্ভব না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। তোমরা কি মাছ ধরতে এসেছ? লেকের উত্তর দিকে চলে যাও। ভাল মাছ পাবে।'

'আমরা বেড়াতে এসেছি।'

দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

হঠাৎ রাস্তার ওপারের একটা অ্যানটিক শপ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'চোর! চোর! ধরো! ধরো!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। 'ওদিকে!'

ছোটখাট একজন মানুষ দৌড়ে যাচ্ছে রাস্তা ধরে। বগলে একটা ছবির ফ্রেম।

দৌড় দিল মুসা। তার পেছনে রবিন আর কিশোর।

কালো একটা সেডান গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল লোকটা।

চিনতে পেরে চমকে গেল গোয়েন্দারা। সেই লোকটা। সেই যে রকি বীচে যে ছবি চুরি করেছিল।

অদ্ভুত ফ্রেমটা চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'দুর্গের ছবির ফ্রেম!'

আরও জোরে দৌড়াতে শুরু করল মুসা।

গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলল লোকটা।

গোয়েন্দারা কাছে যাওয়ার আগেই চলতে শুরু করল গাড়ি। সোজা ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে। লাফ দিয়ে রাস্তা থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো তিনজনেই।

সামনে দিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। মোড়ের কাছে পৌঁছে টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে হারিয়ে গেল অন্যপাশে।

লোকের ভিড় জমে গেল।

এগিয়ে এসে ওদেরকে ছত্রখান করে দিল একজন পুলিশের লোক। তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানটিক শপে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। দোকানদার জানাল, শেয়ালমুখো ওই লোকটাকে কখনও দেখেনি আর। ফ্রেমটা হাতে নিয়ে দাম

জিজ্ঞেস করল লোকটা। দাম শুনে বলল, অনেক বেশি। ফ্রেম রেখে হাঁটা দিল দরজার দিকে।

'আমি ভাবলাম কিনবে না,' দোকানদার বলল। 'তাই ওঅর্কশপে ফিরে গেলাম। একটা শব্দ শুনে দোকানে উঁকি দিয়ে দেখি ফ্রেমটা নিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা।' গুঙিয়ে উঠল সে। 'ইস্, অনেকগুলো টাকা গেল আমার!'

পুলিশ অফিসারের সঙ্গে থানায় গেল ছেলেরা। চীফকে ওদের পরিচয় দিয়ে বলল কেন এসেছে এখানে। সেডানের নম্বর রেখেছে রবিন। সেটা বলল।

চীফ বললেন, ওটা চুরি করেছে শেয়ালমুখো। মালিক এসে থানায় রিপোর্ট করে গেছে।

থানা থেকে বেরিয়ে মিলউডে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। ফ্রেম চুরি নিয়ে আলোচনা করতে করতে।

কিশোর বলল, 'ফ্রেম চুরি করেছে, তার মানে ছবির মধ্যে কোন সূত্র খুঁজে পায়নি সে। এখন ফ্রেমের মধ্যে খুঁজছে।'

রবিন বলল, 'তোমার ধারণা স্কুলের গ্যালারি থেকে এই লোকই ছবি চুরি করেছে?'

'নিজেও করতে পারে। অন্য কারও সাহায্যও নিতে পারে।'

স্কুলে ফিরে সিডারটাউনের ঘটনা রাবুমামাকে জানাল ওরা। শুনে অবাক হলেন তিনি। বললেন, 'এ ভাবে দিনেদুপুরে জিনিস নিয়ে যাবে! ভাবতে পারছি না!'

গম্ভীর হয়ে রবিন বলল, 'ফ্রেমের মধ্যে গুপ্তধনের সূত্র না থাকলেই হয়!'

আরও কিছুক্ষণ রহস্যটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে রাবুমামা বললেন, 'সেনানডাগা দুর্গে যেতে চাও?'

লাফিয়ে উঠল কিশোর, 'চাই না মানে!'

তবে মুসা অত উৎসাহ দেখাল না। ভূতের আড্ডায় যেতে তার ভাল লাগে না। শুনেছে, ভূতের পুরো একটা সেনাবাহিনী আস্তানা গেড়েছে ওখানে।

রাবুমামা বললেন, 'আমাদের যেতে বলেছেন মিস্টার মেলভিল।'

তাঁর সঙ্গে ম্যানশনে এল তিন গোয়েন্দা। তৈরি হয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে শোফার আরনল্ড। নীল ইউনিফর্ম, নীল ক্যাপ, সমান করে ছাঁটা কালো গোঁফ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন মাথা নুইয়ে ছেলেদের বাউ করল। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা চকচকে লিমুজিন গাড়ির দিকে।

'দারুণ গাড়ি!' মুসা বলল। 'সেই তুলনায় আমার জেলপিটা...'

'পোরশেটা থাকলে ভাল হত, না?' হেসে বলল রবিন।

'থাক, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ো না।'

হাতে একটা বেত নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিস্টার মেলভিল।

স্বাগত জানালেন ছেলেদের।

গাড়িতে উঠল সবাই।

লেকের ধারের আঁকাবাঁকা পথ ধরে উত্তরে রওনা হলো গাড়ি।

লেক শেষ হলো একসময়। খানিকটা ঘুরে এসে তখন একটা পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে লাগল গাড়ি। PRIVATE PROPERTY লেখা একটা সাইনবোর্ডের কাছে এসে থেমে গেল।

নেমে গিয়ে একটা কাঁটাতারের গেট খুলে দিল আরনল্ড।

দুর্গের পুরো দক্ষিণ অংশটাই বেড়া দিয়ে ঘেরা। খানিক পর পরই তাতে 'প্রবেশ নিষেধ' এই সতর্কবাণী দেয়া রয়েছে।

গেটের ভেতর ঢুকল গাড়ি। একটু পর থেকে শুরু হয়েছে অযত্নে বেড়ে যাওয়া গাছের জঙ্গল। গর্বের সঙ্গে সেনানডাগা দুর্গের ইতিহাস বলতে লাগলেন মেলভিল। বললেন, এই জায়গাটাতে ইংরেজ আর ফরাসীদের একটা লড়াই হয়েছিল। এ ব্যাপারে অনেকেই কিছু জানে না।

'কোন দল যে প্রথম পিছু হটেছিল জানে না কেউ,' মেলভিল বললেন। 'কারও কারও ধারণা, কেউই পিছু হটেনি। সবাই মরেছিল। যারা ভূত বিশ্বাস করে তারা বলে দুর্গের ভেতর ওই সৈন্যদের ভূতেরা এখনও লড়াই করেই চলেছে।'

নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল মুসার। পারলে গাড়ি থেকে নেমে যায়। কিন্তু গাড়ি থামানোর কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারল না শোফারকে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'দুর্গে বাইরের লোক ঢোকে না এখন?'

'পাবলিক! আর বোলো না!' আচমকা রেগে গেলেন মেলভিল। হাতের বেতটা দিয়ে বাড়ি মারলেন মেঝেতে। জুতো ঠুকলেন।

ইশারায় রবিনকে চুপ থাকতে বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন রাবুমামা।

ছোট এক চিলতে খোলা জায়গায় এনে গাড়ি রাখল আরনল্ড।

নামল সবাই। গাড়িতে রয়ে গেল শোফার।

আবার মেজাজ ভাল হয়ে গেছে মেলভিলের। বেত তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে।'

এখান থেকে পুরো লেকটাই চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে গাছে ছাওয়া ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে লাগছে সবুজ যুদ্ধজাহাজের মত। বাঁ দিকে পাহাড়ের একটা ঢালু ঢালে দাঁড়িয়ে আছে পাথরে তৈরি দুর্গটা। অগভীর খাত ঘিরে রেখেছে। তাতে জন্মেছে লতাপাতা ঝোপঝাড়। দুর্গটার বেশির ভাগই ধসে পড়েছে।

মাথা উঁচু করে বিজয়ী সেনাপতির মত সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে এগোলেন মেলভিল। খানিকটা পিছিয়ে থাকলেন রাবুমামা। নিচুস্বরে ছেলেদের জানালেন দুর্গে বাইরের লোক ঢোকার কথায় মেলভিলের রেগে যাওয়ার কারণ।

'তোমাদের আরও আগেই সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল আমার,' বললেন তিনি। 'দুটো ব্যাপারে কক্ষনো কথা বলবে না মেলভিলের সঙ্গে।

এক, দুর্গে বাইরের লোক ঢোকার কথা। তাঁর ধারণা, কেউ ঢুকলেই অসাবধানে চলাফেরা করে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে। বিপদে ফেলে দেবে তাঁকে। হয়তো পুলিশ এসে তখন বিপজ্জনক জায়গার দোহাই দিয়ে দুর্গে মানুষ ঢোকাই বন্ধ করে দেবে। দুই, এলমার কেনটন।'

'এলমার কেনটন? সে আবার কে?' জানতে চাইল রবিন।

রাবুমামা জবাব দেয়ার আগেই দাঁড়িয়ে গেলেন মেলভিল। ফিরে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি এগোনোর ইঙ্গিত করলেন।

সামনে ঢাল বেশ খাড়া।

সাবধানে এগোতে বললেন সবাইকে মেলভিল।

ঢাল পার হয়ে, আবার খানিকটা ওঠার পর সামনে পড়ল দুর্গের বাইরের খাত। তার পাড়ে দাঁড়িয়ে বেত তুলে দেখিয়ে বললেন, 'দেখো, ছাতটাত-সব ধসে পড়লেও দেয়ালগুলো ঠিকই আছে। খুব মজবুত করে তৈরি। হবেই। প্ল্যান করেছিল ফোরটিন লুইয়ের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার মার্শাল সেবাসটিয়ান ডা ভওবন। জিনিয়াস ছিল লোকটা।'

সবাইকে নিয়ে খাত পেরিয়ে এসে তারকার একটা কোণের কাছে দাঁড়ালেন মেলভিল। 'দুর্গ তৈরির একশো বছর পর আমার পূর্বপুরুষকে ধরে এনে বন্দি করা হলো এখানে।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। বিস্মিত হয়ে দেখছে প্রাচীন দুর্গটা। ভূতের কথা ভুলে গেছে মুসা।

'বাপরে বাপ!' রবিন বলল, 'এই দুর্গ দখল করেছিল শত্রুরা! এতে ঢোকা সহজ কথা নয়!'

'ঢুকতে অনেক কষ্ট হয়েছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে,' মেলভিল বললেন। 'অবিকল এক রকম দেখতে দুটো ট্রেঞ্চের পরিকল্পনা করেছিল ভওবন। লুকিয়ে থেকে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্যে। সেগুলোই কাল হলো। একটার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল শত্রুরা। তারই একটাতে ঢুকে খুঁড়তে খুঁড়তে চলে গেল দেয়ালের কাছে। সেখানে গিয়ে খোঁজ পেল আরেকটার। সেটাকে খুঁড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।'

যুদ্ধের কৌশলের কথা সবিস্তারে বলে গেলেন মেলভিল। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল রবিন আর কিশোর।

এ সব ব্যাপারে মুসার তেমন আগ্রহ নেই। শান্ত লেকটার দিকে তাকাল সে। দেখে মনেই হয় না এখানে এককালে চলেছিল রণতরীর তাণ্ডব। বিড়বিড় করে বলল, 'ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছে না।'

এই সময় একটা ভারী শব্দ কানে এল।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'সরো! সরে যাও!'

চমকে ফিরে তাকিয়ে মুসাও দেখল, ছাতের একটা বিরাট অংশ ধসে পড়তে আরম্ভ করেছে।

ছয়

সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মেলভিল। হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে আনল মুসা।

ধুলো আর সুরকির ঝড় তুলে ধসে পড়ল ছাত আর দেয়ালের খানিকটা অংশ।

কাঁপছেন মেলভিল। বুকের বাঁ পাশ চেপে ধরেছেন। বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। জোরে জোরে দম নিচ্ছেন।

'কি ব্যাপার?' শঙ্কিত হলো কিশোর। 'হার্টের কোন অসুবিধে?'

মাথা ঝাঁকালেন কেবল মেলভিল। কিছু বললেন না।

তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে সিডারটাউনে ডাক্তারের কাছে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

ডাক্তার দেখেটেখে বললেন, তেমন খারাপ কিছু হয়নি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

'তবে প্রচুর বিশ্রাম দরকার,' ডাক্তার বলে দিলেন। 'ওই পোড়ো দুর্গের ধারেকাছে যাবেন না আর।'

মিলউডে ফিরে চলল গাড়ি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে আনমনে বিড়বিড় করলেন মেলভিল, 'আমার দুর্গে আমারই ওপর পাথর খসে পড়ে! ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না—সেনানডাগার পাথর এ ভাবে কখনও খসে পড়ে না!'

তবে কি কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল—একই সঙ্গে চিন্তাটা মাথায় ঢুকল কিশোর আর রবিনের।

'আপনি এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, মিস্টার মেলভিল,' কিশোর বলল। 'আমরা এসেছিই তদন্ত করতে। যা করার আমরাই করব।'

লাঞ্চের সময় রাবুমামাকে এলমার কেনটনের কথা জিজ্ঞেস করল সে। মেলভিল কেন লোকটাকে দেখতে পারেন না জানতে চাইল।

'লেকের ধারে বাস করে কেনটন,' মামা বললেন। 'অনেক টাকার মালিক, বাপের কাছে পেয়েছে। স্থানীয় একটা পত্রিকায় কলাম লেখে, ছবির সমালোচনা।'

মামা জানালেন, কয়েক বছর আগে সেনানডাগা দুর্গের একটা ছবি কিনে নিয়ে গেছে কেনটন। সেই থেকে তাকে আরও দেখতে পারেন না মেলভিল।

মামা আরও বললেন, ছবি আঁকার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে কেনটন। সেই ক্ষোভেই যেন আর্টিস্টদের ওপর খেপে গেছে। কোন ছবির সমালোচনা করতে গেলেই কড়া কড়া কথা লেখে।

খাওয়ার পর থানায় ফোন করল কিশোর। শেয়ালমুখো লোকটার কোন খবর আছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

চীফ জানালেন, সিডারটাউন হাইওয়ের ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে চোরাই গাড়িটা। চোর নিরুদ্দেশ। হয়তো কাছাকাছিই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।

ফ্রেম চুরির কথাটা মেলভিল জানেন না। তাকে বলতে গেল তিন গোয়েন্দা।

শুনে খুব আফসোস করতে লাগলেন তিনি, 'আহ্হা, আমি জানিই না ওটা আছে দোকানে। তাহলে কিনে ফেলতাম।'

ছোট একটা আয়রন সেফ খুলে একটা কাগজ বের করলেন মেলভিল। সেনানডাগা দুর্গের পুরানো একটা নকশার ফটোকপি। ছেলেদের দিয়ে বললেন, 'নাও, এটা সঙ্গে থাকলে দুর্গে গিয়ে গুপ্তধন খুঁজতে সুবিধে হবে।'

ম্যাপটা পেয়ে খুব খুশি হলো কিশোর। মেলভিলকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

স্কুলের লনে ক্লাস করছে ছাত্ররা। রিককেও দেখা গেল তাদের মাঝে। এগিয়ে গেল কিশোর। রিকের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড নীরবে তার ছবি আঁকা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালিজারিন ক্রিমসন খুব ব্যবহার করেন, তাই না?'

অবাক মনে হলো রিককে, 'সবাই করে। কেন?'

'না, এমনি। কৌতূহল।'

সরে এসে বন্ধুদের বলল কিশোর, 'ওর সঙ্গে কথা বলে কিন্তু মনে হয় না শটগান দিয়ে সে-ই রঙ ছিটিয়েছে।'

রবিন বলল, 'কিন্তু তার ভাবসাব রহস্যময়। এটার কি কারণ?'

হাতে প্রচুর সময়। কিছু একটা করতে হবে। দুর্গের ছবিগুলো দেখার জন্যে গ্যালারিতে চলল তিন গোয়েন্দা। বাড়িটার কাছাকাছি হতেই পেছনে পায়ের শব্দ শুনল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, রিক আসছে।

ওদেরকে তাকাতে দেখে রিক বলল, 'দুর্গের ছবিগুলো দেখার খুব শখ আমার।'

কিশোর বলল, 'কিন্তু ছাত্রদের গ্যালারিতে ঢোকা বারণ। মিস্টার মেলভিল মানা করে দিয়েছেন।'

'ছবিগুলোর প্রতি এত আগ্রহ কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আঁকার ধরনটা দেখার জন্যে। সাংঘাতিক হাত ছিল লোকটার। তো, তোমরাই বা এত আগ্রহী কেন?'

'দুর্গ নিয়ে গবেষণা করছি,' জবাব দিল কিশোর। 'সেনানডাগার ইতিহাস জানতে চাই।'

'ইতিহাস, না?' যেন বিশ্বাস করল না, এমনি ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল রিক।

তাকে খসাতে পারবে না, জোর করেই গ্যালারিতে ঢুকবে, বুঝতে পেরে আর এগোল না কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে ফিরে চলল।

রিক সরে গেলে বলল, 'চলো, এলমার কেনটনের সঙ্গেই বরং দেখা করে আসি।'

সাত

রাবুমামার গাড়িটা নিয়ে রওনা হলো ওরা। লেকের পশ্চিম তীর ধরে উত্তরে এগোল। খানিক পর পরই একটা করে বাড়ি, এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সামার হাউস। মিনিট বিশেক পর ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া খোয়া বিছানো একটা ড্রাইভওয়ে চোখে পড়ল। সাইনবোর্ডে নাম লেখা রয়েছে: এলমার কেনটন, ই.এস. কিউ। টিলার মাথায় সুন্দর একটা স্প্যানিশ স্টাইল বাড়ি। লেকের দিকে মুখ করা।

শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'দারুণ জায়গা।'

ড্রাইভওয়ে দিয়ে উঠে এসে গাড়ি পার্ক করল সে। নামল সবাই।

পেছনের লতায় ছাওয়া বারান্দার লাউঞ্জ চেয়ার থেকে উঠে এলেন মোটাসোটা ঝাঁকড়া চুল একজন মানুষ। পুরানো গাড়িটার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকালেন যেন ওটা একটা আবর্জনা, জায়গা নোংরা করবে।

খুব দামী পোশাক তাঁর পরনে। সবুজ ভেলভেটের জ্যাকেট, ডোরাকাটা পাজামা, টাইয়ের বদলে গলায় বাঁধা সাদা রুমাল। চোখের চশমা খুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিকানা ভুল করোনি তো?'

'আপনি মিস্টার কেনটন?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'ঠিকানা ঠিকই আছে।'

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। বলল, ক্রাউন লেকে বেড়াতে এসেছে। দুর্গটার ব্যাপারে আগ্রহী। তাঁর কাছে যে ছবিটা আছে, দেখতে চায়।

'মিলউডের ছাত্র নও তো?' সন্দেহ যাচ্ছে না কেনটনের।

'না। বহুদূর থেকে বেড়াতে এসেছি। রকি বীচ।'

'বেশ।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন ওদেরকে বারান্দায় উঠতে দিলেন কেনটন। পেছনের একটা দরজার দিকে নিয়ে গেলেন।

চমৎকার সাজানো গোছানো একটা ঘরে ঢুকল গোয়েন্দারা। ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ঘর থেকে। সেটা ধরে ওপরের একটা হলঘরে উঠে এল ওরা। একপাশে একটা দরজা, ওপরটা ধনুকের মত বাঁকা করে তৈরি।

কেনটনের পিছু পিছু সেই দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকল ওরা। লেকটা দেখা যায় এখান থেকে।

'এটা আমার ডাইনিং রুম,' কেনটন বললেন।

লম্বা একটা টেবিলে পড়ে আছে মোটা একটা ডিকশনারি। একধারে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা আরমার স্যুট। সেটার পাশ কাটিয়ে এল ওরা।

হাত তুলে এক ধারের দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবি দেখালেন কেনটন।

এই ছবিটারও আসল ফ্রেমটা নেই। সেনানডাগা দুর্গের একটা ছবি। গোধূলি শেষে দূর থেকে কেমন লাগত দুর্গটাকে, ছবি দেখে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। সামনের আঙিনায় একটা কাঁটা-আপেলের গাছ।

'ভাল এঁকেছে বলতে হবে,' জোর করে বললেন কেনটন, ভাল বলতে বাধ্য হওয়ায় যেন খারাপ লাগছে তাঁর। 'ওরকম একজন খুনে যোদ্ধার হাত দিয়ে এমন মহান শিল্পকর্ম বেরোবে, কল্পনাই করা যায় না। চমৎকার ইমপ্যাস্টো, তাই না?'

কিছু না বুঝেই 'হ্যাঁ' বলে দিল মুসা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। ইমপ্যাস্টো মানে বুঝেছে নাকি সে?

বোঝেনি মুসা। তাকে সমঝদার ভেবে যদি কোন প্রশ্ন করে বসেন, কিংবা ইমপ্যাস্টো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান কেনটন, এই ভয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল সে। টেবিলে রাখা ডিকশনারিটা দেখে ইমপ্যাস্টোর মানে জেনে আসার জন্যে।

মিলউডের ছাত্রদের ছবি আঁকা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন কেনটন। সেনানডাগায় মেলার দিনে তাদের কি দুরবস্থা করবেন, সেই হুমকিও দিলেন।

তাঁর এই বাগাড়ম্বর সহ্য হলো না রবিনের। খোঁচাটা দিয়ে দিল, 'আপনি ছবি আঁকতে পারেন?'

জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেললেন কেনটন। পেছনে দুই হাত। 'আমি একজন চিত্র সমালোচক। সেটা নিয়ে থাকাটাই পছন্দ। ছবি খুব ভাল বুঝি...'

ঝনঝন করে বিকট শব্দ হলো।

ভীষণ চমকে গিয়ে ঘুরে তাকালেন কেনটন এবং দুই গোয়েন্দা।

মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ধাতব আরমার স্যুটটা। ওটার কাছে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তোতলাতে লাগল, 'স-সরি! ধা-ধা-ধাক্কা লেগে গেল!' হাত পেছনে নিয়ে গেছে সে, ডিকশনারিটা লুকানোর জন্যে।

এগিয়ে এসে স্যুটটা তুলে আবার খাড়া করে দিল কিশোর। ফিসফিস করে মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইমপ্যাস্টোর মানে জানতে এসেছ?'

'হ্যাঁ। আলো এত কম, জানালার কাছে গিয়েছিলাম। সরে আসার সময়...'

'ধাক্কা লেগে পড়ে গেল?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'শোনো, ইমপ্যাস্টোর মানে জেনেছি। ক্যানভাস কিংবা প্যানেলে ভারী করে রঙ লাগানোকে বলে ইমপ্যাস্টো।'

মুচকি হাসল কিশোর। ফিরে এল আগের জায়গায়। কেনটনকে আশ্বস্ত করল, 'কোন ক্ষতি হয়নি স্যুটটার।'

'এত সহজে কি আর হয় নাকি? ওসব পরে যুদ্ধ করত যোদ্ধারা। কত তলোয়ারের কোপ আর বর্শার খোঁচা গেছে ওই আরমারের ওপর দিয়ে। যাকগে, ছবি দেখতে এসেছ, ছবি দেখো।'

খুব কাছে থেকে ভাল করে ছবিটা দেখতে লাগল রবিন আর কিশোর। কোথাও কোন অসঙ্গতি আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। কিছুই বের করতে পারল না।

শেকলটার ব্যাপারে কেনটনকে প্রশ্ন করল কিশোর।

তিনি কিছু জানেন না।

কিছুক্ষণ পর ইচ্ছে করেই কাশলেন তিনি। বললেন, 'যদি কিছু মনে না করো···আমার একটা জরুরী সমালোচনা লিখতে হবে।'

ভদ্র ভাষায় কথাটার মানে হলো, এবার তোমরা যাও।

কোন লাভ হয়নি এখানে এসে, কোন তথ্যই পেল না—হতাশ হলো কিশোর। কেনটনকে ধন্যবাদ দিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

মিলউডে ফেরার পথে রবিন বলল, 'এই তাহলে এলমার কেনটন। মেলভিল কেন দেখতে পারেন না বোঝা গেল।'

গাড়ি চালাতে চালাতে মুসা বলল, 'মিলউডের ছাত্ররাও নিশ্চয় দেখতে পারে না। ওদের প্রতি যে ভাবে বিষোদগার করে, দেখতে না পারারই কথা।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। ভাবনায় ডুবে আছে।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কি ধরনের সূত্র চাই আমরা সেটা যদি জানতে পারতাম!'

'তোমার কি মনে হয় সোনার শেকলের ব্যাপারে আগ্রহ আছে কেনটনের?' মুসার প্রশ্ন।

'তেমন আগ্রহ তো দেখালেন না। তবে বলা যায় না কিছু। অ্যানটিকের প্রতি তো লোভ আছে।'

'ওঁর আগ্রহ কেবল মানুষের সমালোচনা করা,' রবিন বলল। 'কতটা বাঁকা করে, খোঁচা দিয়ে কথা বলা যায়, সেই চেষ্টা।'

'যদিও আমাদের সঙ্গে তেমন খারাপ আচরণ করেননি,' মুসা বলল। স্যুটটা ফেলে দেয়ার পরও কেনটন তাকে একটা ধমকও দেননি দেখে অবাক হয়েছে সে।

লেকের ওপর কুয়াশা ঝুলে আছে। গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে পানি। মনে হচ্ছে কোন রঙই যেন নেই। পথের একটা মোড় পাড় হওয়ার পর স্পষ্ট চোখে পড়ল লেকটা। গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে হলো মুসার। কিশোর আর রবিনও রাজি হলো।

পাহাড়ের চওড়া একটা কাঁধের ওপর গাড়ি রাখল মুসা। নামল তিনজনেই।

রবিন বলল, 'দুর্গটা দেখা যেতে পারে এখান থেকে।'

জোরাল বাতাস লেকের পানি ছুঁয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে

ওপর দিকে। অন্য পাড়ে ঢালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা বাড়িঘর।

ডানে তাকাল ওরা। গোধূলির ম্লান আলোয় খুব আবছা ভাবে চোখে পড়ছে সেনানডাগা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে বলল রবিন, 'ওটা কি ধরনের জলযান হলো?'

অন্য দু-জনও দেখল। সাদা একটা বার্জকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা সবুজ টাগবোট। অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে স্পষ্ট দেখা যায় না।

'নিশ্চয় ফেরিটেরি হবে,' মুসা অনুমান করল। 'লেকের এপার-ওপারে মানুষ আর গাড়ি পার করে।'

'চলো,' কিশোর বলল, 'আর কিছু দেখার নেই।'

ঘুরতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল মুসা। অদ্ভুত একটা শব্দ কানে ঢুকেছে তার।

আট

কান পাতল কিশোর আর রবিন। ওরাও শুনতে পাচ্ছে।

'কিসের শব্দ?' মুসার প্রশ্ন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। কুয়াশায় ঢেকে গেছে সেনানডাগা দুর্গ। সেদিক থেকেই আসছে বিচিত্র শব্দ। শুরু যেমন হয়েছিল, থেমেও গেল আচমকা। অস্বাভাবিক নীরব লাগল তখন চারপাশটা। গাছের ভেতর দিয়ে বাতাস বওয়ার সাঁই সাঁই ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'ঢাকের শব্দ!'

'ঢাক!' মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ বয়ে গেল মুসার। 'কিশোর, ভূ-ভূ-ভূত নয় তো! নইলে এ সময় ওই ভাঙা দুর্গে ঢাক বাজাতে যাবে কে?'

'বাতাসের কারসাজি হতে পারে,' অনুমান করল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। চুপচাপ ফিরে চলল গাড়ির দিকে।

মিলউডে ফিরে এল ওরা। খিদে পেয়েছে। মেলভিলের বাড়িতে এসে রাঁধুনির কাছে খাবার চেয়ে নিয়ে আগে পেট ভরাল।

শুতে যাওয়ার আগে একবার তদন্ত করার কথা ভাবল কিশোর।

ছাত্ররা চলে গেছে। নির্জন হয়ে পড়েছে স্কুল এলাকা। চাঁদের আলোয় গ্যালারিটার দিকে তাকাল রবিন। একটা ছায়া নড়তে দেখল। দরজার কাছে কুঁজো হয়ে আছে যেন একটা লোক।

'গ্যালারিতে ঢোকার চেষ্টা করছে কেউ!' ফিসফিস করে বলল সে।

সোজা সেদিকে দৌড় দিল তিনজনে।

শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল লোকটা। লাফ দিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে একছুটে

ঢুকে গেল পাশের জঙ্গলে।

অন্ধকারে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর তাকে পেল না গোয়েন্দারা। কোন শব্দ নেই। কেবল গাছের ডালে ডালে বাতাসের কানাকানি।

'ব্যাটা ভূত ছাড়া কিছু না,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল মুসা।

'আরে দূর!' হাত নাড়ল কিশোর। 'ভূত না কচু! মানুষ, মানুষ! এই এলাকারই কেউ হবে। জায়গাটা চেনে। নইলে এত সহজে পালাতে পারত না।'

'কে লোকটা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন রবিন। 'লম্বা। তার মানে শেয়ালমুখো নয়।'

গ্যালারির দরজার কাছে এসে দেখা গেল, তালা ভাঙার চেষ্টা করেছিল লোকটা।

রাবুমামাকে ডেকে আনল মুসা। টর্চের আলোয় তিনিও দেখলেন সব। তারপর ফোন করলেন থানায়।

একজন অফিসার এসে হাজির হলো। ভাঙা তালা আর তার আশপাশে আঙুলের ছাপ খুঁজল। দরজার আশেপাশের মাটিতে সূত্র খুঁজল। পেল না কিছু। সকালে আবার দেখতে আসবে কথা দিয়ে চলে গেল সে।

নতুন আরেকটা তালা লাগিয়ে দিলেন রাবুমামা। লম্বা তারের সাহায্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করলেন। তারের মাথায় একটা হোল্ডার লাগিয়ে এনে ঝুলিয়ে দিলেন দরজার ওপর। বেশি পাওয়ারের একটা বাল্ব লাগিয়ে আলোর ব্যবস্থা করলেন।

'আলোর মধ্যে আর এ ভাবে খোলাখুলি এসে তালা ভাঙার সাহস পাবে না,' বললেন তিনি।

'নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই নেই গ্যালারিটার,' কিশোর বলল।

রাবুমামা একমত হলেন তার সঙ্গে। 'একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। মিস্টার মেলভিলকে বলতে হবে।'

আপাতত আর কিছু করার নেই। ঘরে ফিরল তিন গোয়েন্দা। কাপড় ছেড়ে একেবারে সটান বিছানায়।

সকালে বেলা করে ঘুম ভাঙল ওদের। নাস্তা সেরেই রওনা হলো গ্যালারিতে। এই বার আর কোন বাধা কিংবা ঝামেলা এল না। ভোরে ওরা ঘুমে থাকতে থাকতে পুলিশ এসে আরেকবার তদন্ত করে গেছে, রাবুমামার কাছে জানল ওরা। কিছুই না পেয়ে ফিরে গেছে পুলিশ।

ভেতরে ঢুকে আবার দুর্গের ছবিগুলো দেখতে লাগল ওরা।

কিছু ছবিতে দুর্গের সঙ্গে লেকের অর্ধেকটা রয়েছে, কোনটাতে কাছের পাহাড়। কোনটা রাতের দৃশ্য, কোনটা দিনের। সবুজ আর বাদামী রঙ বেশ কড়া করে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোর কারসাজি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তুলির হালকা আঁচড়ে।

প্রতিটি ছবির নিচে লেখা শিল্পীর নামের আদ্যাক্ষর: M & M.

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। ভাবছে, এর কোথায় লুকিয়ে আছে গুপ্তধনের সূত্র?

দুপুর হয়ে এল। অনেক ভাবে দেখেও কিছু বের করতে পারল না গোয়েন্দারা। বেরিয়ে এল গ্যালারি থেকে। নিজেদের ঘরে ফিরে এল।

মেলভিলের দেয়া ম্যাপটা আর ট্রেসিং পেপার বের করে কাজে বসল কিশোর। মুসা বেরিয়ে গেল মামার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। রবিন বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

ম্যাপের ওপর ট্রেসিং পেপার রেখে একটা নকশা আঁকল কিশোর। তারকা এঁকে চিহ্ন দিয়ে রাখল কোন্ কোন্ জায়গায় খুঁজতে হবে। দুটোই রবিনকে দিয়ে বলল, ট্রেসিংটা পকেটে রাখতে, আর ম্যাপটা সুটকেসে।

ম্যাপটা সুটকেসে তালা দিয়ে রাখল রবিন।

লাঞ্চের পর দুর্গে যেতে চাইল কিশোর।

মুসা বলল, 'একজন নতুন ইনস্ট্রাকটর এসেছেন। ভাস্কর্য শেখান। ফরাসী। নাম রেনে দুঁইঅ। দুর্গটা সম্পর্কে আগ্রহ আছে। চলো বরং দেখা করে আসি।'

প্রস্তাবটা মন্দ না। রাজি হলো কিশোর। রওনা হলো ওঅর্কশপে।

পথে রিকের সঙ্গে দেখা। ইজেলে তুলি বোলাচ্ছে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থেমে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মেলার জন্যে তৈরি হচ্ছেন?'

হাসল রিক। 'ফার্স্ট প্রাইজটা আমিই পাব। এই জিনিস আর আমার মত আঁকতে পারবে না কেউ।'

বিচিত্র কমলা আর কালচে-বেগুনী রঙের পোঁচগুলোর দিকে তাকাল মুসা। মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারল না। ছবির নিচে বেশ কায়দা করে পেঁচানো অক্ষরে নিজের নাম লিখেছে রিক।

সরাসরি মুসার চোখের দিকে তাকাল সে। 'গ্যালারি থেকে বেরোতে দেখলাম তোমাদের? কি করছিলে?'

'ছবি দেখছিলাম।'

বেফাঁস কিছু বলে ফেলার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এল মুসা।

ওঅর্কশপে ঢুকতেই কাদা আর রাসায়নিক গন্ধ নাকে এল ওদের। মূর্তি গড়ছে কয়েকজন ছেলেমেয়ে। কাদা, সিরামিক আর ব্রোঞ্জের তৈরি কয়েকটা চমৎকার মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলে।

গোয়েন্দাদের দেখে বিমল হাসি হেসে এগিয়ে এলেন দুঁইঅ, 'নতুন ছাত্র বুঝি তোমরা?'

কিশোর যখন জানাল ওরা বেড়াতে এসেছে, ছাত্র নয়, কিছুটা নিরাশই হলেন যেন ইনস্ট্রাকটর। বোঝা গেল ছাত্র পেলে খুশি হন তিনি।

কিশোর যখন বলল, ওরা সেনানডাগা দুর্গ সম্পর্কে আগ্রহী, হাসিটা আবার ফিরে এল তাঁর মুখে। 'যা যা জানি সব বলব, এসো।'

ছোট, খোলা জানালার নিচে একটা টেবিলে এসে বসল ওরা।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন দুঁইঅ, 'ওটার আসল নাম কিন্তু সেনানডাগা নয়, ফোর্ট ডু ল্যাক।' নিজের বুকে থাবা দিয়ে বললেন, 'আমার মতই একজন ফরাসী বানিয়েছিল। তার নাম লা মারকুইস ডা শ্যাম্বর।'

ফরাসী আর ইংরেজদের মধ্যে লড়াইয়ের প্রসঙ্গ তুলল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'দুর্গ দখল করে নিয়েছিল ইংরেজরা, এটা কি ঠিক?'

'মোটেও না!' হাত নাড়লেন দুঁইঅ। বলতে লাগলেন সেই কাহিনী, ইংরেজ লর্ড ক্রেইগের নেতৃত্বে ক্রাউন লেক ধরে বোটে করে কি ভাবে এসে আক্রমণ চালিয়েছিল ইংরেজরা। ফরাসীদের সাময়িক ভাবে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বেশিদিন দখল করে রাখতে পারেনি দুর্গটা। শ্যাম্বর এসে তাড়িয়ে দেয় ওদেরকে।

যেন তাড়ানোর গুরুত্বটা বোঝানোর জন্যেই টেবিলে জোরে এক কিল মারলেন দুঁইঅ।

জানালার বাইরে ধূসর একটা ছায়া সরে যেতে দেখল মুসা। পলকের জন্যে দেখল। মনে হলো, লোকটার গায়ে আর্টিস্টের শেমিজ পরা। আড়ি পেতে কথা শুনছিল নাকি? নিশ্চিত হতে পারল না সে। তাই বেরোল না।

সোনার শেকলটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে দুঁইঅ বললেন, 'বানানো হয়েছিল এটা ঠিক। তবে আমার বিশ্বাস, ইংরেজরা চুরি করে নিয়ে গেছে। আসলে কি হয়েছে জানার খুব ইচ্ছে আমার।'

অনেকক্ষণ কথা বলেছেন। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ছাত্রদের কাছে চলে গেলেন তিনি।

ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

'ইংরেজদের কথা বললেই ফোঁস করে ওঠেন,' হেসে বলল মুসা।

কিশোরও হাসল। 'মেলভিল কি করেন দেখতে ইচ্ছে করছে। তাঁকে গিয়ে বলব নাকি দুঁইঅ বলেছেন ফরাসীরাই শেষ পর্যন্ত দখল করে রেখেছিল দুর্গটা?'

'দুর্গে যাবে না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'যাব। এক কাজ করো। তুমি গিয়ে চট করে ম্যাপটা নিয়ে এসো। আমরা ততক্ষণ মেলভিলের সঙ্গে কথা শেষ করে ফেলব।'

ঘরে রওনা হলো রবিন। পাতালঘরে নামার সিঁড়ির মাথায় থাকতেই নিচে শব্দ শুনল। কেউ ঘরে ঢুকেছে।

হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল রবিন। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। পেছনে খুট করে শব্দ হলো। ঘুরতে দেরি করে ফেলল সে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পড়ল। দুলে উঠল সবকিছু। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

নয়

জ্ঞান ফেরার পর রবিন দেখল বিছানায় শুয়ে আছে। মুসা আর কিশোরের উদ্বিগ্ন মুখ ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর। উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়েই বিকৃত করে ফেলল মুখ। হাত চলে গেল মাথার পেছনে। ব্যথা করছে। 'উফ্, খুলিটা ফাঁক করে দিয়েছে!'

'ম্যাপটা যে চুরি করেছে সে-ই মেরেছে তোমাকে,' কিশোর বলল।

'ম্যাপ!'

সুটকেসের ভাঙা তালার দিকে হাত তুলল কিশোর। 'তোমার দেরি দেখে দেখতে এলাম কি করছ। দেখি মাটিতে পড়ে আছ। সুটকেসের ডালা খোলা। ম্যাপটা নেই। ওটা নেয়ার জন্যেই এসেছিল লোকটা।'

'মিস্টার মেলভিলকে জানানো দরকার। চলো।'

'তুমি যেতে পারবে না। শুয়ে থাকো।'

'না, পারব।'

'খুব চিন্তায় পড়ে যাবেন তিনি,' মুসা বলল।

'কিন্তু কে চুরি করল?' রবিনের প্রশ্ন। 'গ্যালারি থেকে যে ছবি চুরি করেছে সে? এই কিশোর, রিক ডগলাস নয়তো?'

'হতেও পারে,' কপালে ভাঁজ পড়ল কিশোরের। 'দুই দুই বার আড়ি পেতেছে কেউ। একবার মেলভিলের বাড়িতে, আরেকবার দুইঅর সঙ্গে কথা বলার সময়। পরনে আর্টিস্টের শেমিজ। রিককেই সন্দেহ হয় আমার। তার হাবভাব মোটেও ভাল না।'

স্টুডিওতে এসে রাবুমামাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ওরা। তারপর তাঁকে নিয়ে রওনা হলো মেলভিলের বাড়িতে।

রিককে সন্দেহ করে ওরা, এ কথা শুনে রাবুমামা বললেন, 'ওর সম্পর্কে যা জানি, ভালই তো মনে হয়। তবু, নজর রাখব।'

ড্রাইভওয়েতে আরনল্ডের সঙ্গে দেখা। ফুল গাছের মধ্যে নিড়ানি দিচ্ছে। গোয়েন্দারা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের দিকে তাকিয়ে আলতো মাথা নোয়াল।

স্টাডিতে পাওয়া গেল মেলভিলকে। বেত দিয়ে খেলনা দুর্গকে খোঁচা মারার প্রায়তারা করছেন। ছেলেদের দেখে উজ্জ্বল হলো মুখ।

'কি, গুপ্তধনের কোন সূত্র পেলে?' জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা দম নিল কিশোর। 'খারাপ খবর আছে, মিস্টার মেলভিল। আরও একটা চুরি হয়েছে।'

খবরটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। রবিনকে বললেন, 'ম্যাপ গেছে যাক, তুমি যে বেঁচেছ এতেই আমি খুশি।'

লজ্জিত হাসি হাসল রবিন। 'আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল আমার…'

'অত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। আরেকটা কপি দিচ্ছি তোমাদের।'

আলমারি থেকে আরেকটা ফটোকপি বের করে দিলেন মেলভিল।

'ভাবছি, আজকেই দুর্গে যাব আরেকবার,' কিশোর বলল।

'তা যাও। তবে সাবধানে থেকো। বাইরের লোক যাতে না ঢুকতে পারে খেয়াল রাখবে।'

আজব ঢাকের শব্দের কথা তাঁকে জানাল মুসা। তিনি কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞেস করল।

ব্যাপারটা অবাক করল মেলভিলকে। কিছুই জানেন না তিনি। ওই শব্দও শোনেননি কখনও।

রেনে দুঁইঅর কথা বলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'লড়াইয়ে নাকি শেষ পর্যন্ত ফরাসীরা জিতেছিল—এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?'

মৃদু হাসলেন মেলভিল। 'সত্য মনে হয় দুই পক্ষেই আছে। শেষ অবধি কে টিকে ছিল বলা মুশকিল। তবে ইনডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্রেইগ আর শ্যাম্বর দু-জনেই মারা পড়েছিল, এটা শিওর। ওই দুর্গ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে, অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে আছে, যার জবাব কেউ জানে না।'

মুসা জানাল, 'ছবিগুলো থেকে কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। গ্যালারিরগুলো তো দেখেছিই; এলমার কেনটনেরটাও গিয়ে দেখে এসেছি।'

নামটা শুনলেই যে রেগে যান মেলভিল, ভুলে গিয়েছিল। বলে ফেলার পর মনে পড়ল। একশো একটা লাথি মারতে ইচ্ছে হলো তখন নিজেকে।

'কেনটন!' গলা চড়ে গেল মেলভিলের। বেত দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারলেন। ঝনঝন করে উঠল পিরিচে রাখা চায়ের কাপ। 'যেটা নিয়েছে নিয়েছে। দুর্গের আর কোন ছবির দিকে যদি লোভ করে, কিংবা গুপ্তধন হাতাতে চায়…ওকে আমি…ওকে আমি…'

থরথর করে কাঁপতে লাগলেন মেলভিল।

তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন রাবুমামা।

শান্ত করার জন্যে কিশোর বলল, 'মিস্টার মেলভিল, তদন্তের খাতিরে সবার কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয় আমাদের। যাকে যাকে সন্দেহ হবে তার কাছে তো যেতেই হবে, চাই সে পছন্দের লোক হোক, কিংবা অপছন্দের। নইলে রহস্যের সমাধান করব কি করে?'

'কি রকম মনে হলো তাকে?' কণ্ঠের ঝাঁঝ খানিকটা কমল মেলভিলের।

'পছন্দ করার মত নয়। তবে চোর বলেও মনে হলো না।'

'হুঁ!'

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলেন মেলভিল। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। হঠাৎ এ রকম একটা আচরণ করে ফেলেছেন বলে লজ্জিত হয়ে 'সরি' বললেন। দুর্গের গেটের একটা চাবি বের করে দিলেন কিশোরের

হাতে।

বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

রাবুমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখুনি দুর্গে যাবে?'

'যেতে তো চাই,' কিশোর বলল। 'কেন?'

'ইয়ে···মেলার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাদের। জায়গাটা একটু সাফসুতরো করা দরকার। তোমরা যদি একটু সাহায্য করতে···'

'এটা আর এমন কি। খুশি হয়েই করব। দুর্গে নাহয় পরেই যাওয়া যাবে। কি বলো?' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

ওরা মাথা ঝাঁকাল।

রাবুমামাকে বলল কিশোর, 'চলুন, কোথায় যেতে হবে? কি কি সাফ করতে হবে?'

আরও কয়েকজন ছাত্রকে কাজে লাগিয়েছেন রাবুমামা। গোয়েন্দাদেরও দেখিয়ে দিলেন কি করতে হবে।

কাজে লেগে গেল ওরা। জানালা পরিষ্কার করতে লাগল মুসা আর রবিন। মোওয়ার মেশিন দিয়ে গ্যালারির চারপাশের ঘাস ছাঁটার দায়িত্ব পড়ল কিশোরের ওপর।

বিকেল বেলা কাজ শেষ করে ঘামতে ঘামতে লেকের দিকে রওনা হলো তিনজনে। গোসল করার জন্যে। প্রস্তাবটা মুসার। লেকের পানিতে ডুব দিতে খুব ইচ্ছে করছে তার।

অন্য পাড়ে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। গোলাপী আভা ছড়িয়ে গেছে পশ্চিমের আকাশ জুড়ে, তার ছায়া পড়েছে লেকের পানিতে। মনে হচ্ছে রক্তাক্ত হয়ে গেছে পানি, এমনই লাল।

রবিন আর কিশোর কিনারে থেকে ডুব দিতে লাগল।

মুসা সাঁতরে গেল বেশ খানিকটা। হঠাৎ দুর্গের দিক থেকে ঢাকের শব্দ কানে এল তার। শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের কাছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এল কিনারে।

চুপ করে দুর্গের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। ওরাও শুনতে পেয়েছে।

আচমকা যেমন শুরু হলো, তেমনি করেই থেমে গেল শব্দটা।

'ঢাক!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

পানি থেকে উঠে পড়ল তিনজনে। দৌড়ে এল স্কুলে। রাবুমামাকে নিয়ে চলল ম্যানশনে, মেলভিলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

দু-জনকেই জিজ্ঞেস করল ওরা, ঢাকের শব্দ শুনেছেন কিনা?

শোনেননি।

তদন্ত করতে যাওয়ার কথা বলল কিশোর। কিন্তু রাতের বেলা কিছুতেই যেতে দিতে রাজি হলেন না মেলভিল।

আপাতত আর কিছু করার নেই। কাপড়-চোপড় বদলে আবার লেকের

পাড়ে এসে বসল গোয়েন্দারা। কান দুর্গের দিকে। আবার ঢাক বাজে কিনা শুনতে চায়।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও আর শোনা গেল না।

মুসা বলল, 'খিদে পেয়েছে। চলো, যাই।'

লম্বা লন পেরিয়ে এসে গ্যালারির দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। খটকা লাগল তার। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। কি, সেটা বুঝতে কয়েক মুহূর্তের বেশি লাগল না।

গ্যালারির দরজার মাথায় ঝোলানো উজ্জ্বল আলোটা নেভানো!

ওরা যখন লেকের দিকে যায়, তখনও জ্বালানো ছিল ওটা।

দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

যা সন্দেহ করেছে তাই। হাঁ হয়ে খুলে আছে দরজা।

লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। তার পেছনে রবিন আর মুসা।

চোখের ওপর পড়ল টর্চের উজ্জ্বল আলো। দাঁড়িয়ে গেল তিনজনেই। লড়াই করতে তৈরি।

পরক্ষণেই বলে উঠল মুসা, 'মামা! কি হয়েছে?'

মুখে কিছু বললেন না রাবুমামা। নীরবে টর্চের আলো ঘুরিয়ে দিলেন দেয়ালের দিকে।

ওরা তিনজনেও দেখল, দুর্গের ছবিগুলো যেখানে ঝোলানো ছিল, সেখানে এখন শূন্য দেয়াল।

একটা ছবিও নেই!

দশ

রাবুমামা জানালেন, জরুরী কাজে সিডারটাউনে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন গ্যালারির দরজার আলো নেভানো। দরজা খুলে টর্চ নিয়ে ঢোকেন দেখার জন্যে। তারপর তো এই।

'পুলিশকে ফোন করা দরকার,' ঘড়ঘড়ে শোনাল তাঁর কণ্ঠ। 'তার আগে মিস্টার মেলভিলকে জানাতে হবে।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'দরজা বন্ধ থাকলে চোরটা ঢুকল কোন্ পথে?'

ওপর দিকে টর্চের আলো ফেললেন মামা। 'স্কাইলাইট দিয়ে।'

দেখা গেল, বেশ বড় একটা ফোকর। কাঁচ কেটে ফেলা হয়েছে।

কিশোর বলল, 'আমার ধারণা চোরের সহকারী আছে। একজন ওপরে উঠে কেটেছে, আরেকজন নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে।'

খবর শুনে রাগ করলেন না মেলভিল, স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিমূঢ়ের মত

মাথা নাড়তে লাগলেন।

পুলিশ এল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল গ্যালারির ভেতরে-বাইরে। কাটা কাঁচটা পাওয়া গেল। কিন্তু তাতে কোন আঙুলের ছাপ নেই। কোন সূত্রই পাওয়া গেল না।

আসল ছবিই চুরি হয়ে গেছে। গ্যালারিতে আর পাহারা বসানোর প্রয়োজন মনে করলেন না রাবুমামা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঘোষণা করল কিশোর, 'টারটল আইল্যান্ডে যাব।'

'কেন?' জানতে চাইল রবিন।

'সেই ইংরেজ সাধুর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর কাছে আরেকটা ছবি আছে। দেখে আসব।'

'কিন্তু যাবে কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'বোটহাউসে কি নৌকার অভাব নাকি? একটা ক্যানু নিয়ে নেব।'

'তার মানে দুর্গে যাওয়া হচ্ছে না?'

'হবে না কেন? টারটল আইল্যান্ড থেকে এসেও যেতে পারব।'

সুতরাং নাস্তা সেরে বোটহাউসের দিকে হাঁটতে লাগল ওরা।

লন পেরিয়ে যাওয়ার সময় রিকের সঙ্গে দেখা। ইজেলে তুলি বোলাচ্ছে। গোয়েন্দাদের দেখে ফিরে তাকাল।

এগিয়ে গেল মুসা। সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল, 'রিক, পুরানো একটা ম্যাপ দেখেছেন?'

ঠোঁট কামড়াল রিক। 'ম্যাপ? আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?'

রেগে গেল মুসা। 'কারণ লোকের ওপর নজর রাখার স্বভাব আপনার। সেদিন সকালে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিলেন। ভাবলাম, রবিনের মাথায় বাড়ি মেরে, সুটকেস ভেঙে ম্যাপটা কে বের করে নিয়ে গেছে, চোখে পড়তেও পারে আপনার।'

লাল হয়ে গেল রিকের মুখ। সামলে নিল। 'না, আমি কাউকে দেখিনি। কিসের ম্যাপ?'

'সেনানডাগা দুর্গের।'

মুসার কথাবার্তায় কিছুটা চমকে গেছে মনে হলো রিক। মুখ ঘোরাল ইজেলের দিকে। তুলির পোঁচ দিতে দিতে বলল, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না। ছবিটা সারতে হবে।'

পায়ে পায়ে কিশোর আর রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে। রিক আর কোন কথা বলবে না বুঝে সরে গেল তিনজনে।

কিশোর বলল, 'তাকে সন্দেহ হয় আমার।'

'আমারও,' মুসা বলল। 'কথাবার্তার ধরন ভাল না।'

টারটল আইল্যান্ডটা কোন্ দিকে রাবুমামার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে কিশোর। বোটহাউসে এসে একটা ক্যানু পানিতে নামিয়ে চড়ে বসল। বৈঠা তুলে নিল মুসা আর রবিন।

রোদ পড়ে চিকচিক করছে লেকের পানি। ভেসে চলল ক্যানু। আরও অনেক নৌকা আছে লেকে। কোন কোনটার সাদা পাল ফুলে আছে বাতাসে। আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে মোটরবোট।

মাইলখানেক দূরে একগুচ্ছ ছোট ছোট দ্বীপ। তারই একটার নাম টারটল আইল্যান্ড।

দেখা গেল দ্বীপটা। গাছপালায় ছাওয়া। পাতার ফাঁক দিয়ে পাথর আর কাঠে তৈরি একটা কেবিন চোখে পড়ল।

তীরের কাছে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। ওগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে দক্ষ হাতে নৌকাটাকে চালিয়ে নিয়ে এল মুসা। ঘ্যাঁচ করে গলুই তুলে দিল তীরের বালিতে। ছোট ছোট নুড়ি বিছিয়ে আছে। খ্যাড়খ্যাড় করে উঠল নৌকার নিচে ঘষা লেগে।

আরেকটা নৌকা দেখা গেল, ওপরে তুলে রাখা হয়েছে। অনেক পুরানো নৌকাটা। রোদ আর পানিতে রঙ জ্বলে গেছে।

লাফ দিয়ে তীরে নামল তিন গোয়েন্দা। টেনে ওদের নৌকাটাকেও তুলে রাখল ওপরে, যাতে পানিতে ভেসে যেতে না পারে।

বিকট স্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। ছুটে বেরিয়ে এল ঝোপের ভেতর থেকে। একটা জার্মান শেফার্ড।

'খাইছেরে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

ভয়ানক ভঙ্গিতে দাঁত বের করে দিয়েছে কুকুরটা। বলা যায় না, কামড়েও দিতে পারে। নৌকার দিকে পিছিয়ে গেল গোয়েন্দারা।

'টপ!' ভারী গলায় ডাক শোনা গেল, 'থাম জলদি!'

চুপ হয়ে গেল কুকুরটা।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা একজন মানুষ। রোদে পোড়া মুখ। পরনে বাদামী টুইডের স্যুট। ঘন ভুরু।

'ওর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না,' খাঁটি ইংরেজদের টানে কথা বললেন ভদ্রলোক। 'এখানে লোকজন খুব একটা আসে না তো। অপরিচিত কাউকে দেখলে ঘাবড়ে যায়।' হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'আমি মরিস বেকার।'

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা।

কিশোরের মনে হলো, সাধুদের তুলনায় পোশাক-আশাক বেশিই ছিমছাম আর পরিষ্কার মিস্টার বেকারের। তবে সাধু হলেই অপরিষ্কার থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তাই ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে। কি জন্যে এসেছে জানাল তাঁকে।

কোন রকম দ্বিধা না করে ওদেরকে কেবিনে নিয়ে চললেন বেকার।

'ওই সোনার শেকলের কথা মোটেও বিশ্বাস কোরো না,' বললেন তিনি। 'একেবারেই মিথ্যে কথা। ফোর্ট রয়্যাল সম্পর্কে অনেক মিথ্যেই ছড়িয়েছে ফরাসীরা।'

'ফোর্ট রয়্যাল?' বুঝতে পারল না রবিন।

মাথা ঝাঁকালেন বেকার। 'সেনানডাগা ইনডিয়ান নাম। আসল নাম ফোর্ট

রয়্যাল। রেখেছিলেন দুর্গের শেষ দখলদার লর্ড ক্রেইগ।'

রেনে দুঁইঅর বক্তব্য মনে করে চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল রবিন আর কিশোর।

সাধারণ আসবাবে লিভিং রুমটাকে সাজিয়েছেন সাধু। তবে বেশ আরামদায়ক। ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে ছবিটা নামিয়ে আনলেন গোয়েন্দাদের দেখার জন্যে।

পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে ভালমত দেখতে লাগল কিশোর।

দুর্গের সামনে একটা ঢিবি, ওপরটা সমতল। একে বলে র‍্যামপার্ট। লড়াইয়ের সময় সৈন্যরা এতে চড়ে নিচের শত্রুকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। ছবিতে র‍্যামপার্টটা দেখা গেল লেকের কিনারে। নিচের দিকে কেউ থাকলে ঢিবি সহ দুর্গটাকে যেমন দেখবে তেমন করে আঁকা হয়েছে ছবিটা।

'দারুণ হাত বলতে হবে,' ছবির প্রশংসা করে বললেন বেকার। 'ছবি সংগ্রহের বাতিক নেই আমার। কিন্তু ফোর্ট রয়্যালের ইতিহাসের ব্যাপারে খুব আগ্রহ। তাই কয়েক বছর আগে অনেক বলেকয়ে মিস্টার মেলভিলের কাছ থেকে এটা কিনে এনেছি।'

ছবি আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস রবিনের হাতে দিয়ে বেকারের দিকে তাকাল কিশোর। সে যে শুনেছে দুর্গের শেষ দখলদার ছিল ফরাসী বাহিনী, এ কথা বলল।

চটেই উঠলেন সাধু। 'একেবারে বাজে কথা! কে বলেছে তোমাকে?'

রেনে দুঁইঅর নাম বলল কিশোর।

'ও, ফরাসী,' মুখ বাঁকালেন বেকার। 'তা তো বলবেই। নিজেদের গুণগান না করলে কি চলে!'

রাগত ভঙ্গিতে একটা কর্কবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কয়েকটা ডার্ট তুলে নিয়ে একের পর এক ছুঁড়ে মারতে লাগলেন বোর্ডে।

'ওই দুঁইঅটা একগাদা মিথ্যে বলে দিয়েছে তোমাদের,' পেছন ফিরেই বলতে লাগলেন বেকার। লর্ড ক্রেইগ কি করে ফোর্ট রয়্যাল দখল করেছেন, তার এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালেন। ক্রেইগের ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে নাকি শেষে কামান-টামান ফেলে পালিয়েছিল ফরাসী গোলন্দাজেরা।

রবিন যখন বলল, গুজব আছে ইংরেজরা সোনার শেকলটা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, ভীষণ রেগে গেলেন সাধু। হ্যাঁচকা টানে ডার্টগুলো তুলে নিতে লাগলেন বোর্ড থেকে।

ফিরে তাকালেন তিনি। 'লর্ড ক্রেইগের শেষ বংশধর আমি। তাঁর নামে এই অপবাদ সহ্য করতে পারি না। সে-জন্যে দুর্গের আসল ইতিহাস অনেক কষ্টে জেনে নিয়ে একটা বই লিখেছি।'

বুক শেলফ থেকে একটা বই এনে দিলেন বেকার। নাম দেখা গেল: The True Story of Fort Royal.

'নাও এটা,' বললেন তিনি, 'পড়ে দেখো। দিয়ে দিলাম তোমাদের। সত্যি কথা সব জানতে পারবে।'

দুর্গটা সম্পর্কে এই পরস্পর বিরোধী কথা আগ্রহী করে তুলেছে কিশোর আর রবিনকে। ইতিহাস নিয়ে মুসার তেমন মাথাব্যথা নেই। সে তাকিয়ে আছে কর্কবোর্ডটার দিকে। ডার্ট গেম খেলতে তার খারাপ লাগে না।

বেকারের কথাও শুনছে, মনোযোগ দিয়ে ছবিটাও দেখছে রবিন। এককোণে একটা দাগমত চোখে পড়ল। কিশোরকে বলল, 'দেখো তো এটা কি?'

ভাল করে আরেকবার দেখল কিশোর। মাথা নাড়ল, 'না, কিছু না। খোঁচা লেগেছে কোনভাবে।'

ছবিটাতে অস্বাভাবিক কিছু দেখল না ওরা। কোন সূত্র পেল না। র‍্যামপার্টের নিচে সৈন্যদের অবস্থানের জন্যে দুটো জায়গা রয়েছে, সে-দুটো খেয়াল রাখল কিশোর, যাতে দুর্গে গেলে বের করতে পারে।

বেকারকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠল ওরা।

'আমার কথা মনে রেখো,' এগিয়ে দেয়ার সময় বললেন বেকার, 'সোনার শেকলের পেছনে লাগতে যেয়ো না। অহেতুক খোঁজাখুঁজি করবে। নেই ওটা। তৈরিই হয়নি। ইংরেজদের চোর বলার জন্যে ফরাসীরা ছড়িয়েছে ওই গুজব।'

হাঁটতে হাঁটতে নৌকার কাছে চলে এলেন বেকার। সঙ্গে সঙ্গে এল টপ। তবে কোন গোলমাল করল না।

প্রশ্ন করে জানতে পারল কিশোর, পারতপক্ষে দ্বীপ থেকে বেরোন না বেকার। কেবল প্রয়োজনীয় রসদপত্রের দরকার হলেই গাঁয়ে যান। শেষবার গিয়েছেন মাসখানেক আগে।

ঠেলে ক্যানুটা নামিয়ে তাতে চড়ে বসল তিন গোয়েন্দা। মুসা আর রবিন বৈঠা তুলে নিল। হাত নাড়ল কিশোর।

জবাবে বেকারও হাত নাড়লেন। 'আমার বইটা পড়ে দেখো। ভাল লাগবে।'

লেকে বেরিয়ে এসে রবিন বলল, 'অহেতুক এলাম। কোন কাজে লাগল না ছবিটা।'

চুপ করে আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এই কিশোর, কি ভাবছ?'

'উঁ! ভাবছি,' আনমনে মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'মিস্টার বেকার বললেন মাসখানেক ধরে দ্বীপ থেকে বেরোন না। তাহলে তাঁর নৌকায় তাজা কাদা লেগে আছে কেন? ভেজা কেন? বৃষ্টিও তো হয়নি কয়েক দিনের মধ্যে!'

এগারো

লাঞ্চ খেতে বসে রাবুমামাকে সাধুর কথা জানাল গোয়েন্দারা।

হেসে বললেন তিনি, 'দুর্গটা নিয়ে ফরাসী আর ইংরেজদের মধ্যে বাদানুবাদ লেগেই আছে। একদল বলে আমরা জিতেছি, আরেকদল বলে আমরা। পারলে এই জেতাজেতি নিয়ে আরেকবার লড়াই বাধিয়ে দেয়।'

'সাধুকে কিন্তু সাধুদের মত মনে হলো না আমার,' কিশোর বলল। 'বেশ ফিটফাট আর আন্তরিক।'

গটমট করে এই সময় ডাইনিং রুমে ঢুকলেন মেলভিল। এক হাতে বেত, আরেক হাতে একটা পত্রিকার কপি। বাতাসে শপাং করে বেতের বাড়ি মেরে ঝটকা দিয়ে পত্রিকাটা সামনে বাড়িয়ে রেগেমেগে বললেন তিনি, 'দেখো, কি লিখেছে!'

'কে লিখেছে?' জানতে চাইল মুসা।

'কে আবার, কেনটন! মিলউডের ছাত্রদের বদনাম! পড়ে দেখো!'

রবিন পড়ে কাগজটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল। মিলউড স্কুল আর এর ছাত্রদের সম্পর্কে খুব খারাপ খারাপ কথা লিখেছেন কেনটন, মেলভিলের রাগ করাটা স্বাভাবিক।

কিশোর পড়ে বলল, 'এ কি লিখেছে! এটা কোন ভদ্রলোকের ভাষা হলো নাকি? আবার পত্রিকাতেও ছেপেছে!'

'পত্রিকাওলাদের আর কি?' রাগে মুখচোখ কালো করে বললেন মেলভিল। 'ওদের তো খালি ব্যবসা!'

তাঁকে শান্ত করার জন্যে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল কিশোর। মরিস বেকারের ওখানে দেখে আসা ছবিটার কথা বলল।

চেয়ারে বসে আনমনে মেঝেতে বেতের মাথা ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ বললেন মেলভিল, 'দুর্গের আরও একটা ছবি আছে আমার কাছে।'

'কী?' খাওয়া থামিয়ে দিল রবিন।

এতক্ষণে হাসি ফুটল মেলভিলের মুখে। 'ভুলে গিয়েছিলাম ছবিটার কথা। মেডিলের আঁকা এই একটা ছবি আমার মোটেও পছন্দ হয়নি। অন্যগুলোর সঙ্গে মেলে না। তাই এটাকে মিউজিয়ামে না ঝুলিয়ে চিলেকোঠায় রেখে দিয়েছি।'

'দেখা যাবে?' উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে কিশোর।

'যাবে না কেন। খাওয়া শেষ করো, নিয়ে যাচ্ছি।' গোয়েন্দাদের উত্তেজনা কেনটনের ওপর রাগ একেবারে ভুলিয়ে দিল মেলভিলের।

ওদেরকে তিনতলার মৃদু আলোয় আলোকিত একটা ঘরে নিয়ে এলেন তিনি। আলমারি থেকে বের করলেন অয়েল পেপারে মোড়া একটা

ক্যানভাস। অ্যানটিক টেবিলে বিছিয়ে দিলেন ছবিটা।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল কিশোর।

'অন্যগুলোর তুলনায় এটা আসলেই খারাপ,' মন্তব্য করল সে। 'রঙও কেমন মরা মরা—কালো, ধূসর আর ফ্যাকাসে হলুদ। দুর্গের ওপরের মেঘগুলোকে তো কেমন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে।'

'আমারও ভাল লাগে না এ কারণেই,' মেলভিল বললেন। 'এটা যে কেন আঁকল বুঝি না।'

ছবির পেছন দিকটা দেখল কিশোর। এক কোণে কাঁপা হাতে তারিখ লেখা, মলিন হয়ে গেছে: এপ্রিল ১, ১৮৬৫।

রাবুমামা বললেন, 'আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগের সময়টা।'

আবার ছবির বিষণ্ন দৃশ্যটার প্রতি নজর দিল গোয়েন্দারা। কোণের দিকে শিল্পীর স্বাক্ষর, তবে অন্য ছবিগুলোর চেয়ে অস্পষ্ট।

বনবন করে ঘুরছে কিশোরের মগজের বেয়ারিংগুলো। নিজের আঁকার ধরন কেন বদলাল এই ছবিটার বেলায় বন্দি-শিল্পী?

ঘড়ি দেখলেন মেলভিল। 'আমাকে যেতে হবে। কাঠমিস্ত্রীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। একটা জরুরী কাজ করে দিচ্ছে আমার।'

কেমন একটা হাসি দেখা গেল তাঁর চোখে। রহস্যময় লাগল কিশোরের কাছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না সে।

মেলভিলের সঙ্গে নিচে নেমে এল তিন গোয়েন্দা আর রাবুমামা।

রবিন বলল, 'খামোকা বসে না থেকে চলো দুর্গটা থেকে ঘুরে আসি। কি বলো, কিশোর?'

মেলভিল বললেন, 'আমার গাড়িটা নিতে পারো। আমার লাগবে না। তা ছাড়া আরনল্ডও নেই আজ। চালাবে কে? আমার আর এখন চালাতে ভাল লাগে না।'

মুসাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গাড়ির চাবি দিয়ে দিলেন তিনি।

রাবুমামার অনেক কাজ। চলে গেলেন ছাত্রদের কাছে।

রবিনের পকেটে দুর্গের ম্যাপ। মুসার হাতে গাড়ির চাবি। কিশোরের মাথায় ছবিটার চিন্তা। গ্যারেজের দিকে হাঁটতে লাগল তিনজনে।

পথে লম্বা, দাড়িওয়ালা একজন লোককে ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। এড ভিনজারকে চিনতে পারল ওরা।

'মিস্টার ভিনজার না?' এগিয়ে গেল রবিন। 'আপনিও শখের চিত্রকর? কিন্তু আজকে তো বুধবার, উইকএন্ড নয়।'

ভিনজার বলল, 'আসতে হলো। মেলার জন্যে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে ছবিটা।'

ক্যানভাসের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। সবুজ, লাল আর হলুদ রঙে আঁকা একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য। তুলি বোলাতে বোলাতে ভিনজার জিজ্ঞেস করল, 'লেকের উত্তর ধারে মাছ ধরতে গিয়েছিলে?'

'না,' মুসা বলল, 'এখনও যাইনি। তবে যাবার ইচ্ছে আছে।'
আবার গ্যারেজের দিকে এগোল ওরা। গাড়িটা বের করে আনল মুসা।
শেষ বিকেলে দুর্গের গেটে পৌঁছল ওরা। গাড়ি থামাল মুসা। কিশোর নেমে গিয়ে গেট খুলে দিল।
পাহাড়ী পথ ধরে দুর্গের কাছাকাছি চলে এল ওরা।
ম্যাপ বের করল কিশোর।
ট্রেঞ্চগুলো ধরে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল সে। প্রথমে এগোল উত্তরে। কিছুদূর এগোনোর পর সামনে পথ রুদ্ধ। ধসে পড়া ইঁটকাঠের স্তূপ হয়ে আছে। ওগুলোতেই খুঁজতে লাগল ওরা।
একটা পাথর সরিয়েই চিৎকার করে উঠল রবিন, 'এই দেখে যাও! কামানের গোলা!'
হুড়াহুড়ি করে ছুটে এল কিশোর আর মুসা। গোলাটা দেখল। ভাবতে লাগল, এই গোলার আঘাতেই কি ধসে পড়েছিল এখানকার দেয়াল?
এক জায়গায় ভাঙা দেয়ালের ওপরে ছাতের খানিকটা ভাঙা অংশ এখনও ঝুলে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে চোখ পড়তেই থমকে গেল কিশোর। দেখাল অন্য দু-জনকে।
দক্ষিণ-পশ্চিমের র‍্যামপার্টের পতাকা ওড়ানোর দণ্ডে উড়ছে একটা সাদা-সোনালী পতাকা।
'বিদ্রোহের আগে ফরাসীরা ওড়াত ওরকম পতাকা!' তিনটে সাদা পদ্মের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'কিন্তু আগের বার যখন এসেছিলাম তখন তো ছিল না?'
রবিন বলল, 'মিস্টার মেলভিলও এটার কথা জানেন না। তাহলে বলতেন।'
অবাক হলো ওরা—ফরাসী যোদ্ধাদের এই পুরানো প্রতীক কে উড়িয়ে দিয়ে গেল দুর্গের ওপর? ঢাকের শব্দের কথাও মনে পড়ল কিশোরের। ভাবতে লাগল, এই পতাকা আর শব্দের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে?
খাদ থেকে উঠে এল ওরা।
'ডানে দেখো,' মুসা বলল।
কিশোরও দেখল, নতুন খোঁড়া মাটির স্তূপ হয়ে আছে এক জায়গায়।
'কেউ এখানে খুঁড়েছিল!' উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।
নিচু হয়ে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে, দেখে, ছেড়ে দিল মুসা। 'ঠিক!'
'তাহলে কি গুপ্তধন পেয়ে গেল?' রবিনের প্রশ্ন। 'নিয়ে চলে গেল?'
'কি জানি!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'তবে আমার মনে হয় না এত সহজ হবে কাজটা।'

বারো

ম্যানশনে ফিরে মেলভিল আর রাবুমামাকে একসঙ্গেই পেল গোয়েন্দারা। রহস্যময় পতাকাটার কথা জানাল।

'সেনানডাগায় পতাকা!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মেলভিল। 'নিশ্চয় কোন বোকা ট্যুরিস্টের কাজ!'

কিন্তু মেনে নিতে পারল না কিশোর। তার মতে সবচেয়ে বোকা ট্যুরিস্টটিও কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে, হাত-পা ভাঙার ঝুঁকি নিয়ে ওখানে উঠে পতাকা ওড়াতে যাবে না।

ঢোক গিলল মুসা। 'তবে কি ভূতে ওড়াল?'

'ঢোকার জন্যে কাঁটাতারের বেড়া না ডিঙালেও চলে,' মেলভিল বললেন।

'তাহলে?' সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'নৌকায় করে যাওয়া যায়।'

সেদিন আর নতুন কিছু ঘটল না। পরদিন সকালে নাস্তা সেরে মেলার জন্যে জায়গা পরিষ্কারের কাজে লাগল তিন গোয়েন্দা।

দুপুরের দিকে মুসা বলল, 'কোমর বাঁকা হয়ে গেল! মনে হচ্ছে একটা দুর্গ তৈরি করছি!'

কোথা থেকে এসে হাজির হলো রিক ডগলাস।

বাঁকা হাসি হেসে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'সাহায্য করতে এসেছেন?' মাথায় বাড়ি খাওয়ার রাগটা তার যায়নি। রিককে সন্দেহ করে।

'আরে না,' হাত নেড়ে বলল রিক। 'আমার কি অত সময় আছে নাকি? ছবিটা শেষ করতে হবে। দেখতে এলাম তোমরা কি করছ।'

চলে গেল সে।

দুপুরে লেক থেকে গোসল সেরে এসে খেতে বসল ওরা। তখনই ফোন এল থানা থেকে। চীফ ওদের যেতে অনুরোধ করলেন।

খাওয়া শেষ করেই সিডারটাউন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে রওনা হলো ওরা।

একটা ছবি বের করে দিয়ে চীফ জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনতে পারো?'

দেখেই বলে উঠল রবিন, 'ছবি চোর!'

মুসা বলল, 'শেয়ালমুখো!'

'ওর নাম ডারবি ম্যাকফি।' চোর হিসেবে পুলিশের খাতায় অনেক দিনের রেকর্ড আছে তার নামে, জানালেন চীফ।

'মিলউড স্কুলের চুরিগুলো সে-ই করেনি তো?' কিশোরের প্রশ্ন।

'করতে পারে। লোক লাগিয়ে রেখেছি। এই এলাকায় থাকলে ধরা

পড়তেই হবে।'

স্কুলে ফিরে আবার দুর্গে যাবে কিনা এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'এবার জলপথে ঢুকব। একটা ভাল নৌকা দরকার। ক্যানু নিয়ে তেমন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

রবিন প্রস্তাব দিল, 'চলো, মিস্টার মেলভিলকে বলি। কি ভাবে গেলে ভাল হবে তিনি পরামর্শ দিতে পারবেন।'

স্টাডিতে পাওয়া গেল মেলভিলকে।

কিশোরের কথা শুনে বললেন, 'একটা বেটাউ নিয়ে যাও।'

'সেটা আবার কি জিনিস?' বুঝতে পারল না মুসা।

মেলভিল হাসলেন। 'একধরনের পুরানো নৌকা। ফরাসী আর ইনডিয়ানদের লড়াইয়ের সময় ব্যবহার হত।'

বুঝিয়ে বললেন তিনি, কাঠের তৈরি চ্যাপ্টা তলাওয়ালা নৌকা ওগুলো। মালপত্র বহনের জন্যে খুব ভাল। অল্প পানিতেও চালানো যায়। ছোট করে বানানো যায়, বড় করেও। পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা বেটাউও বানিয়েছিল ফরাসীরা মাল বহন করার জন্যে।

'শুনতে তো ভালই লাগছে,' রবিন বলল। 'কিন্তু এখন পাব কোথায় ওই নৌকা?'

'এ সব জিনিস বানাতে ওস্তাদ আমার কাঠমিস্ত্রী স্টক ওয়াকার। ঐতিহাসিক জলযানের ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ। গত বছর শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্যে দুটো বেটাউ বানিয়ে ফেলেছিল। পড়েই আছে ওগুলো। ব্যবহারের জায়গা পায়নি। আমি বললে খুশি হয়েই তোমাদেরকে দিয়ে যাবে একটা।'

'দারুণ হবে!' উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা। নৌকা বাইতে তার ভাল লাগে। আর নতুন ধরনের একটা ঐতিহাসিক যান হলে তো কথাই নেই। 'কবে বলবেন?'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল মেলভিলের মুখে। 'আমি একটা বিশেষ জিনিসের অর্ডার দিয়েছি তাকে। বলল হয়ে গেছে। আজকেই দেখা করতে আসবে। তখন বলব।'

'কোন্ ধরনের নৌকা?' জানতে চাইল রবিন।

দুষ্টু হাসি ফুটল মেলভিলের চোখে। মাথা নাড়লেন। 'সেটা এখন বলা যাবে না।'

সন্ধ্যাবেলা লেকের ধারে এসে বসল তিন গোয়েন্দা। ঢাকের শব্দ শোনার আশায়।

রবিন বলল, 'সূর্য ডুবলে তো সাধারণত পতাকা নামানো হয়। দুর্গেরটাও নামানো হয়নি তো?'

'কে নামাবে?' আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'ভূতে?'

গম্ভীর হয়ে গেল মুসা। 'দেখো, এই ভর সন্ধেবেলা অলক্ষুণে কথা বোলো না!'

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বাতাস। তীরে এসে ছল-ছলাৎ করে বাড়ি মারছে ছোট ছোট ঢেউ। ধূসর লাগছে এখন দূরের সবুজ দ্বীপগুলোকে। মুসার মনে হচ্ছে, বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে পানির নিচ থেকে মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে সমস্ত ভূতুড়ে জাহাজেরা। এমনিতে আবছা এক ধরনের আলো রয়েছে লেকের পানিতে, কেবল দক্ষিণে অর্থাৎ দুর্গের দিকে ছাড়া। সেদিকে কালো অন্ধকার।

হঠাৎ করে ওটাকে চোখে পড়ল তার। গজ পঞ্চাশেক দূরে কি যেন একটা মাথা তুলল পানিতে। পরক্ষণেই ডুবে গেল।

ভুল দেখল না তো? তাকিয়ে রইল সেদিকে।

খানিক পর আবার দেখা গেল মুহূর্তের জন্যে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ভূত দেখলে নাকি···?'

কথা বন্ধ হয়ে গেল তারও।

তিনজনেই দেখতে পেয়েছে এখন। হাঁ হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

কালচে পানিতে ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে ওটা। বিশাল কালো একটা শরীর। লম্বা সরু গলা, বিশাল চকচকে মাথা, হাঁয়ের মধ্যে ধারাল ভয়াবহ দাঁতগুলো এই সামান্য আলোতেও চোখে পড়ছে।

হাঁসের মত ভেসে ভেসে ওটা এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

তেরো

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'দানব! দানব! পানির দানো!'

কালো পানিতে সাদা ফেনা আর বড় বড় ঢেউ তুলে ডুবে গেল ওটা। খানিক পর আবার মাথা তুলল, তীরের আরও কাছে। চোয়াল দুটো খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। সাদা সাদা চোখ দুটো জ্বলছে।

কিশোর আর রবিনও দাঁড়িয়ে গেছে। চোখের পাতা পড়ছে না। তাকিয়ে আছে দানবটার দিকে। তিরিশ ফুটের কম হবে না লম্বায়।

বিড়বিড় করল রবিন, 'লক নেস মনস্টারের মত কিছু!'

আরও খানিকটা এগিয়ে আবার ডুবে গেল ওটা। আর ভাসল না।

নিথর হয়ে আছে গোয়েন্দারা। ওদের চোখগুলো কেবল কালো পানিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে দানবটাকে। ওটার আবার ভাসার অপেক্ষায় আছে।

অট্টহাসি শোনা গেল পেছনে।

'বাপরে, ভূত!' বলে চিৎকার করে একলাফে কিশোর আর রবিনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসা।

ওরা দু-জনও চমকে গেছে। ফিরে তাকাল।

বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল দু-জন মানুষকে।

'আরি, আপনি!' একজনকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে গেল রবিন।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন মেলভিল। 'সরি!'

'সরি? কিসের জন্যে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভয় দেখানোর জন্যে। ক্রাউন লেক মনস্টারকে দিয়ে।'

'মানে?'

সঙ্গের লম্বা মানুষটার পরিচয় দিলেন মেলভিল। স্টক ওয়াকার, কাঠমিস্ত্রী।

বুঝে ফেলল কিশোর। 'দানবটা বানানো?'

ওয়াকারও হাসল। 'কি বানিয়েছি দেখতে চাইছিলাম। তোমরা গোয়েন্দা। মিস্টার মেলভিলের কাছে শুনলাম, খুব বুদ্ধিমান। পরীক্ষা চালানোর জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করলাম তোমাদেরকে। তোমরাই যখন চালাকিটা ধরতে পারোনি, আর কেউ পারবে না।'

মেলভিল বললেন, 'এইবার বুঝলে তো, কি জিনিসের অর্ডার দিয়েছিলাম আমি?'

দেখানোর জন্যে গোয়েন্দাদেরকে বনের কাছে নিয়ে গেল ওয়াকার। কতগুলো তার বাঁধা রয়েছে গাছের সঙ্গে। ওগুলো ধরে টানাটানি করতেই আবার ভুস করে পানিতে মাথা তুলল দানবটা। এগিয়ে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। কয়েক মিনিট পর উঠে এল তীরের বালিতে।

ঘুরে ঘুরে ওটাকে দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ ব্রন্টোসরাসের মত করে বানানো হয়েছে দানবটাকে। কাঠ আর তার দিয়ে ফ্রেম বানিয়ে তাতে রবার মুড়ে চামড়া দেয়া হয়েছে। জায়গায় জায়গায় লুমিনাস পেইন্ট লাগিয়ে দেয়ায় অন্ধকারেও চকচক করে। গলা আর চোয়ালে কব্জা লাগানো, তার ধরে টানলে নড়তে থাকে ও দুটো। রবারের দাঁত লাগানো হয়েছে। চোখের জায়গায় ব্যাটারি লাগানো দুটো অল্প পাওয়ারের বাল্ব।

'দুর্দান্ত জিনিস বানিয়েছেন!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল কিশোর।

'পছন্দ হয়েছে তাহলে,' হাসলেন মেলভিল। 'থ্যাংক ইউ।' আদর করে চাপড় দিলেন তাঁর জলদানবের গায়ে।

ভূত ভূত করে চিৎকার করেছিল বলে এখন লজ্জা পাচ্ছে মুসা। ছাগল মনে হচ্ছে নিজেকে। লাথি দিয়ে পানিতে ফেলল একটা নুড়ি। 'এটা বানাতে গেলেন কেন? কি দরকার?'

'দরকার আছে। সেটা এখন বলা যাবে না।'

দানবের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নৌকার কথায় এলেন মেলভিল। একটা বোটাউ ধার দিতে রাজি হয়েছে ওয়াকার, জানালেন। পরদিন সকালে তার দোকানে গেলেই নৌকাটা দিয়ে দেবে।

মেলভিল আর ওয়াকার চলে গেলেন।

লেকের পাড়ে বসে রইল তিন গোয়েন্দা।

মুসা বলল, 'দানবটা কেন বানালেন, বলো তো? রাতের বেলা ওতে চড়ে ঘুরে বেড়াবেন?'

হাত ওল্টাল রবিন, 'কি জানি!'

কিশোরও কোন জবাব দিতে পারল না।

ঢাকের শব্দ আর শুনল না সেদিন। অনেক রাতে ঘরে ফিরে এল ওরা।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল স্কুল এলাকায় বড় বেশি ব্যস্ততা। শনিবারে মেলা। ছবিগুলো শেষ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ছাত্ররা। একবার এর কাছে একবার ওর কাছে, ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন রাবুমামা।

নাস্তা খেতে খেতে থমকে গেল কিশোর। কিছু যেন মাথায় ঢুকেছে তার।

রবিন জানতে চাইল, 'কি হলো?'

উত্তেজিত স্বরে কিশোর বলল, 'জলদি খাওয়া শেষ করো!'

প্লেটের খাবারগুলো কোনমতে গলা দিয়ে নামিয়ে উঠে পড়ল কিশোর। দরজার দিকে ছুটল। পেছনে চলল দুই সহকারী। অবাক। বুঝতে পারছে না কিছু। হঠাৎ আবার কি মাথায় ঢুকল কিশোরের!

স্টাডিতে রয়েছেন মেলভিল। তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনতলায় রওনা হলো কিশোর।

টেবিলেই রাখা আছে দুর্গের ছবিটা; দেখার পর আর আলমারিতে ঢোকানো হয়নি। সেটার ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

ছবির পেছনের তারিখ দেখিয়ে দুই সহকারীকে বলল, 'এটাই শেষ এঁকেছে মেডিল মেলভিল। কেন অন্যভাবে এঁকেছিল, বুঝতে পারছি। সে জানত সে মারা যাচ্ছে।'

রবিন বলল, 'তারমানে বলতে চাইছ গুপ্তধনের সূত্র রেখে গেছে এটাতে? কোনদিনই তার পক্ষে ওটা বের করা সম্ভব হবে না বুঝে?'

'হ্যাঁ।'

ছবিটা দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল কিশোর। পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ওই ফুটকিগুলোকে দূর থেকে দেখি, কিছু বোঝা যায় কিনা?'

প্রথমে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। তারপর এক কোণের ধূসর আর হলুদ ফুটকিগুলো একটা বিশেষ রূপ নিতে লাগল ওদের চোখে। একটা অদ্ভুত ডিজাইন।

সরু শেকল দিয়ে পেঁচানো একটা টমাহক—ইনডিয়ানদের কুড়াল।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'গুপ্তধনের সূত্র!'

কাছে এগোতে শুরু করল কিশোর। যতই সামনে এগোল, নষ্ট হয়ে যেতে লাগল টমাহকের চেহারা। কাছে থেকে কিচ্ছু বোঝা যায় না।

আবার পিছিয়ে গেল সে।

'কি বুঝলে?' জানতে চাইল রবিন।

'দুর্গের ভেতর কোথাও এই ধরনের ডিজাইন রয়েছে,' জবাব দিল কিশোর।

টমাহকের হাতলে ছোট ছোট খাঁজকাটা রয়েছে। এর কি অর্থ বুঝতে পারল না ওরা।

আরও কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওরা ছবিটা। আর কোন সূত্র বেরোল না।

কিশোর বলল, 'এই সূত্রের কথা গোপন রাখতে হবে।'

মেলভিলকে ডেকে আনল গিয়ে মুসা।

ছবিটা দেখলেন তিনি। সূত্রটা আবিষ্কারের জন্যে ধন্যবাদ দিলেন ছেলেদের।

ছবিতে ইনডিয়ানদের যুদ্ধাস্ত্র দেখে অবাক হলেন তিনিও। বললেন, 'এটা আঁকার নিশ্চয় কোন কারণ ছিল।'

'সেনানডাগার ভেতরে ইনডিয়ানরাও লড়াই করেছে নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।

'ক্রাউন লেকে করেছে,' জবাব দিলেন মেলভিল। 'তবে দুর্গের ভেতরে ঢুকেছিল কিনা বলতে পারব না। ওখানকার যুদ্ধ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি আমি। বেশ কিছু ঘটনা অজানা রয়ে গেছে ঐতিহাসিকদের কাছে।'

রবিন বলল, 'জানতে হলে সেনানডাগার ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের।'

ম্যানশন থেকে বেরিয়ে এসে রাবুমামাকে খুঁজে বের করল ওরা। সূত্র আবিষ্কারের সুখবরটা জানাল। বলল, বিকেল বেলা দুর্গে যাবে।

আগে সিডারটাউনে যেতে হবে। ওখানে ওয়াকারের দোকান থেকে নৌকাটা নিয়ে তারপর যাবে দুর্গে।

তৈরি হওয়ার জন্যে ঘরের দিকে চলল ওরা। পেছন থেকে ডাক দিলেন দুঁইঅ। তাড়াহুড়া করে এগিয়ে এলেন।

কাছে এসে বললেন, 'তোমরা নাকি বেটাউতে করে দুর্গে যাচ্ছ? ওয়াভারফুল! সাংঘাতিক নৌকা! লড়াইয়ের সময় এই জিনিস ব্যবহার করেছেন লা মারকুইস ডা শ্যাম্বর। এই, নাও, এগুলো তোমাদের জন্যে।'

তিনটে পুস্তিকা দিলেন তিনি। ওপরে নাম লেখা: The Final French Victory at Fort du Lac.

গর্ব করে নিজের বুকে টোকা দিয়ে দুঁইঅ বললেন, 'আমি নিজে লিখেছি এটা। দুর্গে যুদ্ধের অনেক সঠিক তথ্য পাবে এতে।'

যেমন তাড়াহুড়া করে এসেছিলেন তেমন করেই চলে গেলেন তিনি।

হেসে ফেলল রবিন। পুস্তিকা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'সেনানডাগা দুর্গের আরেক সঠিক তথ্য। নিশ্চয় মরিস বেকারের উল্টো কথা বলেছেন।'

সিডারটাউনে আর যাওয়া লাগল না ওদের। নৌকাটা নিয়ে নিজেই এসে হাজির হলো ওয়াকার। একটা ট্রেলারে চাপিয়ে নিয়ে এসেছে।

পুরানো ডিজাইনের নৌকাটা নামাতে ওয়াকারকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। নিয়ে গিয়ে বোটহাউসের বাইরে পানিতে ভাসাল। বৈঠা ছাড়াও দুটো লগি দেয়া হয়েছে বেটাউতে। ওয়াকার বলল, অল্প পানিতে নৌকা

চালানোর জন্যে ও দুটো দেয়া হয়েছে।

নৌকাটা নিয়ে আসায় ঝামেলা এবং কষ্ট দুইই বাঁচল গোয়েন্দাদের। ওয়াকারকে অনেক ধন্যবাদ দিল ওরা।

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। দুর্গে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু পরদিনের জন্যে বসে থাকার তর সইল না ওদের। যা থাকে কপালে ভেবে চেপে বসল নৌকায়।

কিছুদূর যেতে না যেতেই আকাশের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাসের বেগ বাড়ছে।

যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না, ভাবছে কিশোর। তবু শেষ না দেখে ফিরবে না। দেখা যাক, থেমেও যেতে পারে ঝড়বৃষ্টি।

কয়েকটা দ্বীপের পাশ কাটিয়ে এল নৌকা।

এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

তারপর নামল ঝমঝম করে।

এই আবহাওয়ায় দুর্গে গিয়ে লাভ হবে না বুঝে নৌকা ফেরাতে বলল কিশোর।

রবিন বলল, 'এ রকম বৃষ্টি থাকলে কাল মেলার বারোটা বাজবে।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল রবিনের। জানালার কাছে গিয়ে দেখে রোদ। চিৎকার করে ডাকতে লাগল দুই বন্ধুকে, 'এই ওঠো ওঠো, বৃষ্টি থেমে গেছে!'

নাস্তা সেরে এসে দেখল ওরা সমস্ত স্কুল এলাকা সরগরম হয়ে উঠেছে। যার যার ছবি শো-তে দিতে ব্যস্ত। কেউ ইজেলসহ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, কেউ কাঠের ফ্রেমে ঝুলিয়েছে। ভাস্কর্যগুলো রাখা হয়েছে বিচারকের কাছে টেবিলে।

মেলভিলের সঙ্গে দেখা হলো। সাদা সামার স্যুট পরেছেন তিনি। খোশমেজাজে আছেন। ছেলেদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুর্গে যাবে নাকি?'

কিশোর বলল, 'যাব।'

'এক কাজ করতে পারো। গাইড হিসেবে চলে যেতে পারো। তাতে আমার একটা উপকার হবে—ট্যুরিস্টদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে। এই সুযোগে যতটা সম্ভব গুপ্তধন খোঁজা চালিয়ে যেতে পারবে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে কিশোর বলল, 'বুদ্ধিটা মন্দ না। চুরি করে কেউ গুপ্তধন খুঁজতে ঢোকার চেষ্টা করে কিনা সেদিকেও নজর দিতে পারব।'

বোটাউতে করে রওনা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ট্যুরিস্টরা যাওয়ার আগেই গিয়ে বসে থাকবে। পথে বেশ কিছু ক্যানু আর মোটরবোট দেখল, সব

চলেছে মিলউডের দিকে মেলা দেখতে।

উঁচু একটা টিলা ঘুরে আসতে দুর্গটা চোখে পড়ল। ফ্ল্যাগপোল, অর্থাৎ পতাকা যেখানে ওড়ানো হয় সেদিকে তাকাল। তাজ্জব হয়ে গেল। পতাকা একটা উড়ছে ঠিকই, তবে আগেরটা নয়। অন্য পতাকা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

'আরে এ তো ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক!' বলে উঠল কিশোর।

দুর্গের কাছাকাছি একটা খাঁড়িতে নৌকা ঢোকাল মুসা। একটা পাথরের সঙ্গে বাঁধল।

প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে অনেক কসরৎ করে ওপরে উঠে এল তিনজনে। উত্তরের দেয়ালে একটা বড় ফোকর। তাতে লম্বা হয়ে শ্যাওলা ঝুলে আছে। সেই ফোকর দিয়ে পথ করে পুরানো প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢুকল ওরা।

দু-দিকে রয়েছে দুটো ব্যারাক আর অফিসারস কোয়ার্টারের ধ্বংসাবশেষ। এক জায়গায় একটা গভীর গর্ত। ম্যাপ বলছে ওটা কুয়া ছিল। দর্শকরা এসে অসাবধানে তার মধ্যে পড়ে যেতে পারে, এই ভয়ে কয়েকটা তক্তা এনে তার ওপর রেখে দিল ওরা।

ব্রিটিশ পতাকাটার দিকে আরেকবার তাকাল কিশোর।

'ভূতটুত থেকে থাকলে এখানে,' বলল সে, 'এখনই খুঁজে বের করে ওটাকে ধরা দরকার। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ট্যুরিস্টরা।'

দক্ষিণের ড্রব্রিজটার কাছে চলে এল ওরা। ব্রিজটা মেরামত করেছেন মেলভিল।

সেদিক থেকে পশ্চিমে সরে এল। তারপর চলল প্রবেশ-সুড়ঙ্গের দিকে।

দর্শকরা যেদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকবে সেদিকের গেটের তালা খুলে দিল রবিন। 'কই, কোন ভূত তো দেখলাম না। পতাকা তুলল কে?'

'দেখো, বার বার ভূত ভূত কোরো না!' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। 'আমার ভাল লাগে না! কোত্থেকে শুনে ফেলবে...'

হেসে ফেলল রবিন।

মুসার কথা কানেই তুলল না কিশোর। 'র‍্যামপার্টগুলো মোটামুটি ঠিকই আছে, বিপদ হবে না, ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু পাতালঘর আর স্টোরগুলোর অবস্থা কাহিল। কখন যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে কে জানে।'

আসতে আরম্ভ করল ট্যুরিস্টরা।

গেটে দাঁড়িয়ে ওদের স্বাগত জানাল তিন গোয়েন্দা। ছোট ছোট দলে ভাগ করে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে লাগল দুর্গ দেখানোর জন্যে।

একটা সময় বেড়ে গেল দর্শকের সংখ্যা। দলগুলো বড় করতে বাধ্য হলো তখন গোয়েন্দারা।

নানা রকম প্রশ্ন করে লোকে। বেশির ভাগই ভূতের গুজবের কথা। দুর্গের মাথায় ব্রিটিশদের পতাকা কেন, এই প্রশ্নও করল অনেকে।

রহস্যময় হাসি হেসে জবাব দিল গোয়েন্দারা, এ সব রহস্যের সমাধান হতে এখনও বাকি আছে।

এতটাই ব্যস্ত থাকতে হলো ওদেরকে, টমাহকের চিহ্ন খোঁজার সুযোগই পেল না।

দুপুরের দিকে স্যান্ডউইচ আর চা নাকেমুখে গুঁজে দিয়ে লাঞ্চ সারল। তারপর আবার ট্যুরিস্ট সামলাতে ব্যস্ত হলো।

এই সময় রাবুমামা দেখতে এলেন ওরা কি করছে।

'এখানে ব্যবসা ভাল,' কিশোর জানাল। 'আপনাদের ওদিকে কি অবস্থা?'

'আমাদেরও যথেষ্ট ভিড়।'

ছবির ভালমন্দ বিবেচনা করে সাতটায় পুরস্কার দেয়া হবে, জানিয়ে চলে গেলেন রাবুমামা।

বিকেলের দিকে ভিড় কিছুটা পাতলা হয়ে এল। দর্শকরা সেননাভাগা দুর্গ পছন্দ করেছে তাদের কথা থেকেই বোঝা গেল। এটার সংস্কার করে সব সময়ের জন্যে দর্শকদের কাছে খুলে দেয়া দরকার এই মন্তব্যও করল কেউ কেউ।

বন্ধ করার কয়েক মিনিট আগে কিশোরের নির্দেশে দুর্গের চারপাশে একবার চক্কর দিতে লাগল মুসা। কোথাও কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ে কিনা দেখতে বলেছে কিশোর। একটা র‍্যাম্পে উঠতে চোখে পড়ল বছর ছয়েকের একটা বাচ্চা ছেলে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে কুয়াটার দিকে। আতঙ্কিত হয়ে দেখল মুসা, কুয়াটার ওপরে ঢাকনা দেয়া কাঠগুলো সরানো।

'এই থামো, থামো!' চিৎকার করে লাফ দিয়ে র‍্যাম্প থেকে নামল সে। দৌড় দিল কুয়ার দিকে।

কিন্তু থামল না ছেলেটা। এগিয়েই চলল। কুয়ার কাছে পৌঁছল মুসার আগে। কিনারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিতে লাগল নিচে।

মুসা যে ভয় করেছিল সেটাই ঘটল। ভারসাম্য হারাল ছেলেটা। পড়ে যেতে শুরু করল কুয়ার মধ্যে।

মুসার চিৎকার ছেলেটার মায়ের কানে গেছে। ফিরে তাকিয়ে দেখেই চিৎকার করতে করতে ছুটে আসতে লাগল।

শেষ মুহূর্তে ছেলেটার শার্টের কলার খামচে ধরে ফেলল মুসা। টেনে সরিয়ে আনল নিরাপদ জায়গায়।

মহিলা এসে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে।

কৈফিয়তের সুরে মুসা বলল, 'সরি! গর্তের মুখে কাঠ দিয়ে রেখেছিলাম আমরা। কে যে সরাল বুঝতে পারছি না!'

মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল মহিলা।

শেষ দর্শকটিও বেরিয়ে যাওয়ার পর কুয়ার কাছে তদন্ত করতে এল তিন গোয়েন্দা। কেউ কি ইচ্ছে করে সরাল তক্তাগুলো যাতে দুর্ঘটনা ঘটে? তারমানে মেলভিলের সঙ্গে শত্রুতা। কে শত্রুতা করছে?

'থাকতে পারলে ভাল হত,' রবিন বলল। 'পতাকাটা কেউ নামায় কিনা

দেখতে পারতাম।'

'আমরা থাকলে নামাবে না,' কিশোর বলল। 'ভেতরে আমরা আছি কিনা না দেখে ঢুকবে না সে।'

'তা ঠিক,' মুসা বলল। 'অহেতুক পুরস্কার বিতরণীটা মিস করা উচিত না। রিক কি পায় দেখার জন্যে মরে যাচ্ছি আমি।'

ছ'টা প্রায় বাজে। গেট বন্ধ করে দিয়ে এসে বেটাউতে চড়ল ওরা। খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর পেছনে তাকাল কিশোর। দুর্গের মাথায় উড়ছে পতাকা।

'আমার মনে হয় সেনানডাগা ডে-র সঙ্গে এই পতাকা ওড়ানোর কোন সম্পর্ক আছে,' বলল সে।

'থাকতে পারে,' রবিনও একমত হলো।

পনেরো

অনেক ভিড় মেলায়।

মেলভিলকে দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক ছবি থেকে আরেক ছবির সামনে। ছাত্রদের প্রশংসা করছেন, তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

সাতটা বাজল। শুরু হলো পুরস্কার বিতরণ।

একটা কাগজে রায় লিখে দিয়েছেন বিচারকেরা। সেটা হাতে নিয়ে এক এক করে ডাকতে লাগলেন রাবুমামা।

রিককে দেখতে পেল তিন গোয়েন্দা। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গর্বিত ভঙ্গিতে। রাবুমামার দিকে চোখ। ধরেই নিয়েছে প্রথম নামটা তারই ডাকা হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথমে তো নয়ই, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারেও তার নাম ডাকা হলো না। মুখ কালো হয়ে গেল বেচারার।

তার কাছে যেতে চাইল মুসা, হাত ধরে ঠেকাল রবিন। 'দেখো, কে আসছেন।'

ঘাটে এসে ভিড়েছে একটা কেবিন ক্রুজার। সেটা থেকে নেমে এলেন এলমার কেনটন।

খুব দামী পোশাক পরেছেন। এমন ভঙ্গিতে হাঁটছেন, যেন একগাদা পোকার মধ্যে এসে পড়েছেন। সাবধানে পা ফেলছেন তাই।

স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে আনতে গেলেন তাঁকে রাবুমামা।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেছন পেছন গেলেন মেলভিল। জোর করে মেজাজ শান্ত রেখেছেন। কাছে গিয়ে বললেন, 'আসুন। আপনার অপেক্ষাই করছিলাম। আশা করি লিখতে গিয়ে সুবিচার করবেন আমার ছাত্রদের প্রতি।'

'পুরোপুরি সুবিচার করতে হলে এখানে চোখ বন্ধ রাখতে হবে আমাকে।

'ওসব জঘন্য ছবি দেখে কতটা আর ভাল বলতে পারি, বলুন?' তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠলেন কেনটন।

অনেক কষ্টে সহ্য করলেন মেলভিল।

কয়েকটা ছবি দেখার পর যে ছবিটা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কেনটন। পেছনে রইলেন রাবুমামা, মেলভিল আর তিন গোয়েন্দা।

মুখ বাঁকিয়ে কেনটন বললেন, 'ঠিকই আছে। যা সব আঁকা হয়েছে, ফার্স্ট না করে আর এটাকে উপায় কি?'

ঘাবড়ে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। কেনটন যা আচরণ করছেন, রাগ সামলাতে না পেরে কখন তাঁকে বেতের বাড়ি মেরে বসেন মেলভিল কে জানে।

দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়া ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে ফেললেন কেনটন। 'এটা কি! ছবি, না রঙ গোলানো?'

যে মেয়েটা এঁকেছে, তার প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়।

তৃতীয় পুরস্কার পাওয়া ছবি দেখে হা-হা করে হেসে উঠলেন কেনটন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখো দেখো, কি এঁকেছে! তরমুজ নাকি বাঙ্গী? কিছুই তো বোঝার উপায় নেই! এ সব ছবিকে আবার পুরস্কারও দেয়া হয়েছে!'

লোকটার ভাবভঙ্গিতে মুসাই রেগে যাচ্ছে। ভাবছে, মেলভিল সহ্য করছেন কি করে?

রাবুমামা বললেন, 'বিচারকরা কিন্তু খুশিই হয়েছেন। তাঁরা বলছেন খুব ভাল ছবি এঁকেছে এবার ছাত্ররা।'

এমন করে হাসলেন কেনটন, হাত ঘুরিয়ে ভঙ্গি করলেন, যেন বোঝাতে চাইলেন বিচারকরাও ওই পদেরই। মুখে কিছু বললেন না।

অস্বাভাবিক নীরব হয়ে আছেন মেলভিল, লক্ষ করল কিশোর। অদ্ভুত একটা ভাব ফুটেছে চেহারায়।

নোটবুকে কিছু টুকে নিচ্ছেন কেনটন। লেখা শেষ করে বললেন, 'সবাইকে ধন্যবাদ। চমৎকার একটা সন্ধ্যা কাটল। সামনের বছর আবার দেখা হবে।'

ঘাটের দিকে রওনা হলেন তিনি।

রাবুমামার কানে কানে কি যেন বললেন মেলভিল।

অবাক মনে হলো মামাকে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'মিস্টার কেনটনকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে সবাইকে ঘাটে আসতে অনুরোধ করেছেন মিস্টার মেলভিল।'

ঘোষণাটায় অবাক হলো সবাই, কেনটনও। ভাবলেন পত্রিকায় ভাল করে লেখার জন্যে তাঁকে খাতির করছেন মেলভিল। অহঙ্কার আরও বেড়ে গেল তাঁর। এমন ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলেন যেন দেশের প্রেসিডেন্টকে গার্ড অভ অনার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে নোঙর ফেলেছে কেবিন ক্রুজার। ওইটুকু পথ নৌকায় যেতে হয়।

নৌকায় উঠলেন কেনটন।

দাঁড় টেনে নিয়ে চলল মাঝি।

তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা। তাকিয়ে আছে দর্শক। মেলভিলের উদ্দেশ্য হঠাৎ বুঝে ফেলল কিশোর। রবিন আর মুসাকে সে-কথা বলার আগেই ঘটে গেল অঘটন।

ভুস করে নৌকার সামনে ভেসে উঠল জলদানবের মাথা। হাঁ করে রয়েছে, মুখে ভয়ঙ্কর দাঁত, জ্বলন্ত চোখ। টপটপ করে পানি পড়ছে মাথা থেকে। কেনটনের নৌকার ওপর নামিয়ে আনছে মুখ।

'ওরে বাবারে, খেয়ে ফেলল রে!' বলে চিৎকার করে উঠলেন কেনটন। নৌকার মাঝির নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'ডেকার, বাঁচাও!'

নৌকার গায়ে ধাক্কা মারল সাংঘাতিক জলদানব।

কেনটনকে বাঁচাবে কখন, নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডেকার। দাঁড় ফেলে আতঙ্কে চিৎকার করে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। সাঁতরাতে শুরু করল তীরের দিকে।

দানবটা আরেকবার মুখ নামাতেই পানিতে ঝাঁপ দিলেন কেনটন। হাত থেকে উড়ে চলে গেল নোটবুক, পানিতে তলিয়ে গেল। কিন্তু কোন খেয়ালই নেই তাঁর। দাপাদাপি করে সরে আসার চেষ্টা করছেন দানবের কাছ থেকে।

তীরের দিকে সরে এল দানবটা। বিশাল দেহ দিয়ে পথরোধ করল দু-জনের। আর কোন উপায় না দেখে কেবিন ক্রুজারের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল চিত্রসমালোচক আর তাঁর মাঝি।

দর্শকরা অবাক। ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেছে অনেকে। রাবুমামাও কিছু বুঝতে পারছেন না। কেবল চারজন মানুষ অবাক হয়নি—তিন গোয়েন্দা এবং মেলভিল। তারা হাসছে। হা-হা করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হয়েছে মুসার; মেলভিলের ঠোঁটে নীরব হাসি।

ওয়াকারকে দেখা যাচ্ছে না। কোথাও লুকিয়ে বসে তার টেনে নড়াচ্ছে দানবটাকে।

'এই জন্যেই তাহলে মনস্টার তৈরি করেছেন মিস্টার মেলভিল,' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

অনেক কষ্টে গিয়ে কেবিন ক্রুজারে চড়লেন কেনটন আর ডেকার।

ততক্ষণে দর্শকরাও বুঝে গেছে দানবটা নকল। প্রায় সবাই চটে ছিল কেনটনের ওপর, তার দুরবস্থা দেখে হাসতে লাগল।

ডেকে দাঁড়ানো কেনটন এখন ভিজে বেড়াল। সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন মেলভিল, 'পত্রিকায় সব কথাই খোলাখুলি লিখবেন আশা করি! হেডলাইন হয়ে যাবে দানবটা, কি বলেন?'

ষোলো

পরদিন সকালে চীফের ফোন পেল কিশোর।

রবিন জানতে চাইল, 'কি বললেন? ডারবি ম্যাকফির খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'না। চোরটা নাকি একেবারে উধাও। আমাদের কাছে কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইলেন।'

ম্যানশনে এসে নাস্তা সারার পর মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আজকে কি করব আমরা?'

'বাইরে রাত কাটাব। ক্যাম্প করে থাকব,' জবাব দিল কিশোর।

'কোথায়?'

'দুর্গে।'

'বলো কি! আর কোন জায়গা পেলে না!'

'না। টমাহকটা খুঁজে বের করতে হবে, অন্য কেউ করে ফেলার আগেই।'

গাড়ি নিয়ে প্রথমে সিডারটাউনে এল ওরা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে। কোন হার্ডওয়্যারের দোকান না দেখে এড ভিনজারের দোকানে ঢুকল। মালিক নেই। দোকানে বসে আছে খাটো করে চুল ছাঁটা এক তরুণ। আপাতত সে-ই মাল বিক্রি করছে।

কি কি জিনিস চায়, বলল কিশোর। তিনটা ছোট বেলচা, তিনটা টর্চ, তিনটা স্লীপিং ব্যাগ আর একটা স্কাউট নাইফ।

সব এনে দিল লোকটা। আনতে দেরি করল। 'সরি, দেরি হয়ে গেল। আমি নতুন লোক। কোন মাল কোথায় রেখেছেন মিস্টার ভিনজার ভাল জানি না আমি।'

'কোথায় গেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'ছুটি কাটাতে। ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে গেছেন। আয়েশ করবেন আর ছবি আঁকবেন।'

হাতে হাতে মালগুলো তুলে নিল তিন গোয়েন্দা।

'কোথায় ক্যাম্প করবে তোমরা?' জানতে চাইল সেলসম্যান।

'লেকের দক্ষিণ ধারে,' জবাব দিল কিশোর।

মাথা নাড়তে লাগল সেলসম্যান। 'জায়গাটা ভাল না। কোটি টাকা দিলেও ওদিকের বনের ধারে নিয়ে যেতে পারবে না আমাকে। ভূতের আড্ডাখানা। ডাঙায় তো আছেই, পানিতেও আছে।'

'পানিতে আবার কি আছে?' শঙ্কিত হয়ে উঠেছে মুসা।

'পানিতে কি থাকে জানো না? জলভূত, পানির দানো, এ সব। শুনেছি

ওদিকে প্রায়ই পানি থেকে একটা দানোকে উঠতে দেখা যায়। কখনও দৈত্যের রূপ ধরে ওঠে, কখনও মানুষের। পানির ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়।'

ভয় পেল মুসা।

কিন্তু কিশোর আর রবিন মুচকি হাসল। এ সব গুজব বিশ্বাস করে না।

স্কুলে ফিরে রাবুমামা আর মেলভিলকে জানাল ওরা, কোথায় রাত কাটাতে যাচ্ছে। মালপত্র নিয়ে বেটাউতে উঠল। রওনা হলো দক্ষিণে।

দুর্গটা চোখে পড়তেই প্রথমে তাকাল ফ্ল্যাগপোলের দিকে। কোন পতাকা নেই।

দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিল রবিন। 'আশ্চর্য! একবার ফরাসী পতাকা, একবার ব্রিটিশ, এখন কোনটাই নেই!'

'যে-ই উড়িয়েছে,' কিশোর বলল, 'সে জলপথে এসেছে। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢোকার চেয়ে এ পথে ঢোকা অনেক সহজ।'

'নৌকায় করে?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।' সাধু মরিস বেকারের নৌকাটা যে ভেজা দেখেছে, সেটা উল্লেখ করে কিশোর বলল, 'এক মাস নৌকা নিয়ে না বেরোনোর কথাটা আমার বিশ্বাস মিথ্যে বলেছেন তিনি। দুর্গে গিয়ে সেনানডাগা ডে-র দিনে ব্রিটিশ পতাকা তিনিই উড়িয়েছেন। ইংরেজদের বীরত্ব জাহির করার জন্যে।'

খাঁড়িতে ঢুকল নৌকা।

সেটাকে বেঁধে রেখে দুর্গের চত্বরে উঠে এল গোয়েন্দারা।

ম্যাপ দেখে কিশোর বলল, 'বাইরে থেকে শুরু করব আমরা। তিনজন তিন দিকে চলে যাব। টমাহকের চিহ্ন দেখলে চিৎকার করে জানাব।'

তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। অগভীর খাদ, উঁচু দেয়াল, পড়ে থাকা পাথরের স্তূপ, কোথাও খোঁজা বাদ দিল না।

খুব কঠিন কাজ। মনে হলো অনন্ত কাল ধরে খুঁজলেও এই খোঁজার শেষ হবে না। কিন্তু চিহ্নটা নেই—এ সম্ভাবনাও মন থেকে দূর করতে পারল না।

কয়েক ঘণ্টা পর মুসাকে দেখে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কিছু পেলে?'

ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল মুসা, 'না।'

খিদে পেয়েছে। সঙ্গে করে স্যান্ডউইচ এনেছে। খাওয়ার জন্যে দেয়ালের ছায়ায় বসল ওরা। তারপর আবার উঠল খোঁজার জন্যে।

দুপুরের পর অনেক বেশি গরম হয়ে উঠতে লাগল সূর্য। ইতিমধ্যে একবার এসে লেকে ডুব দিয়ে গা শীতল করে নিয়েছে ওরা। আবারও এল।

মুসা বলল, 'এই পাথরের স্তূপে হাজার বছর ধরে খুঁজলেও বের করতে পারব না!'

কিশোর চুপ করে রইল। ভাবছে কিছু।

গোসল করে শরীর শুকিয়ে আবার খুঁজতে লাগল ওরা। রবিন আর মুসা নতুন খোঁড়া গর্ত আবিষ্কার করল। খোঁড়ার পর আবার মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেয়া হয়েছে ওগুলো।

'আরও কেউ খুঁজেছে,' রবিন বলল।

বনের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল মুসা। জায়গাটা ওখানে ঢালু হয়ে লেকের দিকে নেমে গেছে। একটা গাছের আড়ালে চলে গেল একজন মানুষ।

'রিক ডগলাস!' বলেই তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিল সে।

ধরতে পারল না। বনের ভেতর হারিয়ে গেল রিক।

'গর্তগুলো নিশ্চয় ওই ব্যাটাই খুঁড়েছে,' বলল রবিন।

রিকের পিছু নিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করল না ওরা।

বাইরের দিকের যত দেয়াল আছে সব দেখা শেষ করল। বিকেলও শেষ হয়ে আসছে তখন। কিছুই পেল না, কিচ্ছু না।

'কাল ভেতরে ঢুকব,' কিশোর বলল।

'লাভটা কি হবে বুঝতে পারছি না,' পুরোপুরি নিরাশ হয়েছে মুসা। 'খিদেয় পেট জ্বলছে। স্যান্ডউইচে আর কি হয়। রান্না চড়ানো দরকার।'

'এমন জায়গায় আগুন জ্বালতে হবে যাতে লেক থেকে দেখা না যায়। আমরা যে এখানে আছি বুঝতে দেয়া চলবে না।'

'তার চেয়ে বরং চলো দুর্গের কাছ থেকে সরে যাই,' ভূতের কথা ভেবে বলল মুসা।

তাকে অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল কিশোর।

ঢালু পাড় ধরে নামার সময় কি যেন বাড়ি লাগল রবিনের পায়ে। জিনিসটা তুলে নিল সে।

কাঠের হাতলওয়ালা বিশেষ ধরনের একটা বাটালি। ফলায় কাদা লেগে আছে।

'ভাস্করের বাটালি!' বলল সে। দুটো খোদাই করা অক্ষর চোখে পড়ল—R. D.

'আরি, দেখো,' বাটালিটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন, 'কারও নাম!'

'খাইছে! আর. ডি.—তার মানে রেনে দুঁইঅ!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার, 'ভাস্কর এসেছিলেন এখানে! কেন?'

'এবং সোনার শেকলের কথা বিশ্বাস করেন তিনি,' যোগ করল রবিন। 'অথচ এ কথাও বলেন, ইংরেজরা ওটা চুরি করে নিয়ে গেছে! নাহ্, জটিল ব্যাপার-স্যাপার!'

কিশোর বলল, 'কাল ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে আবার।'

নৌকায় উঠল ওরা। ক্লান্ত যেমন হয়েছে, খিদেও পেয়েছে। দাঁড় তুলে নিল রবিন আর মুসা। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব বেয়ে নিয়ে চলল নৌকা। দুর্গের কাছ থেকে সামান্য দূরে একটা দ্বীপ আছে। তাতে ভেড়াল।

আগুন জ্বালতে দেরি হলো না। রান্না চড়িয়ে দিল।

পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল সূর্য। রান্নাও শেষ হলো। আগুন নিভিয়ে দিয়ে রান্না করা খাবার নিয়ে আবার নৌকায় উঠল ওরা।

হ্রদের পানি ছুঁয়ে বয়ে এল একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। রাতে ভাল শীত পড়বে বোঝা গেল। ওরা আবার খাঁড়িতে ঢুকতে ঢুকতে অন্ধকার হয়ে গেল।

পাথরে নৌকা বেঁধে, স্লীপিং ব্যাগ, টর্চ আর রান্না করা খাবারগুলো নিয়ে তীরে উঠল ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে এল দুর্গের চত্বরে।

পশ্চিমের র‍্যামপার্ট থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা গাছের নিচে ক্যাম্প করল। এখান থেকে লেকের অনেকখানি আর নৌকা রেখেছে যে খাঁড়িটায় সেটা দেখা যায়।

অন্ধকারেই খাওয়া শেষ করল ওরা। চোখ রেখেছে দুর্গের দিকে। কান খাড়া সন্দেহজনক শব্দ শোনার আশায়।

তেমন কোন শব্দই নেই। কেবল ঝিঁঝি আর নিশাচর পোকামাকড়ের ডাক ছাড়া।

আরাম করে নড়েচড়ে বসল মুসা।

'আজ আর ঢাকের আওয়াজও নেই,' বলল সে।

গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক সময় পার হলো।

কিছুই ঘটছে না। নিরাশই হয়ে পড়ল ওরা। মনে হচ্ছে, খামোকাই এসে লুকিয়ে আছে এখানে। এই সময় ফিসফিস করে মুসা বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

অন্য দু-জনও কান পাতল। বাতাসের শব্দ ছাড়িয়ে ভোঁতা একধরনের আওয়াজ কানে এল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে যেন কেউ।

'বাতাসের শব্দই,' আন্দাজ করল কিশোর।

বাতাস বাড়লে শব্দটাও বাড়ছে, কমলে কমছে। অনেকটা শিসের শব্দের মত।

'বাতাসের এ রকম শব্দ তো জিন্দেগীতে শুনিনি!' রবিন বলল। 'কিসে করছে?'

'আর কিসে? ভূতে!' কুঁকড়ে গেল মুসা।

যে দিকে শব্দ হচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল তিনজনে। কিছুই দেখতে পেল না। ঘুম আসছে। পালা করে ঘুমিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

মাঝরাতের দিকে বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল চাঁদ।

কিশোরের পালা পড়েছে। দুর্গের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত কিছু একটা চোখে পড়তেই স্থির হয়ে গেল সে। মনে হলো, একটা বিশাল খুলি লটকে আছে দেয়ালে।

চোখ রগড়াল সে। আরও ভাল করে তাকাল। বুঝে ফেলল হঠাৎ। হাসি পেল। স্রেফ আলো-আঁধারির খেলা, আর কিছু না। চাঁদের আলোয় ইঁটপাথরের স্তূপকে দেয়ালের পটভূমিতে খুলির মত লাগছে।

তারপর মুসার পালা এল। গাছে হেলান দিয়ে বসল সে।

আচমকা পিঠ সোজা করে ফেলল। বেজে উঠেছে ঢাক।

ড্রিম! ড্রিম! ড্রিম! ড্রিম!

নিজের অজান্তেই দম বন্ধ করে ফেলল সে। এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে শব্দের উৎস খুঁজতে লাগল।

কিশোর আর রবিনকে ডেকে তুলল সে।
ওরাও শুনতে পেল শব্দটা।
দুর্গের দিক থেকে নয়, লেকের ধারে কোনখানে ঢাক বাজানো হচ্ছে।
উঠে দাঁড়াল তিনজনে। লেকের পানিতে চাঁদের আলো পড়েছে। শান্ত পানিকে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় আরও কালো লাগছে।
তাকিয়ে আছে ওরা সেদিকে।
কিছুক্ষণ পর রবিনের চোখে পড়ল ওটা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল একটা দীর্ঘ মুহূর্ত। হাত তুলে ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই দেখো, ওটা কি!'
লেকের পানি ছুঁয়ে যেন উড়ে আসছে মাথা ঢাকা একটা কালো মূর্তি।
'বাবাগো, ভূত!' থরথর করে কেঁপে উঠল মুসা। 'পানির দানো!'

সতেরো

মানুষের মতই দেখতে ওটা। মাথা আর মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে। আলখেল্লার মত পোশাকের ঝুল বাতাসে উড়ছে। পানির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসার সময় পানিতে ঝিলমিলে রেখা রেখে আসছে।
কয়েকটা মুহূর্ত অন্য দু-জনের মতই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিশোর। হঠাৎ পা বাড়াল। 'এসো!'
চত্বর পাড় হয়ে এসে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। রবিন রয়েছে তার পেছনে। সবার পেছনে মুসা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।
দুই হাত দু-দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে দানোটা। তীরের কাছাকাছি চলে এসেছে। ঘুরে গেল আচমকা। পানিতে ঝুঁকে থাকা কতগুলো গাছের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।
টর্চ হাতে সেদিকে ছুটল কিশোর। টিলাটক্কর পেরিয়ে অন্য পাশে আসতে সময় লাগল। আসার পর আর চোখে পড়ল না ওটাকে। হারিয়ে গেছে।
টর্চের আলো ফেলে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। মূর্তিটাকে আর দেখতে পেল না।
'সত্যি দেখলাম তো!' আনমনে বিড়বিড় করল সে।
'একসঙ্গে তিনজনের চোখের ভুল হতে পারে না,' রবিন বলল।
'পানির ওপর দিয়ে দৌড়াল কেমন দেখলে!' ভয় এখনও পুরোপুরি রয়েছে মুসার। 'ওটা পানির দানো না হয়েই যায় না! কোন মানুষের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়!'
'ঢাকের শব্দ থেমে গেছে, খেয়াল করেছ?' কিশোর বলল।
বেটাউয়ের কাছে এল ওরা। আগের জায়গাতেই বাঁধা আছে নৌকাটা। কোন জিনিসে হাত দেয়া হয়নি।

গাছের নিচে ফিরে এল তিনজনে। আর ঘুম এল না। জেগে বসে লেকের দিকে তাকিয়ে রইল আবার দানোটাকে দেখার জন্যে।
কিন্তু আর দেখা দিল না জলজ ভূত।
ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনেই।
ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে উঠে গোসল সেরে এল লেক থেকে। আগুন জেলে নাস্তা বানাল। খাওয়ার পর লেকের পাড় ধরে এগোল সূত্র খুঁজতে খুঁজতে। কিছুই পাওয়া গেল না।
খবরটা জানানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। মিলউডে ফিরে এল ওরা।
পানির দানোর কথা শুনে খুবই অবাক হলেন মেলভিল আর রাবুমামা।
'ভুল দেখোনি তো?' প্রশ্ন করলেন মেলভিল।
'না,' জোর গলায় বলল মুসা। 'তিনজনেই দেখেছি। অনেকক্ষণ ধরে। টর্চ হাতে পিছুও নিয়েছি।'
'স্যার,' রবিন বলল, 'কারও বানানো দানব নয়তো এটাও? আপনারটার মত?'
'বলতে পারব না। তবে আমি বানাইনি, এটা শিওর।'
'তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল।
ম্যানশন থেকে বেরিয়ে এসে রাবুমামাকে রিক ডগলাসের কথা বলল সে।
মামা জানালেন, 'মেলার পরদিন থেকে আর ক্লাসে আসে না ও। হেরে যাওয়ার লজ্জাতেই বোধহয়। কিন্তু দুর্গে গেল কেন? সে-ও গুপ্তধনের পেছনে লাগল নাকি?'
বাটালিটা বের করে মামাকে দেখাল রবিন। 'এটা পেয়েছি দুর্গের কাছে, লেকের পাড়ে। রেনে দুইঅর জিনিস।'
'আশ্চর্য! এটা ওখানে গেল কি করে?'
'সে-কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি এখন তাঁকে,' কিশোর বলল।
'যাও,' মামা বললেন। 'আমার ক্লাস না থাকলে আমিও যেতাম।'
স্বীকার করার জন্যে যেন তৈরিই হয়ে আছেন দুইঅ। বললেন, 'হ্যাঁ, এটা আমারই। কোথায় পেলে?'
সেনানডাগা দুর্গে পাওয়া গেছে শুনে ভীষণ চমকে গেলেন। বললেন, কি করে গেছে ওখানে ওটা কিছুই বুঝতে পারছে না।
বিস্তারিত সব কথা তাকে বলার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। বাটালিটা ফেরত দিয়ে চলে এল।
বাইরে বেরিয়ে দুই সহকারীকে বলল, 'অপরাধী বলে তো মনে হলো না। অন্য কেউ নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতে পারে, তাঁর ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে।'
দুপুরে খাওয়ার পর আবার দুর্গে রওনা হলো ওরা। সারাদিনে আর কোন ক্লাস না থাকায় রাবুমামাও চললেন ওদের সঙ্গে।
মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। সেগুলো নিয়ে ডাঙায় নামল। এবার আর ঢাল বেয়ে না উঠে একটা ট্রেঞ্চ দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

প্যারেড গ্রাউন্ডে বেরিয়ে এসে ম্যাপ দেখল কিশোর।

ডানের লম্বা, ছাত ধসে পড়া একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওটা পশ্চিমের ব্যারাক…'

'ছিল,' বাধা দিয়ে বলল মুসা, 'এখন আর নেই।'

কান দিল না কিশোর। 'আমাদের পেছনেরটা উত্তরের ব্যারাক। বাঁয়েরটা অফিসারস কোয়ার্টার। কোনখান থেকে শুরু করব?'

'মাটির নিচে অনেক ঘর আছে। ওগুলোর কোন একটা থেকে শুরু করলে কেমন হয়?' রবিন বলল। 'মেডিল মেলভিল তো বন্দি ছিল। নিশ্চয় কোন পাতালঘরে আটকে রাখা হয়েছিল তাকে।'

তা বটে। আবার ম্যাপ দেখতে লাগল কিশোর। 'পশ্চিমের ব্যারাকের নিচে আছে কয়েকটা পাতালঘর।'

ব্যারাকের পাথরের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ধসে পড়ার পরেও যা আছে র‍্যামপার্টের চেয়ে অনেক উঁচু। শুরু হলো খোঁজা। ইঁটপাথরের স্তূপের নিচে একটা ভাঙা, মরচে পড়া তলোয়ারের ফলা পেল মুসা।

আরেকটা স্তূপ খুঁড়তে লাগল। এই সময় শোনা গেল বিকট চেঁচামেচি। ঝগড়া করছে দু-জন লোক।

দৌড়ে বেরিয়ে এলেন রাবুমামা আর তিন গোয়েন্দা।

অবাক হয়ে দেখল, ঝগড়া করছেন রেনে দুঁইঅ আর মরিস বেকার। হাতাহাতি বাধিয়ে দিয়েছেন।

আঠারো

টানাহেঁচড়া করে ছাড়ানো হলো দু-জনকে।

রাবুমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘটনাটা কি, রেনে?'

'এই সাধু ব্যাটা,' হাঁপাতে হাঁপাতে দুঁইঅ বললেন, 'আমার পূর্বপুরুষকে গাল দিয়েছে! কত্তবড় সাহস ওর! মারকুইস ডি শ্যাম্বরকে গাল দেয়!'

'দেব না!' চেঁচিয়ে উঠলেন বেকার, 'তুমি লর্ড ক্রেইগকে অপমান করে কথা বললে কেন?'

কথা কাটাকাটি করতে করতে আবার লেগে যাওয়ার দশা।

তাঁদেরকে থামানোর জন্যে কিশোর বলল, 'তারমানে আপনারা দু-জনই দুর্গের মাথায় পতাকা উড়িয়েছিলেন?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করলেন প্রথমে দুঁইঅ, পরে বেকার। সেনানডাগা ডে-র দিন গোপনে এসে দুর্গে পতাকা উড়িয়ে দিয়ে গেছেন দুঁইঅ। সেটা দেখে রেগে যান বেকার। ফরাসী পতাকা নামিয়ে ব্রিটিশদের পতাকা উড়িয়ে দেন। সেটা সহ্য করতে পারেননি দুঁইঅ। সুযোগ পেতেই ওই পতাকা নামিয়ে

ফেলেন। সেনানডাগা ডে শেষ হয়ে যাওয়াতে নতুন করে আর ফরাসী পতাকা ওড়ানোর প্রয়োজন বোধ করেননি।

একটা কথা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন দু-জনে, সোনার শেকলের প্রতি লোভ নেই কারও।

তাহলে দুর্গে আসেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে দু-জনেই জানালেন, তথ্য খুঁজতে। কে বিজয়ী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত—ফরাসী না ইংরেজরা, এটা সঠিক ভাবে না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই ওঁদের।

আজকেও এসেছেন সেই উদ্দেশ্যেই। এসে পরস্পরের সামনে পড়ে যেতেই আর কথা নেই, অমনি লেগে গেছেন। পুরানো ফরাসী আর ইংরেজদের যুদ্ধটার আজ একটা কিনারা করে ছাড়বেন, এমন ভঙ্গি।

বেকারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আবার রেগে উঠলেন দুঁইঅ, 'গত বুধবারে মাথার পেছনে বাড়ি মেরে আমাকে বেহুঁশ করে ফেলেছিল ও! আজ আমি শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব।'

সমান তেজে ফুঁসে উঠলেন বেকার, 'আমি কোথায় মারলাম? তুমিই তো কাল আমাকে মেরে বেহুঁশ করলে!'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠলেন দুঁইঅ।

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। এই দু-জনকে বাড়ি মেরে বেহুঁশ করল কে? কিশোর আর রবিনের ভাবনা একই খাতে বইছে, কিন্তু মুসার দৃঢ় বিশ্বাস—এটা ভূতের কাজ। বলেও ফেলল সে-কথা।

'ভূত! অসম্ভব!' দুঁইঅ বললেন। 'সাধুটা মেরেছে!'

সাধুও জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, শয়তানীটা দুঁইঅর।

অনেক কষ্টে দু-জনকে শান্ত করে নিয়ে এসে নৌকায় তুলে দিলেন রাবুমামা আর তিন গোয়েন্দা। দুই জন দু-দিকে চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। লেকের মাঝখানে গিয়ে যদি আবার ঝগড়া বাধান, এই ভয়ে। কিন্তু আর কোন গোলমাল করলেন না দুই দুর্গ-বিশারদ।

আবার আগের জায়গায় ফিরে চলল গোয়েন্দারা।

এবার ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে না গিয়ে ওপর দিয়ে এগোল। একটা র‍্যাম্পার্ট ঘুরে আসার সময় রবিনের চোখে পড়ল জিনিসটা। ফুটখানেক উঁচু দেয়ালের মাঝে মাঝে খাঁজকাটা, ওগুলোতে রাইফেলের নল বসিয়ে গুলি চালানো হত শত্রুর ওপর। ওরকম একটা খাঁজের মধ্যে একটা দুধের খালি টিন আটকে আছে। তলাটা ফুটো করা। যখনই জোরাল বাতাস ওটার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে র‍্যামপার্টে উঠল সে। টিনটা বের করে এনে বলল, 'রাতে এটা দিয়েই বাতাস ঢুকছিল। শব্দ করেছে। নীরবতার মাঝে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি আমরা। দিনের বেলা অতটা শোনা যায় না।'

দুটো রহস্যের সমাধান হলো—দুর্গের মাথায় পতাকা ওড়ানোর, আর রাতের বেলায় ভূতুড়ে শব্দের।

আবার ব্যারাকের দিকে এগোল ওরা। ঢুকতে যাবে এই সময় ছুটন্ত

পদশব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখল আরনল্ড ছুটে আসছে।
হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল শোফার। চোখমুখ উত্তেজিত।
'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন রাবুমামা।
'মিস্টার মেলভিলকে দেখেছেন?'
মাথা নাড়লেন তিনি। 'না। কি হয়েছে তাঁর?'
'বিকেল বেলা বললেন মিস্টার কেনটনের ওখানে যাচ্ছেন। বললেন আমাকে ফোন করবেন, তখন যেন গিয়ে নিয়ে আসি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। তাঁর কোন খোঁজ নেই। কেনটনের ওখানে যাওয়াটা আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু মনিবের ওপর কথা বলি কি করে? সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আপনারা কি একটু খোঁজ নেবেন?'
'তাঁর কিছু হয়েছে ভাবছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'হতেই পারে। সেদিন যে নাকানি-চোবানিটা খাওয়ালেন কেনটনকে। এরপর আবার কেন যে ওখানে গেলেন, বুঝতে পারছি না!'
'চলো, যাচ্ছি,' বলে ছেলেদের দিকে তাকালেন রাবুমামা। 'তোমরা থাকবে না আসবে?'
'যাওয়াটাই তো উচিত,' কিশোর বলল। 'গুপ্তধন পরেও খোঁজা যাবে। আগে তাঁর কি হলো দেখে আসি।'
জিনিসপত্র সব ব্যারাকের বাইরে রেখে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল ওরা। কেনটনের বাড়িতে চলল।
শুনে তো আকাশ থেকে পড়লেন চিত্রসমালোচক। বললেন, 'আমার বাড়িতে আসবে কেন?'
'তা কি করে বলব?' জবাব দিলেন রাবুমামা। 'আরনল্ডকে নাকি বলেছেন এখানে আসবেন।'
'আরনল্ড মিথ্যে কথা বলেছে,' সাফ বলে দিলেন কেনটন।
'সে-ই বা মিথ্যে বলবে কেন?'
'তা কি করে বলব? তবে বলেছে। মিস্টার মেলভিলের আমার এখানে আসার কোন কারণ নেই।'
ব্যাপারটা গোয়েন্দাদের কাছেও রহস্যময় মনে হলো। কেনটনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সিডারটাউনের সবখানে খুঁজে বেড়াল মেলভিলকে। পাওয়া গেল না। কেউ বলতেও পারল না তাঁকে কোথাও দেখেছে।
রাত বারোটায়ও যখন ফিরলেন না মেলভিল, পুলিশকে ফোন করলেন রাবুমামা।
চীফ বললেন, তক্ষুণি লোক পাঠাচ্ছেন খোঁজার জন্যে।
পরদিন সকালে স্কুলের সমস্ত ছাত্ররা জেনে গেল মেলভিলের নিরুদ্দেশের সংবাদ।
আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা।
কিশোর বলল, 'ছবি চুরির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে। ছবিতে কোন সূত্র না পেয়ে মরিয়া হয়ে তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে ম্যাকফি আর তার

লোকেরা। সিডারটাউন ও মিলউডের কোথাও খোঁজা তো আর বাদ রইল না। একটা জায়গাই এখন বাকি।'

'কোথায়?' সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দুর্গের মধ্যে।'

'খাইছে! বলো কি?'

'হ্যাঁ, এই একটা জায়গাই বাদ। ওখানেই খুঁজতে যাবে। চোরেরা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেলে লুকিয়ে রাখার এর চেয়ে ভাল জায়গা আর পাবে না।'

আর কোন কথা নেই। ঘাটের দিকে চলল ওরা। বোটাউতে চড়ে দুর্গে রওনা হলো।

ওপরে কোথাও রাখা নিরাপদ মনে করবে না চোরেরা, অনুমান করল কিশোর। রাখলে নিচে কোথাও রেখেছে। সুতরাং পাতালঘরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল সে। ম্যাপ বলছে দুটো আছে পশ্চিমের ব্যারাকের নিচে, আর দুটো উত্তরের।

'উত্তরেরটা থেকেই শুরু করা যাক,' কিশোর বলল।

মুখটা ঢেকে আছে ইঁটপাথরে। সিঁড়িগুলো প্রায় দেখাই যায় না।

'সরাব কি করে এগুলো?' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'সরাতে হবে।'

'এখান দিয়ে তো কোন মানুষ ঢোকানো সম্ভব না,' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'অহেতুক কষ্ট করব না তো?'

'ঢোকানোর পর এ ভাবে আবার ঢেকে দেয়া যায়। তা ছাড়া পাতালে আমাদের এমনিতেও নামতে হবে, সোনার শেকল খোঁজার জন্যে।'

আর কথা না বলে কাজে লেগে গেল ওরা। কিছু পাথর এতটাই বড়, বেলচা দিয়ে সরানো গেল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘামে ভিজে গেল মুখ। বুঝল, হবে না এটা। পরিষ্কার করতে পারবে না।

দ্বিতীয় মুখটার কাছে চলে এল তখন। এটা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে। পাথরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে পচা তক্তার মাথা। পুরানো একটা দরজা। সেটাকে টেনেটুনে বের করে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল।

আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে লাগল মুখ, সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

থ্যাপ করে একটা শব্দ হলো। চমকে মুখ তুলে দেখল কিশোর, দরজার গায়ে গেঁথে আছে একটা কুড়াল। অল্পের জন্যে তার মাথায় লাগেনি।

'কে মারল?' রাগে চিৎকার করে উঠল রবিন।

মুসা দেখল, কালো কাপড়ে মুখ-মাথা ঢাকা একটা মূর্তি দৌড়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। রাতের বেলা দেখা সেই ভূতটার মত।

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল সে। তবে রাতের মত আর ভূতের ভয় করল না। তা ছাড়া মূর্তিটাকে মানুষই মনে হচ্ছে। চিৎকার করে উঠল, 'ধরো! ধরো ব্যাটাকে!'

তাড়া করে গেল ওরা।

কিছুদূর গিয়ে কিশোর বলল, 'তোমরা দু-জন ওদিক দিয়ে যাও।' বলেই লাফ দিয়ে খাঁদে নেমে বাঁয়ে ছুটল সে।

দু-দিক দিয়ে ঘুরে এসে এক জায়গায় মিলিত হলো ওরা। কিন্তু লোকটাকে আর দেখল না। আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে আগের জায়গায় ফিরে এল।

দরজা থেকে কুড়ালটা খুলে নিয়ে এল রবিন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

কুড়ালের ফলাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পকেট থেকে ম্যাপটা বের করল কিশোর। মাটিতে বিছাল।

'কী?' জানতে চাইল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়েই রয়েছে ম্যাপের দিকে। দীর্ঘক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থেকে মুখ তুলে বলল, 'দেখো তো কুড়ালের ফলার সঙ্গে দুর্গের কোন্ অংশের বেশি মিল?'

মুসা আর রবিনও ঝুঁকে এল।

পুবের র‍্যামপার্টের সঙ্গে মিল বেশি, ওরাও দেখতে পেল।

চিৎকার করে উঠল রবিন, 'আরি, এ তো একেবারে টমাহক! এইটাই সূত্র! টমাহকের ডিজাইন এঁকে এটাকেই বুঝিয়েছে মেডিল মেলভিল!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল ওরা।

'র‍্যামপার্টের কোন দিকে নির্দেশ করেছে?' মুসার প্রশ্ন।

'ছবিতে দেখেছি টমাহকটা দুর্গের পশ্চিমের দেয়ালের সমান্তরালে রাখা হয়েছে,' কিশোর বলল। 'হাতলের গোড়ায় খাঁজগুলোর কথা মনে আছে?'

'পশ্চিমের ব্যারাক!' আবার চিৎকার করে উঠল রবিন। 'খাঁজগুলো দিয়ে নিশ্চয় পাতালঘরের কোন বন্দিখানা বোঝাতে চেয়েছে! কিন্তু কুড়ালটা যে ছুঁড়ে দিয়ে গেল সে কি জানে এ কথা?'

'মনে হয় না। ও আসলে সূত্র দেয়ার জন্যে নয়, আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে ছুঁড়েছে। কিন্তু নিজের অজান্তে চোখ খুলে দিয়ে গেছে আমাদের। মিস্টার মেলভিলকে আর গুপ্তধন হয়তো একই সঙ্গে আবিষ্কার করে ফেলতে পারব। এসো।'

বেলচাগুলো তুলে নিয়ে পশ্চিমের ব্যারাকে ছুটল ওরা। সিঁড়ির মুখে জমে থাকা ইঁটপাথরের স্তূপ সরাতে শুরু করল।

ঘণ্টাখানেকের কঠোর পরিশ্রমের পর গর্তটা দিয়ে শরীর মোড়ামুড়ি করে ঢুকে যেতে পারল কিশোর। হারিয়ে গেল নিচের অন্ধকারে। ওপরে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

কয়েক মিনিট পর মাথা তুলে বলল, 'নামা যায়। এসো।'

বেলচাগুলো কিশোরের হাতে দিয়ে মুসা আর রবিনও নেমে পড়ল। তারপর আবার যার যার বেলচা হাতে নিয়ে টর্চ জ্বালল। লম্বা, অন্ধকার একটা করিডর চোখে পড়ল। জঞ্জালে বোঝাই।

বাঁ দিকে সারি সারি ঘর, ওগুলো বন্দিখানা। এক এক করে পা[illegible] ঘরে ঢুকে দেখতে শুরু করল ওরা। মরচে পড়া কজায় আটকে আছে পা[illegible] পাল্লাগুলো। ভেঙে খুলতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না।

চতুর্থ ঘরটায় আলো ফেলে দেখতে দেখতে মুসা বলল, 'দেখো, পেছনের দেয়ালটায়!'

অন্য দু-জনও দেখল। পাথরের গায়ে হালকা আঁচড়ের দাগ।

কাছে গিয়ে আলো ফেলল তিনজনে। ধীরে ধীরে চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা ডিজাইন—টমাহকের চওড়া ফলা, খাঁজকাটা হাতল এবং তাতে জড়ানো একটা শেকল। ছবির ডিজাইনের সঙ্গে এর হুবহু মিল।

'এ ঘরেই আটকে রাখা হয়েছিল বন্দি-শিল্পীকে!' কিশোর বলল।

পাথরে হাত বুলিয়ে দেখল রবিন। বেলচা দিয়ে খোঁচা দিল। 'ইস্পাতের মত শক্ত! মেঝেতে খুঁড়ব নাকি?'

এককোণে কতগুলো জঞ্জাল পড়ে আছে। ভাল করে দেখে বুঝতে পারল এককালে এটা একটা বিছানা ছিল। লাথি দিয়ে সেগুলো সরাতে যেতেই পা পড়ল মেঝের একটা পাথরের ওপর। নড়ে উঠল সেটা।

'রবিন, এখানে এসো!'

তিনজনে মিলে চাড় দিয়ে পাথরটাকে তুলে আনল। বেরিয়ে পড়ল একটা কালো গর্ত।

উনিশ

ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল বেশি গভীর না গর্তটা।

'আমি আগে যাচ্ছি,' কিশোর বলল।

এক এক করে তিনজনেই নামল।

আলো ফেলে দেখে রবিন বলল, 'এ তো সুড়ঙ্গ।'

পেছনে পাথরের দেয়াল। সামনে একটা সরু সুড়ঙ্গ, নিচু ছাত। দেয়াল, মেঝে, ছাত, সবই মাটির। মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল ওরা।

'সাবধান,' কিশোর বলল, 'ছাতটা মোটেও সুবিধের লাগছে না আমার। ধসে পড়তে পারে। একটা কথা বুঝতে পারছি না। পশ্চিমে চলেছি আমরা। বেরিয়ে যাব একসময়। তবে কি শেকলটা বাইরে কোথাও লুকানো আছে?'

'কি করে বলব?' হাত ওল্টাল মুসা।

সামনে কোন মোড় নেই। নিচের দিকে বেঁকে গেল সুড়ঙ্গ। এটাও অবাক করল ওদের। তবে বুঝতে সময় লাগল না। ওপরে ট্রেঞ্চ আছে, তাই তার নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে বলে বেঁকে গেছে।

আচমকা শেষ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। সামনে মাটির দেয়াল। রবিন বলল, 'কি মনে হয়, পথ কি এখানেই শেষ? নাকি ছাত ধসে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে?'

বেলচা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে কিশোর বলল, 'ছাতই ধসে পড়েছে।'
খুঁড়বে কিনা তাই নিয়ে তর্ক শুরু করল তিনজনে।
কিশোর বলল, 'খুঁড়তে গেলে আবার যদি ওপর থেকে মাটি ধসে পড়ে, আরও বিপদে পড়ব।'
'পড়লে আর কি করব,' মুসা বলল। 'সামনে এগোতে হলে খুঁড়তেই হবে।'
রবিন বলল, 'ইস্, ধসে পড়ার আর জায়গা পেল না!'
শেষ পর্যন্ত খোঁড়ারই সিদ্ধান্ত নিল ওরা।
জ্বলন্ত অবস্থায়ই টর্চগুলোকে মাটিতে রেখে দিয়ে কাজে লাগল। বেলচা ভরে ভরে মাটি সরাতে লাগল।
এই সময় পেছনে শোনা গেল পায়ের শব্দ।
ঝট করে একটা টর্চ তুলেই ঘুরে পেছনে আলো ফেলল মুসা। আলো পড়ল লম্বা এক তরুণের মুখে।
'রিক ডগলাস!'
পালাল না ডগলাস। 'এই কাজই করতে এসেছে তাহলে। একটা মোটরবোটে করে তোমাদের পিছু নিয়েছিলাম। শেকলটা পেয়েছ?'
আগে বাড়ল সে। উত্তেজনায় মাথা নামাতে ভুলে গেল। ছাতে বাড়ি খেল মাথা। আর তাতেই ঘটে গেল অঘটন। বিকট শব্দ করে ধস নামল।
'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।
লাফ দিয়ে সামনে চলে এল রিক। পেছনে মাটির ধস নেমে বন্ধ হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। ধুলোর ঝড় উঠল। নাকেমুখে ঢুকে দম আটকে দিতে চাইল।
ধপ করে বসে পড়ল রবিন। 'কিশোর, গেলাম আটকে! আর বেরোতে পারব না এখান থেকে!'
বসে থাকলে চলবে না। তুমুল গতিতে মাটি খুঁড়ে চলল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু লাভ হচ্ছে বলে মনে হলো না।
'বাতাসে অক্সিজেন আছে,' কিশোর বলল, 'তাতে চারজনের দুই ঘণ্টাও চলবে না। তাড়াতাড়ি সারতে হবে আমাদের, নইলে মরব।'
জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রিকের দিকে তাকাল মুসা। বেলচা দিয়ে এক বাড়ি বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে লম্বুটার মাথায়। হিসহিস করে বলল, 'তোমার জন্যে...'
মারামারি বেধে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি কিশোর বলল, 'কাজটা ঠিক করেননি, রিক। এখন কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মুসা, খোঁড়ো।'
'সরি, খুবই অন্যায় করে ফেললাম,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল রিক। কৈফিয়তের সুরে বলল, 'তোমাদের পেছনে লেগেছিলাম। আড়ি পেতে পেতে শুনে বোঝার চেষ্টা করেছি বহুবার, কি করছ তোমরা। দুর্গের ম্যাপটা আমিই চুরি করেছি। মিস্টার মেলভিল আর মিস্টার রাবাতকে গুপ্তধনের কথা আলোচনা করতে শুনে ফেলেছিলাম। ক্রাউন লেকে কেন এসেছ তোমরা, জানলাম...'
'আপনি আমার মাথায় বাড়ি মেরেছিলেন?' রাগ দেখা দিল রবিনের

চোখে।

মাথা নাড়ল রিক, অবাক হয়েছে। 'না না, বাড়ি মারব কেন? আমি শুধু ম্যাপটা চুরি করেছি। কসম খোদার, বাড়িটারি মারিনি আমি!'

তাহলে কে মারল?

বন্ধ দেয়ালের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে রিক। 'যদি বেরোতে না পারি এখান থেকে…সত্যি, আমারই দোষ…'

'এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই,' বলে আবার বেলচা চালাতে শুরু করল কিশোর।

ক্লান্ত হয়ে রবিন বসে পড়লে তার বেলচাটা তুলে নিল রিক।

কালো অন্ধকারে কেটে বসেছে যেন তিনটে টর্চের আলো। শ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে আসছে। ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর।

হাঁপাতে হাঁপাতে রিক বলল, 'থামলে চলবে না! বেরোতেই হবে আমাদের।'

হঠাৎ করেই মাটি ভেদ করে ওপাশে চলে গেল তার বেলচা। ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল মুখে। 'হয়ে গেছে! কাজ হয়ে গেছে!' চিৎকার করে উঠল সে।

দ্বিগুণ উদ্যমে খোঁড়া চালিয়ে গেল ওরা। একজন মানুষ গলে বেরোনোর মত ফোকর হলে থামল। প্রথমে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। বেরিয়ে এল অন্য পাশে। তারপর বেরোল অন্যেরা।

সামনে আরেকটা দেয়াল। ডানে-বাঁয়ে পথ বেরিয়ে গেছে তা থেকে।

'বাতাস আসার জন্যে করা হয়েছিল বোধহয় এগুলো,' রবিন বলল।

ডানেরটাতে ঢুকল ওরা প্রথমে। পুরানো ফরাসী অস্ত্রেশস্ত্রে বোঝাই। মরচে পড়া কতগুলো মাসকেট রাইফেল এমন কি তিনটা ছোট ছোট কামানও রয়েছে। এখান দিয়ে বেরোনোর কোন পথ নেই।

ওটা থেকে বেরিয়ে এসে বাঁয়ের অন্য পথটায় ঢুকল ওরা।

মুসা বলল, 'কিশোর, দুর্গ থেকে কতটা দূরে আছি বলে মনে হয়?'

'ঠিক বলা যাবে না। একশো গজ হতে পারে, বেশিও হতে পারে।'

পঞ্চাশ গজ এগোনোর পর সামনে আবার পথ রুদ্ধ দেখা গেল।

'এটাও খোঁড়া লাগবে মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

বেশিক্ষণ লাগল না খুঁড়ে ফোকর করে ফেলতে। বেরিয়ে এল অন্য পাশে। শেষ হয়নি সুড়ঙ্গ।

খানিক পর শেষ হয়ে গেল মাটির সুড়ঙ্গ। সামনে পাথরের দেয়াল। এটা যদি বন্ধ হয় তাহলে সর্বনাশ হবে। বেলচা দিয়ে পাথর খোঁড়া যাবে না।

কিছুদূর এগোনোর পর ওপর দিকে টর্চের আলো ফেলে দাঁড়িয়ে গেল রবিন।

চারকোণা একটা বড় পাথর। হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায়। চারজনে মিলে ঠেলা দিতেই ওপর দিকে উঠে গেল।

সবচেয়ে লম্বা রিক। মাথা তুলে উঁকি দিয়ে দেখে বলল, 'একটা ঘর।'

তাতে উঠে এল ওরা। একপাশে করিডর দেখা গেল। সেটা ধরে এগোতে সামনে সিঁড়ি পাওয়া গেল।

প্যারেড গ্রাউন্ডে বেরিয়ে এল ওরা। মাটি, ময়লা আর ঘামে মাখামাখি।

একজন লোককে দেখতে পেল কিশোর। ইউনিফর্ম পরা। এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে।

'আরনল্ড!' বলে চিৎকার করে তার দিকে দৌড়ে গেল কিশোর।

ফিরে তাকাল শোফার। 'যাক, ভালই আছ তোমরা। তোমাদেরই খুঁজছিলাম। মিস্টার মেলভিলকে পাওয়া গেছে। মিস্টার রাবাতের সঙ্গে আছেন।'

'কোথায়?'

'এসো।'

ওদেরকে নিয়ে উত্তরের ব্যারাকে চলে এল আরনল্ড। পাতালঘরে নামার একটা সিঁড়ির মুখ পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। যেটা থেকে পচা দরজাটা টেনে তুলেছিল ওরা সেটা।

'মিস্টার রাবাত তাঁকে খুঁজে বের করেছেন,' শোফার জানাল।

তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল তিন গোয়েন্দা আর রিক। বেশ কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলছে। দেয়াল ঘেঁষে থাকা লোক দু-জনের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো। একজনের হাত-পা বাঁধা, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আরেকজন দাঁড়ানো। একটা বড় পাথর উঁচিয়ে ধরে রেখেছে মিস্টার মেলভিলের মাথার ওপর। তিনি নড়লেই বাড়ি মারবে, এমন ভঙ্গি।

দাঁড়ানো লোকটাকে চিনতে পারল তিন গোয়েন্দা। অবাক হলো। শেয়ালমুখো সেই ছবি-চোর।

'ডারবি ম্যাকফি!' বলে পা বাড়াতে গেল মুসা।

পথ আটকাল আরনল্ড। শীতল কণ্ঠে হুমকি দিল, 'খবরদার, এগোবে না! তাহলে মিস্টার মেলভিলের মাথা ভর্তা করে দেয়া হবে!'

ভয়ানক ভঙ্গিতে মেলভিলের মাথার ওপর পাথরটা দোলাল ম্যাকফি।

'নাও, এবার লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে পড়ো উপুড় হয়ে,' আদেশ দিল আরনল্ড।

'তারমানে তুমিও ওই চোরটার দলে!' রাগত স্বরে বলল মুসা।

'চুপ!'

উপায় নেই। আরনল্ডের আদেশ মানতে বাধ্য হলো ওরা। চারজনেরই হাত-পা বেঁধে এনে মেলভিলের কাছ থেকে একটু দূরে দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে রাখা হলো।

শেয়ালমুখোর দিকে তাকিয়ে আরনল্ড বলল, 'বলেছিলাম না, ওদের ধরবই আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাকফি। 'বুদ্ধি আছে তোমার।'

কালো কাপড়ে মুখ-মাথা ঢাকা একটা মূর্তি দেখা দিল সিঁড়িতে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।

বিড়বিড় করল মুসা, 'সেই ভূতটা!'

কাছে এসে দাঁড়াল কালো আলখেল্লা পরা ভূত। মুখ থেকে কাপড় সরাল। বেরিয়ে পড়ল দাড়িওয়ালা একটা মুখ। বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা নাক।

এড ডিনজার!

বিশ

হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আপনিও আছেন ছবি চুরির পেছনে!' না বলে আর পারল না রবিন।

'অবাক হয়েছ খুব, না?' ডিনজার বলল। 'তোমাদেরকে ধরে আনার জন্যে দুঃখিত। আর কোন উপায় ছিল না। বোকা ডারবিটার চেয়ে অনেক বেশি জানো তোমরা।'

রেগে গেল ম্যাকফি। 'তা তো বলবেই। থাকো না কয়েক দিন এই দুর্গের মাটির তলায়। বুঝবে কেমন মজা। মাথাই খারাপ হয়ে যাবে। লণ্ঠনের আলোয় বসে বসে ছবি দেখে সূত্র খোঁজাটা যে কি যন্ত্রণা, আমি করেছি, আমিই বুঝেছি।'

একধারে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একগাদা ছবি দেখতে পেল কিশোর। বুঝল, ওগুলো চুরি করে আনা দুর্গের ছবি।

'হয়েছে, থামো!' ধমক দিল ডিনজার। 'মাথায় গোবর পোরা, কি আর করবে।' তার কথাতে বোঝা গেল সে-ই দলের নেতা।

আরনল্ডের দিকে তাকাল কিশোর, 'মিস্টার মেলভিলকে আপনিই কিডন্যাপ করে এনেছেন, না? খামোকা কেনটনকে ফাঁসিয়েছেন।'

হাসল শোফার। 'একেবারেই খামোকা বলতে পারবে না। তোমাদেরকে দুর্গ থেকে সরানোর প্রয়োজন পড়েছিল। তা ছাড়া অন্য দিকে সন্দেহ ঘুরিয়ে দিতে পারলে নিরাপদে এখানে কাজ করতে পারবে ডারবি। সময় সুযোগ দুইই পাবে।'

'আপনি আর ম্যাকফি মিলে চুরি করেছেন ছবিগুলো, তাই না?'

অস্বীকার করল না আরনল্ড। আরও জানাল, ছবির নিচে তার হাত থেকেই রঙ লেগে গিয়েছিল—অ্যালিজারিন ক্রিমসন। ছাত্র সেজে আর্টিস্টের শেমিজ পরে ঢুকেছিল। ছবি আঁকার অভিনয় করার সময় তুলি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে রঙটা লেগে যায় আঙুলে। তারপর ছবি উল্টে দেখার সময় পেছনেও লেগে যায়।

'শটগান দিয়ে রঙও ছুঁড়েছিলেন আপনিই?'

'হ্যাঁ,' মিটিমিটি হাসছে আরনল্ড। 'তবে কার্তুজ সরবরাহ করেছে এড।'

রিক বলে উঠল, 'রবিন, আমার ধারণা এ ব্যাটাই তোমার মাথায়ও বাড়ি মেরেছে!'

রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল শোফারের চোখের তারায়। 'তুমিই তাহলে ম্যাপটা চুরি করেছিলে!'

বোঝা গেল, রবিন ঢোকার আগে ম্যাপটা চুরি করেছে রিক। সে বেরিয়ে যাওয়ার পর আরনল্ড ঢুকেছে। এবং সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছে রবিন।

আরনল্ডকে বলল রবিন, 'মাথায় বাড়ি মারাটা তাহলে আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে। দুর্গে এসে ঘোরাঘুরি করে আপনাদের কাজের অসুবিধা করত বলে দুঁইঅ আর বেকারের মাথায়ও আপনি বাড়ি মেরেছেন, তাই না?'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল আরনল্ড। কাজটা করে যেন আনন্দই পাচ্ছে সে।

'সেনানডাগা ডে-র দিন কুয়ার ওপরের তক্তা সরিয়েছিল কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমি,' জবাব দিল ম্যাকফি। 'তোমাদের কারণে সারাটা দিন মাটির তলায় বন্দি থাকতে হয়েছে আমাকে। এক সময় আর সহ্য করতে পারলাম না। দম নিতে বেরোলাম। ভাবলাম দেই একটা অঘটন ঘটিয়ে। লোকজন সব সরে যাক।'

'আমাদেরকে নিয়ে প্রথম যেদিন মিস্টার মেলভিল দুর্গে এলেন, সেদিন দেয়াল ধসে পড়েছিল। কে ফেলেছে? আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাকফি।

'বোকামি করেছেন,' কিশোর বলল। 'বাচ্চাটা পড়ে মরলে কিংবা মিস্টার মেলভিলের ক্ষতি হলে পুলিশ আসত। অনেক খোঁজাখুঁজি হত দুর্গে। আরও আগেই ধরা পড়তেন।'

'এটা বোকাই,' রাগত স্বরে বলল ভিনজার। 'নইলে কি দরকার পড়েছিল এ সব করার? আমি তো বলিনি।'

'ভয় দেখিয়ে ওদের দূরে রাখতে চেয়েছিলাম,' মিনমিন করে বলল ম্যাকফি।

'ঢাকের শব্দ আপনিই করতেন, তাই না?' ম্যাকফিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'দুই সঙ্গীকে সঙ্কেত দিতেন।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাকফি। আলোচনার প্রয়োজন পড়লে একটা ইনডিয়ান টমটম বাজিয়ে ওদেরকে ডেকে আনত সে।

'মিস্টার মেলভিলের কি করেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'অমন কাহিল হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছেন কেন?'

'বেশি গণ্ডগোল করছিল,' আরনল্ড বলল। 'কিছুতেই বলতে চাইছিল না সোনার শেকলটা কোথায় আছে। তাই খানিকটা নরম করতে হয়েছে।'

'তার মানে গায়ে হাত দিয়েছেন!' রেগে গেল মুসা।

'বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাদেরও এই ওষুধ দেয়া হবে!' কঠিন কণ্ঠে বলল ভিনজার।

যতটা সম্ভব তথ্য বের করে নেয়ার জন্যে কিশোর জিজ্ঞেস করল আবার, 'রাতের বেলা পানিতে একটা দানো দেখেছি। ওটা কি ভাবে করলেন?'

খিকখিক করে হাসল আরনল্ড। 'খুব সহজে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।' কালো রঙের দুটো চ্যাপ্টা জিনিস বের করল সে, দেখতে অনেকটা সার্ফবোর্ডের মত। 'ওয়াটার শু। ইউরিথেনে তৈরি। সহজেই ভেসে থাকা যায় এগুলো পায়ে দিয়ে। তবে প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার।'

'অনেক কথাই শুনলে,' ভিনজার বলল। 'এবার আমাদের কথার জবাব দাও। শেকলটা কোথায়?'

'বলতে পারব না,' জবাব দিল কিশোর। 'সুড়ঙ্গে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি আমরা।'

'সুড়ঙ্গ? সূত্র পেয়েছিলে নাকি? ম্যাকফি বলছিল, তোমরা নাকি একটা টমাহকের কথা আলোচনা করছিলে।'

গোপন করে লাভ হবে না বুঝে যা যা জানে বলে দিল কিশোর। এত সহজে বলে দেয়ার আরেকটা কারণ, সে চাইছে চোরগুলো এখান থেকে চলে যাক। তাহলে মুক্তির একটা পথ করতে পারবে।

আরনল্ড আর ভিনজার দু-জনে দুটো লণ্ঠন তুলে নিল।

ম্যাকফিকে বলল ভিনজার, 'তুমি এখানে থাকো। পাহারা দাও। আমরা দেখে আসি।'

বেরিয়ে গেল দুই চোর। কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এদের হাত থেকে মরিয়া হয়ে ভাবতে লাগল কিশোর।

বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারে না ম্যাকফি। বলল, 'রকি বীচে সাবধান করেছিলাম তোমাদের। কিন্তু তোমরা বোকা গাধারা আমার কথা শোনোনি। এখন পস্তাও।'

জবাব দিল না তিন গোয়েন্দা।

কয়েক মিনিট পর উঠে অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করল ম্যাকফি। দুই সঙ্গীর ফেরার অপেক্ষা করছে।

মেলভিলের দিকে তাকাল মুসা। চোখ টিপে তাঁর কাছে সরে যেতে ইশারা করলেন তিনি।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই ইঞ্চি ইঞ্চি করে সরে যেতে শুরু করল মুসা। চলে এল মেলভিলের দুই ফুটের মধ্যে।

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে মেঝেতে পড়ে গেলেন মেলভিল।

দৌড়ে এল ম্যাকফি। 'মিস্টার মেলভিল! কি হলো! কি হলো আপনার!' তার পাশে ঝুঁকে বসে কি হয়েছে বোঝার চেষ্টা করল।

পা বাঁকিয়ে পেটের কাছে নিয়ে গেছে মুসা, লক্ষই করল না ম্যাকফি।

ঝট করে পা সোজা করল মুসা। বাঁধা অবস্থাতেই দুই পায়ে জোড়া লাথি মারল ম্যাকফির ঘাড়ে। টুঁ শব্দ করতে পারল না চোরটা। গমের বস্তার মত গড়িয়ে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেললেন মেলভিল। হাসলেন। 'চমৎকার!' হাত নিয়ে

এলেন পেছন থেকে। খোলা। 'ঢিল করে বেঁধেছিল। খুলে ফেলেছি।'

মুসার হাতের বাঁধন খুলে দিলেন তিনি।

মুক্ত হয়ে গেল সবাই। কষে বাঁধল বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা চোরটাকে।

রিককে মেলভিলের পাহারায় রেখে অন্য দুই চোরের পেছনে গেল তিন গোয়েন্দা। প্যারেড গ্রাউন্ডে বেরিয়ে এল।

পথ এখন চেনা হয়ে গেছে। টর্চ না জ্বেলেও সহজেই নেমে এল মেডিল বন্দি ছিল যে ঘরটায় সেটাতে। টর্চ জ্বালার আগে কান পেতে শুনল কোন শব্দ আছে কিনা।

কাউকে দেখা গেল না।

'গেল কোথায়?' বলতে বলতেই দেয়ালের গায়ে একটা পাথরের ওপর চোখ পড়ল রবিনের। অন্য পাথরগুলোর চেয়ে খানিকটা ভেতরে চেপে আছে। প্রথমবার খেয়াল করেনি এটা। তখন মেঝের দিকে নজর ছিল বেশি। এগিয়ে গিয়ে ঠেলতেই নড়ে উঠল পাথর। তিনজনে মিলে ঠেলতে পাথর সরে গিয়ে একটা গুপ্তদরজা বেরিয়ে পড়ল।

সাবধানে ভেতরে পা রাখল ওরা। একটা গলিপথ। সেটা ধরে এগিয়ে চলল সামনে। আন্দাজ করতে পারছে কিশোর, দুর্গের ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে ওরা।

পথের মাথায় বড় একটা ঘর।

আলো ফেলে দেখতে দেখতে চকচকে একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। এগিয়ে গেল। ছাত থেকে ঝুলে থাকা বিশাল সোনার শেকলটা আবিষ্কার করতে দেরি হলো না।

এককোণে একটা টেবিল দেখতে পেল রবিন। তার ওপর রাখা একটা খাতা। ধুলোর আস্তর পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে খাতাটা ওল্টাতে শুরু করল সে।

গুপ্তধন পাওয়া গেছে। আর এখানে দেরি করা উচিত মনে করল না কিশোর। দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। আগে চোরগুলোকে বন্দি করা দরকার। গুপ্তধন পরেও বের করা যাবে।

কিন্তু গেল কোথায় ওরা?

বন্দি-ঘরে ঢোকার আগেই পায়ের আওয়াজ কানে এল। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

কানে এল ভিনজার আর আরনল্ডের কথা। সুড়ঙ্গের মধ্যে শেকল খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

ফোকর দিয়ে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল।

ভিনজারের চিৎকার শোনা গেল, 'আরি, আরেকটা ফোকর! পাথরটা সরাল কে? তখন তো বন্ধ ছিল!'

'মনে হয় কেউ ঢুকেছে! চলো, দেখি!' আরনল্ড বলল।

ফোকরের কাছে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল তিন গোয়েন্দা। টেনিস বলের সমান তিনটে পাথর তুলে নিয়েছে তিনজনে।

প্রথম দেখা গেল আরনল্ডের মাথা। ফোকরের ভেতর তার পুরো শরীরটা চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধাঁ করে পাথর দিয়ে মাথায় বাড়ি মারল রবিন।

'উফ্!' করে একটি মাত্র শব্দ করেই বেহুঁশ হয়ে গেল আরনল্ড। তার নিজের পদ্ধতিতেই তাকে কাবু করে ফেলে হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল রবিনের।

'কি হলো?' বলতে বলতে ভিনজারও ঢুকে পড়ল। লণ্ঠনের আলোয় তিন গোয়েন্দাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। কিন্তু বাধা দেয়ার সুযোগই পেল না। কারাতের কোপ আর লাথি খেয়ে চোখের পলকে ধরাশায়ী হলো সে-ও।

দুটো পাথর হাতে দু-জনের মাথার কাছে বসে রইল কিশোর আর মুসা, ওঠার চেষ্টা করলেই বাড়ি মেরে দেবে আবার বেহুঁশ করে। রবিন গেল দড়ি আনতে।

তিন চোরকেই ভালমত বেঁধে রেখে ওপরে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। নিচে থাকার আর দরকার নেই, রিক আর মেলভিলও এলেন সঙ্গে।

বাইরে বেরিয়েই শোনা গেল পুলিশের সাইরেন।

'পুলিশ খবর পেল কি করে?' অবাক হয়ে বলল মুসা।

জানা গেল শিগগিরই। রাবুমামা এসেছেন তাদের সঙ্গে।

তিনি বললেন, 'অনেকক্ষণ হলো গেলে তোমরা। ফিরলে না। দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গেলাম। গেলাম ম্যানশনে। রাঁধুনির কাছে জানলাম, আরনল্ডও দুর্গে গেছে অনেকক্ষণ হলো। সন্দেহ হলো, কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। চীফকে ফোন করলাম তখন।'

ভিনজার আর আরনল্ড চোরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শুনে অবাক হলেন তিনি।

আবার সবাই দল বেঁধে পাতালঘরে নামল। তিন গোয়েন্দা আগেই দেখে গেছে সোনার শেকল। অন্যরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

'সাংঘাতিক জিনিস!' মেলভিল বললেন। বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলেন তিন গোয়েন্দাকে। খুব খুশি হয়েছেন তিনি।

খাতাটার দিকে এগিয়ে গেল আবার রবিন। পাতা উল্টে দেখতে দেখতে বলল, 'তার চেয়ে দামী জিনিস আছে এখানে। ইতিহাস। শ্যাম্বরের লেখা। সেনানডাগা ছাড়ার আগে এটা এখানে রেখে গেছে সে। গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে ইরোকুই ইনডিয়ানদের ফরাসী সাজিয়ে দুর্গে রেখে যায়। দুর্গ দখলের লোভে ওরাও থাকতে রাজি হয়।'

'লর্ড ক্রেইগকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে!' তাজ্জব হয়ে গেছে কিশোর।

'এ ছাড়া আর কি?'

'তারমানে ফরাসী ভেবে ইংরেজরা যাদের আক্রমণ করেছিল, তারা সাধারণ ইনডিয়ান।' ভ্রূকুটি করল রবিন। 'কিন্তু দুঁইঅর মতে ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর র‍্যামপার্টের ওপর ফরাসীদের দেখা গিয়েছিল। এর কি জবাব?'

'হতে পারে বিতাড়িত হওয়ার পর লোকবল বাড়িয়ে আবার ফিরে

এসেছিল ইনডিয়ানরা,' কিশোর বলল। 'দুর্গ দখল এবং লুট করার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকালেন মেলভিল। তিনিও কিশোরের সঙ্গে একমত। তাহলে দাঁড়াচ্ছে সেনানডাগা দুর্গের শেষ দখলদার ছিল ইরোকুই ইনডিয়ানরাই।

হেসে বলল রবিন, 'এই খাতাটা পড়ার পর কেনটন আর দুইঅর চেহারা কেমন হবে দেখার লোভ সামলাতে পারছি না আমি।'

মেলভিল বললেন, 'ব্যবস্থাটা আমি করে দিতে পারি তোমাকে। খাতাটা পড়ার জন্যে একসঙ্গে দাওয়াত দেব দু-জনকে আমার বাড়িতে।'

'ওই কাজও করবেন না, স্যার,' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। 'সামনাসামনি হলেই ঝগড়া বাধাবে। খুনোখুনি করে ফেলবে।'

হেসে ফেললেন রাবুমামা। কারণ দুই দুর্গ-বিশারদের ঝগড়া তিনি নিজেও চোখে দেখেছেন।

****